রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয়

[কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক ডিগ্রীকোর্সের সিলেবাস অনুসারে লিখিত]

দিলীপ কুমার সরকার, এম. এ.

ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক

বিশ্বনাথ ঘোষ, এম. এ., ডি. এস. ডাব্‌লু,

অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী ; প্রাক্তন অধ্যাপক, বাগনান কলেজ, হাওড়া, বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া ও কামারপুকুর কলেজ, হুগলী।

গ্রন্থম্

৬৮এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীব্রজগোপাল নায়ক
পুস্তকম্
১৮এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ আগষ্ট, ১৯৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বক্সী
নিউ প্রিণ্টার্স
২০৯/সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাংলাভাষায় পঠনপাঠনের অনুমতি-দান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অবশ্য ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে ইংরেজী ভাষায় উন্নতমানের যত সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক আছে বাংলাভাষায় তাহা নাই। বাংলাভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে ছাত্রছাত্রিগণ উপকৃত হইবে এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করা হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থটি দুইটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য Text book অপেক্ষা ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক এরূপ খুঁটিনাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য পরিশিষ্টে দশটি আদর্শ প্রশ্নোত্তর সংযোজিত হইযাছে। সম্প্রতি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে মাওসেতুং-এর লেখা পাঠ্য করা হইয়াছে। এই কারণে পরিশিষ্টে মাওবাদ সম্পর্কে একটি আলোচনাও যোগ করা হইয়াছে। পুস্তকটি রচনায় আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের নিকট যে অকুণ্ঠ উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ কবিয়াছি তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। অধ্যাপক শংকর ঘোষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে পুস্তকমের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীব্রজগোপাল নায়ক মহাশয়ের আগ্রহ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে শ্রীমান গৌতম সাধুখাঁর প্রয়াস প্রশংসার্হ।

যাহাদের জন্য গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছে তাহারা উপকৃত হইলে আমরা শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ,
ব্যারাকপুর,
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ,
নৈহাটী।

দিলীপ কুমার সরকার
বিশ্বনাথ ঘোষ

দিলীপ কুমার সরকার

বিশ্বনাথ ঘোষ

১। **ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা** (যন্ত্রস্থ)

২। **আধুনিক শাসন ব্যবস্থা**

বিশ্বনাথ ঘোষ

১। **ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা**

৩। **A Short History of Economic Thought**

৪। **American Economic Development**

সূচীপত্র

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

॥ Nature and Scope of Political Science ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Definition and Scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences--Methods of Political Science.

বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্র দর্শনের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা : রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল।

সংজ্ঞা : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন (Definition of Political Science, Politics and Political Philosophy) : কোন শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে উহার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন কারণ ইহা একটি গতিশীল বিজ্ঞান।

এরিষ্টটল হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত আলোচনা সুরু হয় (The Science of Politics begins with Aristotle. Pollocks) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বুঝাইতে এ্যারিষ্টটলই সর্বপ্রথম Politics শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটি গ্রীকশব্দ Polis (নগররাষ্ট্র) হইতে উদ্ভূত। গ্রীকদের মতে নগর-রাষ্ট্রের জীবনকে যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় ছিল। এই অর্থে রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমার্থক। জেলিনেক, (Jellinek) সিজউইক (Sidgwick) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তে রাষ্ট্রনীতি শব্দটি অধিকতর পছন্দ করিতেন। আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্র এবং সরকার সংক্রান্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আলোচনা। বর্তমানকালে রাষ্ট্রনীতি বলিতে বুঝায়, বাস্তব রাষ্ট্রনীতি (Practical Politics)

অর্থাৎ সরকারের বর্তমান নীতিগুলি এবং উহাদের কার্যকর করার বাস্তব পন্থাসমূহ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে উহার পরিধি সংকুচিত হইয়া পড়িবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুইটি ভাগ আছে—তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি (Theoretical Politics) এবং বাস্তব অথবা ফলিত রাষ্ট্রনীতি (Practical Politics)। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় হইল (ক) রাষ্ট্রতত্ত্ব, (খ) সরকার সম্পর্কিত তত্ত্বগত আলোচনা (গ) আইন সংক্রান্ত আলোচনা এবং (ঘ) কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের আলোচনা। অপরপক্ষে বাস্তব অথবা ফলিত রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় হইল (ক) সরকারের বাস্তব রূপ, (খ) সরকার পরিচালনা (গ) আইন এবং (ঘ) কূটনীতি, যুদ্ধ, শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়গুলি হইল রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় অপরপক্ষে উভয় শ্রেণীর বিষয়সমূহই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যাপক ধারণা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় "রাষ্ট্রদর্শন" নামক আর একটি শব্দের উদ্ভব হইযাছে যাহার সঠিক অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক বর্তমান লেখক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং নীতিমূলক (Prescriptive or Philosophical) ; বর্ণনামূলক আলোচনাকালে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত আলোচনা করিযা যান। কিন্তু নীতিমূলক আলোচনাব ক্ষেত্রে কি ছিল বা আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহা লইয়াই শুধু আলোচনা করেন না, কি হওযা উচিত তাহাও আলোচনা করেন। হালওয়েলের (J. H. Hallowell) মতে রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রনীতিক সংগঠন অপেক্ষা উহাদের ধ্যান ধারণা অধিকতর প্রতিফলিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন। রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি মৌলিক সমস্যা লইযা আলোচনা করে (Political Philosophy deals with the fundamental problems of the nature of the State, citizenship, questions of right and duty and political ideals) এক অর্থে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ববর্তী কারণ উহার মৌলিক অনুমানগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। তথাপি রাষ্ট্রদর্শন যদি অস্পষ্ট এবং কল্পনাসর্বস্ব না হইতে চায় তাহা হইলে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রদত্ত মালমশলা ব্যবহার করিবে।

রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হইল। এইবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা পল জনেট

ফরাসী লেখক পল জানে (Paul Janet) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সরকারের নীতি লইয়া আলোচনা করে (Political Science is that part of social science which treats of the foundations of the State and the principles of Government).

ব্লাণ্টস্লি

জার্মান লেখক ব্লাণ্টস্লির (Bluntschli) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি, ইহার বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তন লইয়া আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায় (Political science endeavours to understand and comprehend the state in its fundamental conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development).

গার্ণার

অধ্যাপক গার্ণারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা স্বরু হয় রাষ্ট্রকে লইয়া, উহার পরিসমাপ্তিও ঘটে রাষ্ট্রকে লইয়া (Political Science begins and ends with the State).

ল্যাস্কি

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় (Political Science concerns itself with the life of men in relation to organised States).

গেটেল

আমাদের মনে হয় অধ্যাপক গেটেলের (Gettel) সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্র কি ছিল তাহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, রাষ্ট্র কি হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা এবং রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত তাহার দর্শনমূলক আলোচনা (Political science is a historical investigation of what the state has been, analytical study of what the state is and a politico-ethical discussion of what the State should be).

গেটেল অন্যত্র বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আলোচনা (Political Science is the study of the State in the past, present and future, of political organisation and political function, of political institution and political theories).

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Utility of the Study of Political Science): বর্তমানে অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার আলোচনাকে অবাস্তব এবং অফল-প্রসূ বলিয়া মনে করেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন বাস্তবতার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কহীন, বাস্তবে ইহার প্রয়োগ সম্ভব নয়, ইহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান, ইহা বিতর্কিত সমস্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিতে পারে না, এবং বাস্তব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষতিকর। এমারসনের (Emerson) মতে এই শাস্ত্রে কোন নূতন তথ্য, নূতন সত্য অথবা জ্ঞাতব্য কিছু নাই; কিন্তু ইহা সত্য নয়। আইভর ব্রাউন যথার্থই বলিয়াছেন যে সমাজজীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করিলে রাষ্ট্রচিজ্ঞানের আলোচনা বাস্তব এবং ফলপ্রসূ হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা মানুষকে সংস্কারমুক্ত হইতে এবং সঠিকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেয়। ইহা ইতিহাসকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করে; বর্তমান রাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝিতে অতীত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা অপরিহার্য। ইহার আলোচনা ব্যক্তিকে নাগরিক কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নাই তাহার পক্ষে নাগরিক অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া সহজ নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যক্তিকে সমাজও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছে; 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে এই মহান মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে ব্যক্তিকে সুনাগরিক হইতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানই ব্যক্তিকে সুনাগরিকতার আদর্শের সন্ধান দিতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের প্রকৃত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের স্বার্থকতা রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু আলোক প্রদান করে না—উহা ফল প্রসবিনীও বটে।

বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি মানবজীবনের এক অপরিহার্য ঘটনা। কোন না কোন সময়ে কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকেই কোন না কোন রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত। তাই বর্তমান যুগে রাষ্ট্রনীতির প্রতি উদাসীন মনোভাব লইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিক না হইলে শাসনব্যবস্থা ত্রুটিবিমুক্ত হইতে পারে না। ব্যবহারিক দিক হইতে বলা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে সকল নীতি এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন সংবিধান রচয়িতা, আইনসভার সদস্য, শাসক এবং বিচারকদের পক্ষে কার্যক্ষেত্র তাহাদের মূল্য অপরিসীম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান (Is Political Science a Science)? কোন শাস্ত্রকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে উহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া অর্থনীতি,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান. সমাজতত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের সমর্থকগণ নিজ নিজ বিষয়কে বিজ্ঞান-রূপে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। কতকগুলি শাস্ত্র আছে যেখানে তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নাই; যেমন, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা প্রভৃতি। আর কতকগুলি শাস্ত্র আছে যাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে মতবিরোধের অবকাশ রহিয়াছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শ্রেণীভুক্ত একটি শাস্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিতে পারে কিনা তাহা লইয়া পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে চরম বিজ্ঞান (Supreme Science) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এ্যারিষ্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মঁতেসকু (Montesquieu), বোঁদা (Bodin), হব্‌স (Hobbes), পোলক, সিজউইক, লর্ড ব্রাইস, ল্যাস্কি প্রভৃতি লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দান করিযাছেন; অপর পক্ষে বাকল (Buckle), কোঁৎ (Comte), মেটল্যাণ্ড (Maitland) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান না। উপহাস করিয়া একথাও বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি বিজ্ঞানের মর্যাদা পায় তাহা হইলে চৌর্যবৃত্তি কারিগরী জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে (If politics is science, then burglary should be called technology). একদা মেটল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যখন আমি পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যাহার শিরোনাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তখন আমি ওইরূপ শিরোনামের জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করি (When I see a set of examination questions headed by the word 'Political Science', I regret not the questions but the title.)

যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করার বিরোধী তাঁহারা কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষ ব্যাপক, জটিল, এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ। ইহার ফলে কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আলোচ্যমান উপাদানগুলির মধ্যে সমজাতীয়তার অভাব এবং বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দরুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য চালানো সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রসায়নবিদ অথবা পদার্থবিজ্ঞানীর মতো দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সার্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে পারেন না। মানুষের জীবনের এক বিশেষ দিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মানুষ জড় পদার্থ নয়। মানুষ পরিবর্তনশীল জীব, আর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। বিবর্তবুদ্ধি মানুষ সম্পর্কে আজ যাহা সত্য আগামী কাল তাহা সত্য বলিয়া মনে নাও

হইতে পারে। উপরন্তু, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুরও পরিধি ক্রমপ্রসারিত হইতেছে। মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব বলিয়া গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে অনুমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তৃতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীগণ এই যুক্তিও উপস্থাপিত করেন যে এই শাস্ত্রের কোন নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শ, কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। বার্কের (Burke) ভাষায় বলা যায় যে সৌন্দর্যতত্ত্বের বিজ্ঞান বলিয়া যেরূপ কোন বিজ্ঞান নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রতত্ত্বের বিজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই (There is no science of polities any more than there is a science of aesthetics); চতুর্থতঃ, যে উপাদানসমূহকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব রহিয়াছে আর রহিয়াছে বাস্তবতাবিবর্জিত অনুমানের প্রভাব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যথার্থ ই বিজ্ঞান কিনা তাহা জানিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে বিজ্ঞান কাহাকে বলে। পর্যবেক্ষণও পরীক্ষালব্ধ জগৎ ও জীবনের কোন এক বিশেষ দিক্ সম্পর্কে সুশৃংখলিত জ্ঞানই হইল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথমতঃ, ইহা জগত অথবা জীবনের এক বিশেষ শাখার আলোচনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক দিক লইয়া আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার দ্বারা লাভ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সত্য পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, এবং গবেষণার মাধ্যমে লাভ করা হয়। তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুসংহত, সুশৃংখলিত এবং কার্যকরণ সূত্রে গ্রথিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সুসংহত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও নীতি আবিষ্কার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বর্তমান। স্যার পোলক (Pollock) এই জন্যই বলিয়াছিলেন যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে নারাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাহাদের সঠিক ধারণার অভাব রহিয়াছে। তুলনা-মূলকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল নীতি এবং সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা মূলতঃ সত্য। এথেন্সের সফিষ্ট (Sophists) এবং গ্রীক দার্শনিকদের লেখা থেকে সুরু করিয়া আধুনিক যুগের চিন্তানায়ক অধ্যাপক ল্যাস্কির চিন্তাধারায় যুগের প্রভাব থাকিলেও বিবর্তনমূলক ধারা-বাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্লেষণ করিয়া বিপ্লবের কারণ এবং তাহার প্রতিকারের যে তথ্য আবিষ্কার করিয়া-

ছিলেন আজও তাহা সমান সত্য। অপরপক্ষে জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে কার্ল মার্কস (Karl Marx) যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়নি কারণ যে অনুমাণের উপর ভিত্তি করিয়া মার্কস ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্ত এবং কাল্পনিক ছিল। বাটলারের (Butler) ভাষায় পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎবাণী নির্ভুল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহা সম্ভাব্যতার অধিক কিছু নয় (Prediction in physics may be certain ; in politics it can at best be no more than probable)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান হইলেও ইহা পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় নিখুঁত বিজ্ঞানের (exact science) মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। স্যার পোলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিবিজ্ঞানের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিজ্ঞানের (Meterology) সহিত তুলনা করিয়াছে। আবহ-বিদ্যা আবহাওয়া সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করে কিন্তু ইহা কিছুপরিমাণে অনুমাণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সকল সময়ই ইহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও সেইরূপ কতকগুলি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, অপরাপর অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটিলে যাহা অভ্রান্ত। ক্যাটলিনও (George Catlin) বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান রসায়ন অথবা পদার্থবিদ্যার ন্যায় নিখুত বিজ্ঞান নয়, ইহা অর্থনীতির মতো অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ সমাজ বিজ্ঞান। লর্ড ব্রাইসের মতে ইহা অবরোহী (deductive) বিজ্ঞান নয়—ইহা একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental), পরিবর্তনশীল জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা ক্রমশই সহজ হইয়া উঠিতেছে। এই কারণে লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল বিজ্ঞান (progressive science) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Scope of Political Science) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এ্যারিষ্টটল মানুষকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা। অধ্যাপক গার্ণারের (Garner) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয় রাষ্ট্রকে লইয়া আবার উহার পরিসমাপ্তিও হইল রাষ্ট্রকে লইয়া (Political Science begins and ends with the state) আবার ডাঃ লীককের (Leacock) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল শুধুমাত্র সরকার।

কিন্তু এই উভয় মতই চরম বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন অধ্যাপক ল্যাস্কি, গেটেল এবং গিলক্রিস্ট। যাহা কিছু রাষ্ট্র ও মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্র এবং সরকার উভয়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সরকারকে জানা প্রয়োজন কারণ সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা কার্যকরী হয়। শাসনকার্য.পরিচালনা করিবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করে বলিয়া প্রসঙ্গতঃ আইনের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়ে।

রাষ্ট্র ও সরকারের স্বরূপ জানিতে হইলে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচনা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক দিক হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব. বিবর্তন এবং মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ, না করিলে কেহই বর্তমান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অথবা ভবিষ্যৎ স্থির করিতে পারিবে না। ঘটমান বর্তমানকে বুঝিবার জন্যই মূলতঃ অতীতের আলোচনা করা হয় এবং বর্তমানকে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ। (We are interested in what has occured chiefly because we want to understand what is occurring, and we want this again chiefly in order to influence what will occur (Burns). কিন্তু শুধুমাত্র অতীত রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান ধারণার আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিলে উহা রাষ্ট্রবিজ্ঞান না হইয়া ইতিহাসে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। বর্তমান তথা বাস্তবতার দিক দিয়াও এই শাস্ত্র বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা এবং সমকালীন রাষ্ট্রসমূহের অবলম্বিত কার্যাবলী আলোচনা করে। প্রত্যেকটি মানবিক সমস্যার দুইটি দিক আছে—একটি তাত্ত্বিক, অপরটি সংগঠনিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের আলোচনায় উহার তত্ত্বগত এবং সংগঠনগত উভয় দিকের প্রতিই সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র বাস্তবকে লইয়া আলোচনা করে না—আদর্শ লইয়াও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের স্বরূপই শুধু এই শাস্ত্রের বিচার্য বিষয় নয়, উহার স্বরূপ কি হওয়া উচিত তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। রবসনের (Robson) ভাষায় কি ছিল অথবা আছে শুধু তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়—কি হওয়া উচিত তাহাও উহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় যে রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভংগী হইতে আলোচনা

করিয়া ইউনেস্কো (UNESCO) মোটামুটি চার শ্রেণীর বিষয়কে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে—(১) রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও তাহাদের ইতিহাস, (২) রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও উহার সংবিধান, (৩) রাষ্ট্রনৈতিক আইন, নীতি ও সংগঠন এবং (৪) রাষ্ট্রনৈতিক দল, সংস্থাসমূহ, জনমত এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি (Methods of Political Science) : আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান, চরম সত্যের পরিবর্তে আপেক্ষিক সত্যে উপনীত হওয়াই ইহার লক্ষ্য। এই কারণে সকল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেই মতদ্বৈধতা দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন সম্পর্কেও বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আগষ্ট কোঁতের (Comte) মতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং তুলনামূলক আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি। ব্লাণ্টস্লি (Bluntschli) দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমান যুগের বহু চিন্তানায়কগণের মতে আরোহী (Inductive) পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভুল সূত্রে উপনীত হওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণার কোন সুযোগ নাই বলিয়া নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতির ব্যবহার হইয়া থাকে নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল :

[এক] **পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Method of Observation) :** পর্যবেক্ষণ-মূলক প্রণালী রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একটি আরোহী (Inductive) পদ্ধতি। লর্ড ব্রাইস ও লাওয়েল এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যসমূহ বিশেষ সতর্কতায় সহিত পর্যবেক্ষণ করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায় সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং আপাত সাদৃশ্য পরিহার করিয়া অগ্রসর হইবেন। পর্যবেক্ষণ যদি নির্ভুল এবং ত্রুটিমুক্ত না হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করিবে না। লর্ড ব্রাইস তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The American Commonwealth এবং Modern Democracies রচনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া সেখানকার শাসনকার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাওয়েলও (Lowell) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান নয়

(Politics is an observational and not an experimental science); তিনি আরও বলিয়াছেন রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর গবেষণাগার গ্রন্থাগার নয়—প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ। পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতির কয়েকটি গুণ আছে। ইহা ব্যবহারিক, বাস্তব, এবং জীবনের সহিত সংগতিপূর্ণ। বাস্তব ঘটনার সহিত যোগসূত্র থাকায় ইহা অবাস্তবতার অভিযোগ হইতে মুক্ত। তথাপি এই পদ্ধতি অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত, ঘটনাসমূহ সংখ্যায় অধিক এবং পরস্পর বিরোধী হইলে শিক্ষণপ্রাপ্ত চোখ এবং পরিণত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে। ঘটনাসমূহকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিবার মতো যোগ্যতা গবেষকের থাকা চাই। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কিন্তু স্বয়ং তথ্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই যদি না সম্যকভাবে উহাদের ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করা হয়।

[দুই] **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method):** যে সকল সমালোচকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ তাঁহাদের প্রধান যুক্তি হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার সুযোগ নাই। রসায়নবিদ রসায়ণের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া যেভাবে পরীক্ষা কার্য চালাইয়া যাইতে পারেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ওইভাবে পরীক্ষা কার্য চালানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষাকার্য চালানো বিপজ্জনকও বটে। বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান অথবা একনায়কতন্ত্র অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণে জনজীবনে উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য উহাদের প্রবর্তন করা খুবই বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরীক্ষামূলক ·পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব কারণ উহার বিষয়বস্তু হইল প্রাণহীন জড়পদার্থ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হইল ইচ্ছাশক্তি এবং চেতনাসম্পন্ন মানুষ। গবেষণার উপাদানসমূহ চেতনাসম্পন্ন, পরিবর্তনশীল এবং অসমজাতীয় হইলে পরীক্ষা—মূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয় না। এই কারণেই লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে মানুষের রাজনৈতিক জীবন শুধুমাত্র বর্ণনাই করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হইলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে সচেতন অথবা অচেতনভাবে সকল সময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নূতন আইন, নূতন প্রতিষ্ঠান, নূতন নীতি পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ উহাদের ফল সন্তোষজনক হইলে উহারা স্থায়িত্ব লাভ করিবে আর ক্ষতিকারক হইলে পরবর্তীকালে উহাদের বর্জন করা হইবে।

[তিন] **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) :** এই পদ্ধতি এক ধরনের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এবং মূলতঃ আরোহী (inductive) ; ঐতিহাসিক পটভূমিতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথার্থ আলোচনা হইতে পারে। ইতিহাসের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উহাদের উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্তনের ধারাটি জানা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পোলকের (Pollock) ভাষায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রবণতার ব্যাখ্যা করে। ইতিহাস যে গোপনে গোপনে ভুবনে ভুবনে কাজ করিয়া যাইতেছে এবং উহার মধ্যেই ভবিষ্যতের অভ্রান্ত পথনির্দেশ রহিয়াছে এই পদ্ধতি সেই সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়। ক্রমবিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা করা হয় বলিয়া এই পদ্ধতি বিবর্তনবাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি যে ইহা মূল্যবোধ (values) লইয়া আলোচনা করে না। সুতরাং এই পদ্ধতির সহিত দার্শনিক পদ্ধতির যুগ্ম ব্যবহারই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সত্যসিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করিবে। অবশ্য পরোক্ষভাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি আমাদের বিচারবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

এই পদ্ধতি অনুসারে গবেষণারক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আপাত সাদৃশ্য পরিহার করিবেন। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণরূপে অতীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিলে ভুল হইতে পারে, গবেষক তাঁহার ব্যক্তিগত পূর্ব ধারণার বশবর্তী হইয়া ইতিহাসের গতির ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীকে মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করে এই প্রবাদ অর্ধসত্য ; অপর অর্ধসত্য হইল যে ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করে না।

[চার] **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) :** তুলনামূলক পদ্ধতি ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিপূরক। ইহা অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং এ্যারিষ্টটলই সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি ১৫৮টি নগররাষ্ট্রের সংবিধানের বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত আসিয়াছিলেন। এ্যারিষ্টটলকে অনুসরণ করিয়া বর্তমানযুগে ডি টকভিল (De Tocqneville) লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce), মর্তেস্কু (Montesqueu), হেনরী মেন (Henry Main) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছেন।

এই পদ্ধতিতে অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইতিহাসের বহু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুলনীয় বিষয়গুলিকে গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পরিহার করিয়া গবেষক তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই পদ্ধতি ঘটনাসমূহকে গ্রথিত করিয়া উহাদের মধ্যে কার্যকারণ সূত্র নির্ধারণে আমাদের সহায়তা করে।

তুলনামূলক পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধুমাত্র ঘটনাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যই লক্ষ্য করিবে না, উহাদের পার্থক্যও দেখিবেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের নেশায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তুলনীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের পার্থক্য অগ্রাহ্য করিলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

তুলনামূলক পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপ হইল সাদৃশ্য অনুমান (analogy).; অধিক দূর অগ্রসর না হইলে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সাদৃশ্য অনুমান প্রমাণ নয় ; ইহা নিশ্চয়তার পরিবর্তে সম্ভব্যতা নির্দেশ করে।

[পাঁচ] **পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকই আছে। পবিমাণগত দিকে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য গণনা ও পরিমাপ করা যায় সেগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। গণতান্ত্রিকদেশসমূহে ভোটাধিক্যের মাধ্যমে দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা পরিসংখ্যানেরই ব্যবহার। অবশ্য পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি কোন স্বয়ংনির্ভরশীল পদ্ধতি নয়—অন্য কোন পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে ইহা কাজ করিয়া থাকে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক অবস্থা, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি যে সকল তথ্য সম্পর্কে পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয় তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক নীতি নির্ধারণে এবং শাসন সংস্কারে বিশেষ সহাযতা করে।

[ছয়] **দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method) :** ইহা একটি অবরোহী (deductive) পদ্ধতি। রুশো, মিল, সিজউইক (Sidgwick) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। এই পদ্ধতি অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, কার্যপরিধি, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করিয়া থাকে। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করে। ইহা কতকগুলি অমূর্ত ধারণা লইয়া আলোচনা সুরু করে এবং পরে উহার সহিত বাস্তব ঘটনাব সামঞ্জস্য বিধান করে।

এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি যে ইহা সহজেই নিছক কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হইতে পারে। মুরের (More's) Utopia এবং কিছু পরিমাণে প্লেটোর Republic গ্রন্থে ইহাই ঘটিয়াছিল। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

[সাত] **আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method):** এই পদ্ধতি রাষ্ট্রকে আইনমূলক সংস্থা হিসাবে গণ্য করে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতিবিজ্ঞান হিসাবে কল্পনা করে। বহু জার্মান এবং ফরাসী লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় এই পদ্ধতির ব্যবহার সমর্থন করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন এবং আইনকে কার্যকর করার মধ্যেই রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলনীতি-সমূহের সন্ধান মিলিবে। শুধুমাত্র আইনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সম্পর্ক অনুশীলন করা হয়—আইন বহির্ভূত সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাব স্বীকার করা হয় না। কিন্তু অধ্যাপক গার্ণার (Garner) যথার্থই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র আইনগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার করলে উহা একতরফা এবং সংকীর্ণতা দোষদুষ্ট হইতে বাধ্য।

[আট] **মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method):** মনোবিজ্ঞান একটি নূতন বিজ্ঞান এবং ইহার সমর্থকগণ ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবনের সর্বত্রই ইহার প্রয়োগ করিতে আগ্রহী। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত আছে (Politics has its roots in Psychology) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের সূত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পায়। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ কতখানি তাহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, জনমত গঠনে কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি কাজ করে ইত্যাদি সম্পর্কে এই পদ্ধতি আলোকপাত করিতে পারে। বেজহট (Bagehot) বলিয়াছেন বৃটিশ জনগণের এক বিশেষ মনস্তত্ত্বই ওই দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের কারণ। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে সকল কিছু মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত হইবে না কারণ ইহা সমস্যাটির নৈতিক দিক লইয়া আলোচনা করিতে পারে না।

[নয়] **জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method):** এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্র ও জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়। জার্মান লেখক ব্লাণ্টস্লি (Bluntschli) এবং ইংরেজ লেখক হার্বার্ট স্পেনসার (Spencer) রাষ্ট্রের সহিত জীবন্ত প্রাণীর তুলনা করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে জীবদেহ এবং

জীবদেহের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই পদ্ধতি হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

[দশ] **সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি** (Sociological Method): এই পদ্ধতি জীব-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির অনুরূপ। ইহা রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক জীবরূপে কল্পনা করে। ব্যক্তিকে সমাজশরীরের কোষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। মানুষের মত রাষ্ট্রও বিবর্তনের ফল। নাগরিকগণের গুণাগুণ অনুসারে রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটিভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আরোহী পদ্ধতি (Inductive) এবং অবরোহী পদ্ধতি (Deductive); আরোহী পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, অপরপক্ষে অবরোহী পদ্ধতিতে আমরা সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কেও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। অধ্যাপক গার্ণারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণায় আরোহী পদ্ধতির এবং প্রয়োগবাদের (Pragmatism) মূল্য অধিক। এই মতানুসারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতির একত্র সমবায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা চরম মত বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যে কোন শাস্ত্রেরই বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য আরোহী এবং অবরোহী উভয় পদ্ধতিই প্রয়োজন। পথ চলিতে যেরূপ ডান ও বাম পায়ের প্রয়োজন আছে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আরোহী ও অবরোহী উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োজন রহিয়াছে। তাই গোখেলও বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়া চলিবেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতির সহিত দার্শনিক পদ্ধতির একত্র সমবায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত হইলে চরম সাফল্য লাভ করা যাইবে। তাই লিপসনও (Lipson) বলেন বর্ণনার সহিত তত্ত্বের মিলনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করাই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি (The method of Political Science is an evaluative analysis uniting description with theory.)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relationship of Political Science with other Sciences): রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন লইয়া আলোচনা করা হয় রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়াও মানুষের জীবনের

বিভিন্ন দিক রহিয়াছে আর এক একটি দিক লইয়া আলোচনা করিবার জন্য এক একটি শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ও পরিবেশ লইয়া আলোচনা করে বলিয়া প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির কিছু সম্পর্ক থাকিবে। সিজউইক (Sidgwick) যথার্থই বলিয়াছেন যে কোন শাস্ত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ওই শাস্ত্রের সম্পর্ক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শুধু তাহাই নয়, এইভাবে সম্পর্ক স্থাপনের দরুন প্রতি শাস্ত্রই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পলজানে (Paul Janet) বলিয়াছেন যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি শাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ওই সকল শাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার সত্য আবিষ্কারের জন্য বহু তথ্য গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করা হইল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Political Science and Economics): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অর্থনীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না। অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি শাখা বলিয়া মনে করা হইত। গ্রীকগণ মনে করিতেন যে অর্থনীতি রাষ্ট্রের অর্থ-সংগ্রহের একটি উপায় মাত্র। অবশ্য বর্তমানে এই মত স্বীকৃত না হইলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রহিযাছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথই (Adam Smith) প্রথম অর্থনীতিকে একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানের মর্যাদায় ভূষিত করেন।

অর্থনীতি

এ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার মতে অর্থনীতি হইল সম্পদ অথবা ধনসম্পর্কিত বিজ্ঞান। এ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞায় "সম্পদের" উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় দার্শনিকগন তীব্রভাবে এই শাস্ত্রের নিন্দা করেন। রাস্কিন (Ruskin) ইহাকে 'কুবেরের সুসমাচার" বলিয়া উপহাস করিযাছেন। দার্শনিকগণের মতে এই শাস্ত্রের আলোচনা মানুষকে নীচ,জড়বাদী, স্বার্থসর্বস্ব এবং অর্থলোলুপ করিযা তোলে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিসম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই এই নিন্দাবাদের মূল কারণ। দার্শনিকগণের নিন্দাবাদ খণ্ডনের জন্য উনবিংশ শতকের শেষভাগে আলফ্রেড মার্শাল (Marshall) অর্থনীতির নবতর সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়া বলিলেন, অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে; ইহা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সেই সকল কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে যাহা মানুষের বৈষয়িক কল্যাণসাধনের জন্য অপরিহার্য—সুতরাং একদিকে ইহা সম্পদের আলোচনা করে, কিন্তু ইহার অপর এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল মানুষের

আলোচনা। মার্শালের সংজ্ঞায় কিছু অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধ্যাপক রবিনস (Robbins) অর্থনীতির সর্বাধুনিক সংজ্ঞা দিয়াছেন ; তাঁহার মতে অপ্রচুর বস্তু, যাহার একাধিক অভাবপূরণের ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার সহিত উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লাণ্টস্লির মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি, উহার বিবর্তন এবং বিভিন্ন রূপ লইয়া আলোচনা করে। ফরাসী লেখক পল জানের (Paul Janet) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহ লইয়া আলোচনা করে। গেটেলের (Gettel) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সরকারের গঠন প্রকৃতির উপর সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নির্ভর করে। সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া পরিচালিত হয়। আবার মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পিছনে প্রায়শই অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান থাকে। এমন বহু সমস্যা আছে যাহা রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির সাধারণ সমস্যা, যেমন শ্রমিক আইন, শুল্ক আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যাবলী। সাম্য স্বাধীনতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শগুলির সার্থক উপলব্ধির পূর্বসর্ত হইল শোষণ এবং ধনবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে দেশের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে । গ্রেট বৃটেনে ব্যাপকভাবে শিল্পের জাতীয়করণ এবং সোভিয়েৎ রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বর্তমান যুগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কের নৈকট্য এবং গভীরতা প্রমাণ করে। উভয় শাস্ত্রই মানব-জীবনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে রত। সরকারী হস্তক্ষেপের দরুন বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সার্থক সমাধান হইয়াছে। বর্তমানকালে সুষ্ঠুভাবে নাগরিক দায়িত্ব পালন করিতে হইলেও কিছুপরিমাণে অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বার্বারা উটন (Barbara Wooton) বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিকে যথার্থ নাগরিক হইতে হইলে কিছু পরিমাণ অর্থনীতির জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

এই দুইশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক থাকিলেও যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) মন্তব্য করিয়াছেন যে অর্থনীতি দ্রব্য লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষ লইয়া—অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হইল দাম

(Price) অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল প্রকৃত মূল্য (Real value) ; অর্থনীতি ততদূর পর্যন্ত মানুষ লইয়া আলোচনা করে যতদূর পর্যন্ত তাহাদের দ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয় এবং ব্যবহারের সহিত সম্পর্ক আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও দ্রব্য লইয়া আলোচনা করে কিন্তু উহা মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সহজেই আদর্শমূলক বিজ্ঞানে (Normative Science) পরিণতি লাভ করে কিন্তু অর্থনীতি বর্ণনামূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ (Positive Science) বিজ্ঞান। উপহাস করিয়া বলা হইযাছে অর্থনীতিবিদ সকল কিছুরই দাম জানে কিন্তু কোন কিছুরই মূল্য জানে না। অবশ্য বর্তমানে অর্থনীতি ক্রমশই আদর্শমূলক বিজ্ঞানের রূপ গ্রহণ করিতেছে—কল্যাণমূলক অর্থনীতি (welfare economics) নামক অর্থনীতির যে শাখাটি রহিয়াছে তাহা শুধুমাত্র ধন উৎপাদন লইয়াই আলোচনা করে না, উহার ন্যায্য বণ্টনও ইহার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History): ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই গভীর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাসের আলোচনা অর্থহীন আবার ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ভিত্তিহীন ("History without Political Science has no fruit, Political Science without History has no root" Seeley) ইতিহাস হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত হয়। ইতিহাসের চরম ফল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্র একদিনে উদ্ভূত হয় নাই—ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন এবং অগ্রগতির ফলেই উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তন কিভাবে হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করা প্রয়োজন আর ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর আলোচনা করা প্রযোজন। ইতিহাস হইল বিগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল বর্তমান ইতিহাস (History is past politics, politics is present history) ; উইলোবী (Willoughby) বলিয়াছেন ঐতিহাসিক তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে গভীরতা দান করিয়াছে (History provides the third dimension to political science) রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যের আলোকে ইতিহাস আলোচিত না হইলে উহার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং বিংশতাব্দীর ইতিহাস হইতে সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং ন্যাৎসীবাদ ইত্যাদি সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্জন করিলে ওই সকল যুগের পূর্ণাংগ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া বসৌলি লিয়াছেন, ইতিহাস নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনা মূল্যহীন এবং অতি সাধারণ হইয়া পড়ে আর যে ইতিহাস

রাষ্ট্রনীতির সহিত সম্পর্ক হারায় তাহা নিছক সাহিত্যে পরিণত হয় (Politics are vulgar when not liberalised by history and history fades into mere literature when it loses sight of its relation to politics) ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া লর্ড একটন (Acton) বলিয়াছিলেন নদীর বালুবেলায় সঞ্চীয়মান স্বর্ণের মতো ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে। বার্জেসের (Burgess) মতে ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিলে একটি পংগু আর অন্যটি আলেয়ায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ইতিহাস হইল অতীত রাষ্ট্রনীতি আর রাষ্ট্রনীতি হইল বর্তমান ইতিহাস—ফ্রিম্যানের (Freeman) এই মতের বিরোধিতা করিয়া গার্ণার বলিয়াছেন ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ব্যাপক শাস্ত্র। ইতিহাসে মানবসভ্যতার এরূপ বহু দিকের আলোচনা আছে যাহাদের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই আবার অনেক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ আছে যাহারা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও দার্শনিক চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের মর্যাদা লাভ করিয়াছে ; উদাহরণস্বরূপ সামাজিক চুক্তি মতবাদ, আদর্শবাদ, হিতবাদ প্রভৃতি মতবাদের উল্লেখ করা যায়। তাই বার্কার (Barker) বলিয়াছেন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত না হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক সার্থক মতবাদ রহিয়াছে। (you may have a political theory which is a good theory without being rooted in historical study)

ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল পার্থক্যগুলি হইল এইরূপ :

(১) পদ্ধতিগত পার্থক্য : ইতিহাস সময় পরম্পরায় ঘটনাসমূহের আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলিকেই শুধুমাত্র বাছিয়া লয়। ইতিহাস বর্ণনামূলক, অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনমূলক (reflective), ইতিহাস হইতে মালমশলা গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

(২) আলোচনার পরিধি : ইতিহাসের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপক কারণ ইহা সমাজজীবনে অর্থনৈতিক, সামরিক, ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল কিছুরই আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের শুধুমাত্র সেই সকল দিক লইয়া আলোচনা করে যাহাদের সহিত রাষ্ট্রবিবর্তনের কোন সম্পর্ক আছে।

(৩) ইতিহাস ঘটনা লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শ লইয়া আলোচনা করে। আদর্শ রাষ্ট্র কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা

করে অপরপক্ষে রাষ্ট্র কিরূপ ছিল বা আছে ইতিহাস তাহাই আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস হইতে তথ্যগ্রহণ করিলেও উহা ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়া যায়। নৈতিক বিচার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ হইলেও উহা ঐতিহাসিকের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (**Political Science and Sociology**): মানসিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনের যে ভূমিকা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের সেই ভূমিকা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষা সংকীর্ণ, আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র। সমাজবিজ্ঞান সমাজের সকল দিক লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্র এক বিশেষ ধরণের সামাজিক সংগঠন বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের তুলনায় এক বিশেষীকৃত বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্ব সকল প্রকার মানবগোষ্ঠীর (Groups) গঠন ও কার্য প্রণালী লইয়া আলোচনা করে অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক বিশেষ ধরণের গোষ্ঠী অর্থাৎ রাষ্ট্র লইয়া আলোচনা করে। পল জানে (Janet) উভয় শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের ভিত্তি ও স্বরূপ এবং শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহ লইয়া আলোচনা করে। ক্যাটলিনের (Catlin) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের এক বিশেষিকৃত শাখা (specialised branch) সমাজবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে। সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রম বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি জানিতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্থক আলোচনা হইতে পারে। এইজন্য অধ্যাপক গিডিংস (Giddings) বলিয়াছেন সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকিলে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না। তাঁহার মতে নিউটনের তত্ত্বজ্ঞান হীন ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার মতো সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া নিষ্ফল ও নিরর্থক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। প্রথমতঃ, সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সকল দিক লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের দিক লইয়াই শুধু আলোচনা করে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞান মানুষের সংগঠিত এবং অসংগঠিত সকল প্রকার সামাজিক সংস্থা লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র সংগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ লইয়া আলোচনা করে। সমাজ জীবনের বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম সমাজবিজ্ঞানের অনেক পরে ; সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাচীন।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক লইয়া যেমন আলোচনা করে সেইরূপ পরিবার, প্রথা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি লইয়াও আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র প্রথমোক্ত বিষয়টি লইয়া আলোচনা করে।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের শুধুমাত্র সচেতন কার্যাবলী লইয়া আলোচনা করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মানুষের সচেতন এবং অবচেতন সামাজিক কার্যাবলী লইয়াও আলোচনা করে।

পঞ্চমতঃ, মানুষ স্বভাবতঃই রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক প্রাণী ইহা ধরিয়া লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এই অনুমানকে স্বীকার না করিয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখায় কেন এবং কেমন করিয়া মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণীতে পরিণত হইল।

পরিশেষে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সংগঠনসমূহের উদ্ভব, বিবর্তন এবং বর্তমান রূপ লইয়া আলোচনা করে, অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিবর্তন এবং বর্তমান রূপ লইয়াই শুধু আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে না—আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়াও আলোচনা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে সমাজবিজ্ঞান হইল বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল আদর্শমূলক বিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics) :—নীতিশাস্ত্র মানবজীবনের ভালোমন্দ এবং ন্যায় অন্যায় লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক এরূপ গভীর যে দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্রেরই একটি শাখা হিসাবে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার মূল্য বিচার হইবে নৈতিক মানদণ্ডে। রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করিয়াই মানুষ তাহার নৈতিক আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে। এ্যারিষ্টটলের মতে একমাত্র ভালো রাষ্ট্রেই ভালো নাগরিকের থাকা সম্ভব—রাষ্ট্র মন্দ হইলে নাগরিকও মন্দ হইবে। যদিও মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তথাপি ইহার উদ্দেশ্য মানবজীবনকে সুন্দর এবং মহৎ করিয়া তোলা। ফয় (Foy) বলিয়াছেন যাহা নীতির দিক

হইতে অন্যায় তাহা রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতেও ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না (If a thing is morally wrong it can never be politically right).

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীয় চিন্তানায়ক মেকিয়াভেলিই (Machiavelli) সর্বপ্রথম নীতিশাস্ত্রের কবল হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করিয়া পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত নীতিবোধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক নীতিবোধের মধ্যে পার্থক্য আছে। ম্যাকিয়াভেলি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Prince-এ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলিলেন ধর্ম এবং নীতি রাষ্ট্রের প্রভু নয়, এমন কি নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শকও নয়—উহারা রাষ্ট্রের প্রযোজনীয় ভৃত্য।

বর্তমানকালের লেখকগণ অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক আছে তাহা স্বীকার করেন। রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার মূল্যায়ন নৈতিক মানদণ্ডেই হওয়া উচিত। লর্ড একটন (Acton) বলিয়াছেন সরকার কি করিতেছে তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যা নয়—সরকারের কি করা উচিত তাহা আবিষ্কার করাই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কাজ (The great question of politics is to discover not what governments prescribe, but what they ought to prescribe) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রকে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয় শাস্ত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। নীতিশাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি চোরাবালির উপর স্থাপিত হইবে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নীতিশাস্ত্র সংকীর্ণ এবং অবাস্তব হইয়া পড়িবে। আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য রহিয়াছে, কোন গুণগত পার্থক্য নাই কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রেরই পরিবর্তিত রূপ (politics is but ethics writ large); তিনি আরও বলিযাছেন যে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ এবং নীতিশাস্ত্র ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা অর্থহীন ও অসার। আইন এবং প্রতিষ্ঠান নীতির ভিত্তিতে গঠিত না হইলে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না কারণ নৈতিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি (Laws and institutions, not based on moral principles, cannot endure long, for the most potent of all forces is the mental force of the World)."

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞানের আদর্শে রূপায়ন বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর এক অভিনব প্রয়াস। নীতিবোধ উপেক্ষা করিয়া কোন রাষ্ট্রই নাগরিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। বর্তমান যুগের অসুস্থতা এবং অশান্তির মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে নীতিজ্ঞানবিবর্জিত রাষ্ট্রনীতির মধ্যে। নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। ক্যাটলিন (Catlin) বলেন যে নীতিশাস্ত্র হইতে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিখিবে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন্‌টি বাঞ্ছনীয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সে শিখিবে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকিলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশাস্ত্র ব্যাপক। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় আচরণই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণ লইয়াই আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় মানদণ্ড এবং নৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এইজন্য রাষ্ট্রের আইনে যাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় নৈতিক মানদণ্ডে তাহা অন্যায় নাও হইতে পারে। রাস্তার ডান দিক দিয়া সাইকেল চালানো দণ্ডনীয় কিন্তু ইহা দুর্নীতিমূলক তাহা বলা চলে না। আবার মিথ্যাভাষণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে সাধারণতঃ কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে উহা অন্যায়। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় আইন ভংগ করিলে ব্যক্তিকে শাস্তি পাইতে হয় কিন্তু নৈতিক আইন ভংগকারীকে শুধুমাত্র বিবেকের দংশন ভোগ করিতে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): মনোবিজ্ঞান আধুনিক কালের বিজ্ঞান। ইহার সমর্থকগণ ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবনের সর্বত্রই ইহার প্রয়োগ করিতে আগ্রহী। বার্কার (Barker) বলিয়াছেন মানব জীবনের জটিল কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের প্রয়োগ করা বর্তমান জগতের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ জীববিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চিন্তা করিতেন, আমরা মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চিন্তা করি। (The application of psychological clue to the riddles of human activity has indeed become the fashion of the day. If our fathers thought biologically, we think psychologically). আরও বলা হয় যেদিন বেজহটের Physics and Politics প্রকাশিত হইয়াছে সেদিন হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল নিহিত আছে (Politics has its roots in psychology). সরকারকে দৃঢ় এবং জনপ্রিয় হইতে হইলে উহাকে জনগণের মানসিক ধ্যান ধারণা এবং নৈতিক মূল্য বোধের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে মানুষ কিরূপ আচরণ করে তাহা জানিলে তবেই আমরা রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। বেজহটের মতে ইংরেজ জনগণের এক বিশেষ মনস্তত্ত্বই ওই দেশে সার্থক নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনে সহায়তা করিয়াছে। রাষ্ট্র-

নৈতিক চিন্তাধারায় যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ম্যাকডুগাল, (Mcdougall), লে বঁ (Le Bon), তার্দে (Tarde) এবং হার্বার্ট স্পেনসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের প্রয়োগ যে বিশেষ মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহুকাল ধরিয়া দর্শনশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিয়াছে বলিয়া মানবিক আচরণের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ কি ধরনের আচরণ করিবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকিলে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না। মানুষের আচরণ ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে অভ্যাস, প্রবণতা (instinct), অনুকরণ (imitation), দলীয়-মন (group mind) প্রভৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এইজন্য লে বঁ বলিয়াছেন সরকারকে স্থায়ী এবং জনপ্রিয় হইতে হইলে জাতির মানসিক গঠনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। অসংগঠিত জনতার (Mob) মনস্তত্ত্ব বর্তমান ইউরোপের বহু রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার স্বরূপ বুঝিতে সাহায্যে করিবে।

অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় মনস্তত্ত্বের ভূমিকা থাকিলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাই মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মনোবিজ্ঞান

পার্থক্য

শুধুমাত্র অবস্থা লইয়া আলোচনা করে—আদর্শ লইয়া আলোচনা করে না অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শমূলক বিজ্ঞান। মনস্তত্ত্ব মানুষের মানসিক চিন্তাধারা ও বাহ্যিক আচরণ উভয়ই আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণ লইয়াই আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (Political Science and Geography): প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থা মানব জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক সম্পদ, দেশটির আয়তন ও অবস্থান সংশ্লিষ্ট জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। এই সকল বাহ্যিক উপাদান মানবজীবনকে প্রভাবিত করিলেও মনে রাখিতে হইবে যে সভ্য মানুষ প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক নয়। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মতো সে অন্ধভাবে প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করে না করিয়া স্বয়ং প্রকৃতিকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া লয়।

এ্যারিষ্টটলই প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন এবং জাতীয় চরিত্রের উপর ভৌগোলিক প্রভাব লক্ষ্য করেন। বর্তমান লেখকদের মধ্যে বোঁদা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার পর রুশো জলবায়ু ও সরকারের রূপের মধ্যে সহ-সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে উষ্ণদেশে স্বৈরাচারতন্ত্র, শীত প্রধান

দেশে বর্বরতা এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আদর্শ শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে গণতন্ত্র এবং বৃহৎ দেশের পক্ষে রাজতন্ত্র আদর্শ সরকার। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টমাস বাক্‌ল (Thomas Buckle) তাঁহার History of Civilization গ্রন্থে বলেন যে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অনেকাংশই ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি মানুষের জীবনে জলবায়ু, খাদ্য, মৃত্তিকা এবং প্রকৃতির সাধারণ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অবশ্য বাক্‌লের চরম মত অতিরঞ্জিত দোষদুষ্ট বলিয়া আধুনিক লেখকগণ উহা গ্রহণ করেন না। অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া বলা যায় যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের কিছু প্রভাব আছে। এই সঙ্গে একথাও যোগ করা যায় যে অতীতে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে ভূগোলের যে প্রভাব ছিল বর্তমানে তাহা আর নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

॥ The State ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Definition of State—Difference between State, Government and other Associations.

বিষয়বস্তু ঃ রাষ্ট্র—সংজ্ঞা ও উপাদান—জনসমষ্টি—ভূখণ্ড—সরকার—সার্বভৌমত্ব—স্থায়িত্ব—স্বীকৃতি - পশ্চিমবঙ্গ অথবা নিউইয়র্ক কি রাষ্ট্র—রাষ্ট্র ও সরকার— রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্র ও সমাজ।

রাষ্ট্রঃ সংজ্ঞা ও উপাদান (The State : Definition and its Elements) : প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং যে কোন দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটলের মতে "রাষ্ট্র হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে গঠিত কতকগুলি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি।" ইহা নগর-রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, আধুনিক রাষ্ট্রের যথার্থ সংজ্ঞা হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা চলে না।

বার্জেসের (Burgess) মতে "মানবজাতির কোন অংশ সংঘবদ্ধ হইলে রাষ্ট্র গঠিত হয়।" ব্লণ্টস্লির (Bluntchli) মতে রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি।" ম্যাকাইভারের (MacIver) মতে "রাষ্ট্র হইল এমন একটি সংগঠন যাহা পীড়নমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিয়া নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত জনসমষ্টির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।" ল্যাস্কির (Laski) মতে "রাষ্ট্র" হইল সরকার ও প্রজায় বিভক্ত ভৌগোলিক সমাজ, যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত অপরাপর সংগঠনের উপর কর্তৃত্ব করে।"

কতিপয় সংজ্ঞা

উড্রো উইলসন (Wilson) বলেন "রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনানুসারে গঠিত জনসমষ্টি।" গার্ণারের (Garner) সংজ্ঞা মৌলিক না হইলেও নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার মতে, "রাষ্ট্র হইল বৈদেশিক শাসনমুক্ত এমন এক জনসমষ্টি যাহা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং উহার এমন এক সুগঠিত সরকার আছে যাহার প্রতি অধিকাংশ নাগরিক স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে।"

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা উহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা

উপাদান দেখিতে পাই: জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব, স্থায়িত্ব এবং স্বীকৃতি।

[এক] **জনসমষ্টি (Population):** রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান হইল জনসংখ্যা। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি না। জনহীন মরুভূমিতে অথবা সমুদ্রবক্ষে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। জোট বাঁধিয়া একত্রে বসবাস করিবার সহজাত মানব প্রবৃত্তিই রাষ্ট্র গঠনের মূল প্রেরণা।

রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নাগরিক এবং বিদেশী। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। পরিবর্তে রাষ্ট্র ইহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। বিদেশীরা অন্য রাষ্ট্রের সদস্য এবং নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে কিন্তু অস্থায়ীভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাস করিতেছে। বিদেশীগণ শুধুমাত্র সামাজিক অধিকার ভোগ করে, কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার দাবী করিতে পারে না।

রুসো (Rousseau) জনসংখ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—নাগরিক এবং প্রজা (Subject)। যাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে তাহারা হইল নাগরিক, আর যাহারা রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে তাহারা প্রজা। নাগরিক হিসাবে জনগণ অধিকার ভোগ করে, প্রজা হিসাবে কর্তব্য পালন করে।

জনসংখ্যার পরিমাণ

রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কি হইবে এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। প্লেটোর মতে আদর্শ নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫০৪০ হইবে। তাঁহার মতে জনসংখ্যা খুব কম হইলে শাসন কাজে অসুবিধা ঘটিবে আবার উহা অতিরিক্ত হইলে সুশাসনে অসুবিধা হইবে। এক লক্ষ জনসংখ্যাকে এ্যারিষ্টটল অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। রুশোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হইবে ১০,০০০।

আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। মোনাকো এবং সানমারিনোর মতো রাষ্ট্রে মাত্র কয়েক হাজার লোক বাস করে আর চীন, ভারত, সোবিয়েৎ রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহদায়তন রাষ্ট্রে কোটি কোটি লোক বাস করে।

[দুই] **ভূখণ্ড (Territory):** রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান হইল ভূখণ্ড। যাযাবর জাতির কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি নাই বলিয়া উহা রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। প্যালেষ্টাইনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার পূর্বে ইহুদিদের কোন

রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি মাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে।

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভূমিভাগকেই বুঝায় না, রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল নদনদী জলাশয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত। কোন রাষ্ট্রের সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে সমুদ্রতট হইতে তিন মাইল পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রের এলাকাধীন ভূ-খণ্ডের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড বলিয়া গণ্য হয়। ইহা ছাড়া বিদেশী দূতাবাসগুলিও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিয়া গণ্য হয়।

ভূখণ্ডের পরিমাণ

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কতখানি হইবে এ সম্পর্কেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। প্রাচীন গ্রীকরা মনে করিতেন যে রাষ্ট্রের আয়তন নগরের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে; আবার রোমানরা মনে করিতেন যে সমগ্র পৃথিবীর পরিধিও রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। গ্রীকরা মনে করিতেন রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ হইলে উহা সুশাসন করা কঠিন হইবে, আবার অতি ক্ষুদ্র হইলেও খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংনির্ভরশীল হইতে পারিবে না।

বর্তমানে চীন, ভারত, সোবিয়েৎ রাশিয়া, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিরাট বিরাট রাষ্ট্র রহিয়াছে, আবার অপরদিকে সানমারিনোর মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও রহিয়াছে যাহার আয়তন মাত্র ৩৮ বর্গমাইল। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বর্তমানে বৃহদায়তন রাষ্ট্র শাসন করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। বর্তমানে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব টিঁকাইয়া রাখা কঠিন; বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিই বর্তমানে অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া আঞ্চলিক জোট অথবা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী।

[তিন] **সরকার (Government):** রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হইল সরকার। যাহারা সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহাদিগকে সরকার বলে। সংকীর্ণ অর্থে, সরকার বলিতে ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদিগকে বুঝায়। সরকার ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। যেখানে সরকার নাই, সেখানে শাসন নাই, যেখানে শাসন নাই, সেখানে রাষ্ট্রও নাই; রাষ্ট্র না থাকিলে অরাজকতা দেখা দিবে।

সরকার হইল রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। রাষ্ট্রের তথা জনগণের আশা আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য কোন বিশেষ ধরনের সরকারের প্রয়োজন নাই। সরকারের কাজ

প্রধানতঃ দুইটি—আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা।

[চার] **সার্বভৌমত্ব** (**Sovereignty**): রাষ্ট্র গঠনের চতুর্থ উপাদান হইল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যে ক্ষমতার উর্ধে আর কোন ক্ষমতা নাই। সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থা। আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকিবে না যাহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা আইন উপেক্ষা করিতে পারে।

ইহার স্বরূপ

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র কোন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না। বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা থাকে না, উহা বিদেশী রাষ্ট্রের অংশবিশেষে পরিণত হয়।

বর্ত্তমানে বহিঃশক্তির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থা কদাচিৎ দেখা যায়। অধিকাংশ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলে। অবশ্য বর্তমান ধারণা হইল যে আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মানিবার ফলে রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না। কোন কোন লেখক এরূপ চরম মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন এই দুইটি রাষ্ট্রেরই শুধুমাত্র বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব আছে, অপর সকল রাষ্ট্রের উপর ইহাদের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

[পাঁচ] **স্বীকৃতি** (**Recognition**): আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে ওপেনহিম (Oppenheim) বলিয়াছেন যে অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব লাভ করিতে এবং আন্তর্জাতিক আইনের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে। নবগঠিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই, অধিকাংশ রাষ্ট্র উহাকে স্বীকার করিলেই চলিবে।

[ছয়] **স্থায়িত্ব** (**Permanence**): রাষ্ট্র সাধারণতঃ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এখানেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ যদি সাময়িকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম সহসা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি যে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জাতিপুঞ্জ হায়দরাবাদকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয় নাই।

পশ্চিমবংগ অথবা নিউইয়র্ক রাষ্ট্র ? (Is West Bengal or New York a State ?) : বৃটিশ শাসনকালে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড এবং সরকার থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলা চলিত না কারণ ভারতবাসীদের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর ভারতবর্ষে পরাধীনতার অবসান ঘটে এবং স্বাধীন ভারত সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়া পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ১৭টি অংগ রাজ্য লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত। ইংরেজীতে ইহাদের "রাষ্ট্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও আসলে ইহারা রাষ্ট্র নয়—রাষ্ট্রের অংশবিশেষ। সমগ্র ভারত একটি রাষ্ট্র, উহার কোন অংশ রাষ্ট্রের মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরে ইহাদের রাষ্ট্র বলা হয়। এই সকল অংগ রাজ্যগুলিতে জনসমষ্টি, সরকার, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে কিন্তু সার্বভৌমত্ব নাই। অনুরূপভাবে, নিউইয়র্ক রাষ্ট্র নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৫০টি অংগরাজ্য লইয়া গঠিত নিউইয়র্ক তাহার অন্যতম। এই রাজ্যের জনসংখ্যা, ভূখণ্ড এবং সরকার আছে কিন্তু সার্বভৌমত্ব নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্র—উহার কোন অংগরাজ্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পাইতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সরকার (The State and the Government) : রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, উহার বাস্তব রূপ সরকার, সেই কারণে সাধারণ কথাবার্তায় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্র এবং সরকার এই দুই ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক সত্তা, সরকার উহার অংশ মাত্র। জনসংখ্যা, ভূ-খণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব—রাষ্ট্রের এই চারিটি মৌলিক উপাদানের অন্যতম হইল সরকার। রাষ্ট্রকে মানব দেহের সহিত তুলনা করিলে সরকারকে মস্তিষ্কের সহিত তুলনা করা যায়। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অংশ কখনো সমগ্রের সমান হইতে পারে না, সেইজন্য সরকার কখনো রাষ্ট্রের সমর্থক হইতে পারে না।

অংশ সমগ্র

দ্বিতীয়তঃ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় কিন্তু সরকার মুষ্টিমেয় জনগণকে লইয়া গঠিত হয়। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের লইয়া সরকার গঠিত অপরপক্ষে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। অন্যভাবে বলা যায় যে কেবলমাত্র শাসকদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয় কিন্তু শাসক ও শাসিত এই দুই জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত।

ব্যাপকতা

তৃতীয়তঃ, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। কবি টেনিসন নদী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য। এক সরকারের পতন ঘটিবে, আর এক সরকার আসিবে কিন্তু রাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চিরকাল বহিয়া চলিবে।

স্থায়িত্ব

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র হইল একটি তত্ত্বগত ধারণা—একটি বিমূর্তভাব, অপরপক্ষে সরকার একটি মূর্ত কল্পনা। রাষ্ট্র এমন একটি বস্তু যাহার উপাদানগুলিই শুধু উল্লেখ করা যায়, যাহাকে শুধু উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু যাহাকে ধরাছোঁয়া যায় না, অপরপক্ষে সরকারকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

বিমূর্ত ও মূর্ত

পঞ্চমতঃ, সরকারের রূপ বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। সরকার গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক, মন্ত্রিপরিষদশাসিত অথবা রাষ্ট্রপতিশাসিত হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলি—জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব এবং স্বীকৃতি—সর্বত্রই একরূপ।

রূপ

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র থাকিলেই সরকার থাকিবে। সরকারবিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, কিন্তু সরকার থাকিলেই যে রাষ্ট্র হইবে এমন কোন কথা নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতে সংগঠিত শাসনযন্ত্র ছিল কিন্তু সার্বভৌমত্ব না থাকায় উহা রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হইতে পারিত না।

পরিশেষে, প্রয়োজন হইলে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় না। নাগরিকগণও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, তাই নাগরিকগণ নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে ইহা কল্পনা করা যায় না।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (The State and other Associations): অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাষ্ট্র পৃথক মর্যাদার অধিকারী হইলেও উহা মূলত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অপর সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কোন বিশেষ সংগঠন গড়িয়া উঠে কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানবজীবনের সামগ্রিক আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্দেশ্য সদস্যদের নাট্য প্রতিভার বিকাশ সাধন করা, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সদস্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, রেডক্রশ সোসাইটির উদ্দেশ্য আর্ত মানবের সেবা

উদ্দেশ্য

ইত্যাদি ; অপরপক্ষে,' রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী, ব্যক্তিজীবনের বিশেষ কোন দিক নয়। নাগরিককে মহৎ এবং সুখী জীবনের অধিকারী করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, দেশের আইন ও জন্মের দ্বারাই উহা নির্ধারিত হয়, কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের সদস্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিল সে জন্মের সাথেই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া গেল, তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না ; অপর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ সহজে ত্যাগ করা যায় কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্যপদ সহজে ত্যাগ করা যায় না।

সভ্য

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা ওঠে না। রাষ্ট্রের কার্যাবলী তাহার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু রামকৃষ্ণমিশন, ওযাই. এম. সি. এ., রেডক্রশ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

ভূখণ্ড

চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার কোনরূপ বাধা নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য তাহার পক্ষে কোন নাট্যসংস্থার বা রামকৃষ্ণ মিশনের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ায় কোন বাধা নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তান এই উভয় রাষ্ট্রের সদস্য অর্থাৎ নাগরিক হইতে পারে না।

এক রাষ্ট্রের সভ্য

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইল স্থায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, অপরপক্ষে অন্যান্য সংগঠনের অস্তিত্ব সাময়িক। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের সকল লোক ও নির্বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত বলিয়া ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, অপরপক্ষে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় লোক এবং সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত বলিয়া উহা অস্থায়ী।

স্থায়িত্ব

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের একটি মৌল উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা, অপরপক্ষে অন্যান্য সংগঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে চরম শাস্তি দিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন সদস্য উহার আইন অমান্য করিলে প্রতিষ্ঠান নিয়মভংগকারীকে বড জোর সদস্যপদ হইতে বরখাস্ত করিতে পারে কিন্তু শারীরিক শাস্তি প্রদান করিতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব

পরিশেষে, রাষ্ট্র হইল মানবেতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফল কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলি মানুষের ইচ্ছা হইতে উদ্ভুত।

সমাজ (Society) : বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের (Aristotle) মতে সাধারণ মানুষ একক এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। সকলেই অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সংঘবদ্ধতা মানব চরিত্রের অন্যতম ধর্ম। মানুষের এই প্রবৃত্তি হইতেই সমাজ গঠিত হইয়াছে।

"সমাজ" শব্দটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলিতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মোট জনসমষ্টিকে বুঝানো হয়; সংকীর্ণ অর্থে সমাজ বলিতে কোন জনসংস্থা অথবা সমিতিকে বুঝানো হয়।

সংজ্ঞা

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (MacIver) সমাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যখন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে তখনই সমাজের উদ্ভব হয়।" রাষ্ট্রও মূলতঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় জীবন সুরু হওয়ার পূর্বে মানুষ সমাজ জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা লকের (Locke) মতে "প্রাকৃতিক রাজ্যে" সমাজজীবনের অস্তিত্ব ছিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে সমাজের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের সহিত উহার কি পার্থক্য তাহা জানা প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজ হইল স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত জনসংস্থা। কতকগুলি ব্যক্তি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ গঠন করে। কোন সামাজিক সংস্থার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছায় লোকে উহার সদস্যপদ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজগঠনের মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে। মানুষ আত্মরক্ষা, জীবিকা অর্জন কিংবা ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে অথবা সুন্দর এবং মহান জীবনের আদর্শ উপলব্ধির জন্য সমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে শ্রমিক-সংঘ গঠন করিয়া মালিকের শোষণ প্রতিহত করে। ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণ বণিকসভা (Chamber of Commerce) গঠন করিয়া ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষ রামকৃষ্ণ মিশন অথবা রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো ধর্মীয় সংস্থা গঠন করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, স্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজ গঠিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সমাজকে জনতা (Crowd), বিশৃঙ্খল জনতা (Mob) এবং দল (Herd) হইতে পৃথক করা যায়। জনতা এবং দলের

কোন স্থায়ী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সমাজ উহার সদস্যদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত দীর্ঘস্থায়ী জনসংস্থা।

বার্ক (Burke) প্রভৃতি কয়েকজন লেখক সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করিলে ভুল করা হইবে। সমাজ হইল স্বেচ্ছামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত জনসংস্থা, অপরপক্ষে রাষ্ট্র হইল একটি আবশ্যিক জনসংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি ওই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে বাধ্য।

রাষ্ট্র ও সমাজ

রাষ্ট্র এবং সমাজের উদ্দেশ্য, সংগঠন এবং পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করা। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও রাষ্ট্র দেশের সকল লোকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের সমাজ গঠিত হয়, যেমন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। সংগঠনের দিক হইতে বিচারে রাষ্ট্র হইল আইন এবং শৃঙ্খলা বলবৎ করিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অবস্থিত সকল ব্যক্তিই উহার সদস্য। এক ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হইতে পারে না। রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাগরিকের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে কিন্তু সমাজ তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোধ করিতে পারে—বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা কোন সামাজিক সংস্থার নাই।

সমাজ ও রাষ্ট্র (Society and the State): সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন। সংঘবদ্ধতাই মানুষকে সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে পরিবার এবং গ্রামসমাজ গঠিত হইয়াছে। জীবনরক্ষার তাগিদও সমাজ গঠনের একটি সহায়ক বিষয়। পিতামাতার সুদীর্ঘ লালনপালন ব্যতীত মানব সন্তান বাঁচিতে পারে না। সদ্যজাত সন্তানকে লালনপালন করিবার সময় মাতার পক্ষে অন্য কোন কাজ করা সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাকে ভরণপোষণের জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। নরনারীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই মানুষকে পরিবার গঠন করিতে শিখাইয়াছে। একটি পরিবার সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া কয়েকটি পরিবার মিলিত হইয়া গ্রামসমাজ গঠন করিয়াছে; আবার একটি গ্রামও সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া কয়েকটি গ্রাম মিলিত হইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

পশুর মতো শুধুমাত্র জৈব প্রয়োজন মিটানোই মানবজীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ এবং সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় সংস্থাই ব্যক্তির জীবনে অপরিহার্য। রাষ্ট্র উদ্ভবের বহু পূর্বে সমাজের উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র এবং সমাজকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। গ্রীকদের নিকট নগর-রাষ্ট্র (City State) ছিল একাধারে রাষ্ট্র, চার্চ এবং শিক্ষায়তন। "সে আমার, আর আমরা তাহার"—রাষ্ট্রের প্রতি প্রাচীন গ্রীকদের এই ছিল ধারণা। গ্রীকদের নিকট সমাজ জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। আধুনিককালের লেখকদিগের মধ্যে বার্কও রাষ্ট্র এবং সমাজকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা

কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ এক নয়। সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। উদ্দেশ্য, সংগঠন এবং পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে আইন ও শৃংখলা বলবৎ করিয়া নির্বিশেষভাবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করা। অপরপক্ষে বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ধরনের জনসংঘ গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র আইন এবং শৃংখলা বলবৎ করিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অবস্থিত সকল ব্যক্তিই উহার সদস্য, কিন্তু ব্যাপক অর্থে সমাজ হইল বহু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করে। কেহ আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্যন্ত জারি করিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্যকে উপরোধ অথবা অনুরোধ করিতে পারে; বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা কোন সামাজিক সংস্থার নাই। চতুর্থতঃ, ডাঃ লীকক (Leacock) বলেন "সমাজ" শব্দটির সহিত কোন ভূখণ্ডের প্রশ্ন জড়িত নাই। রামকৃষ্ণ মিশন, সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ওয়াই. এম. সি. এ. প্রভৃতি সংস্থা সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু "রাষ্ট্র" শব্দটির সহিত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। পরিশেষে, সমাজ আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার অনেক পরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষের জন্মের সহিত সমাজেরও জন্ম হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্ভব বিবর্তনের বহু পরবর্তী যুগের ঘটনা।

রাষ্ট্র ও সমাজ ভিন্ন

বার্কারের (Barker) ভাষায় স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা হইল সমাজের এলাকা, সুনাম ইহার শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা ইহার পদ্ধতি; অপরপক্ষে যান্ত্রিক কার্যাবলী

হইল রাষ্ট্রের এলাকা, বলপ্রয়োগ ইহার শক্তি এবং অনমনীয়তা ইহার পদ্ধতি। বর্তমানকালে সমাজের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সমাজ রাষ্ট্র কর্তৃক সংহত হয়, রাষ্ট্র না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

ব্যক্তি ও সমাজ (The Individual and the Society): ব্যক্তির আত্মবিকাশ এবং আত্মোপলব্ধির জন্য সমাজের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি একক, বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করিয়া সুখী এবং সুন্দর জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) যথার্থই বলিয়াছিলেন, একাকী কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, পিতামাতার সহযোগিতা ব্যতীত শৈশবকালে মানব সন্তান বাঁচিতে পারে না। প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম এবং হিংস্র জীবজন্তুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি একতাবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে।

মানুষ যে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গঠন করিয়াছে, তাহা নয়, সংঘবদ্ধতা মানুষের এক সহজাত ধর্ম। সাধারণ মানুষ সমাজ গঠন করিয়া, পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়া থাকিতে চায়। তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলেন, যে মানুষ একা একা থাকিতে ভালবাসে, সে হয় দেবতা না হয় পশু। অনেক জন্তু জানোয়ার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে; আবার অনেক সন্ন্যাসীও পর্বতগুহা এবং গহন অরণ্যে একক জীবন যাপন করিতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ধরনের জীবন যাপনে আগ্রহী নয়। সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন করিবার জন্য মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সমাজ মানুষের আত্মবিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে, তাই সমাজের বাইরে ব্যক্তির আত্মবিকাশ অসম্ভব।

তিনটি মতবাদ

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে এ সম্পর্কে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, জৈবমতবাদ এবং আদর্শবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) অনুযায়ী সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক খুব গভীর অথবা অবিচ্ছেদ্য নয়। সমাজ কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নরনারীর সমষ্টিমাত্র। ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন, প্রত্যেকেই স্বাধীন জীবন যাপন করে, কাহারো সহিত কাহারো সহযোগিতা নাই। পরস্পরনিরপেক্ষ, স্বাধীন ব্যক্তিগণ চুক্তি করিয়া স্বেচ্ছায় সমাজ গঠন করিয়াছে। সমাজ ব্যক্তিজীবনে একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, সমাজ ব্যতিরেকেও মানুষ স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছিলেন

তাহা ঠিক নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অস্তিত্বের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মানুষ যে পরস্পরনিরপেক্ষ স্বাধীন জীবন যাপন করে ইহা সত্য নয়। একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব নয় বলিযাই মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছে। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং গভীর। সমাজবহির্ভূত জীব হিসাবে মানুষকে কল্পনাও করা যায় না।

জৈবমতবাদের (Organic Theory) সমর্থকেরা রাষ্ট্রের তথা সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলির সহিত প্রাণীব যে সম্পর্ক, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত—একে অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে সমাজের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন 'কোষের' যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সেইরূপ রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিকট সমাজ একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্র এবং চুক্তিগত সংগঠন। কিন্তু জৈবমতবাদ সমাজকে একটি জীবন্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করিয়াছে। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ব্যক্তিগণ তাহাদের অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকিবে। ব্যক্তির যে পৃথক অস্তিত্ব, ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে তাহা এই মতবাদে স্বীকার করা হয় না। জীবদেহ গঠনকারী কোষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই কিন্তু সমাজ গঠনকারী ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এই মতবাদে ব্যক্তিকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই।

জৈবমতবাদ হইতেই আদর্শবাদের (Idealism) জন্ম হইয়াছে। প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটল মনে করিতেন যে সমাজ এবং রাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন আর সমাজের অধিবাসী হইলেই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই মতবাদ সমাজ তথা রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এই মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। এই মতবাদ অনুসারে সমাজের সার্থকতা সমাজের মধ্যেই নিহিত আছে। ব্যক্তির স্বার্থের সহিত সমাজের স্বার্থের সংঘাত বাধিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে ব্যক্তিই ভুল করিতেছে কারণ সমাজ এমন এক প্রতিষ্ঠান যাহা কখনোই ভুল অথবা অন্যায় করিতে পারে না।

জৈব মতবাদ এবং আদর্শবাদে সমাজের সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার

করা হইয়াছে। কিন্তু জৈব মতবাদে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজ গঠনের জন্য যেমন ব্যক্তি অপরিহার্য সেইরূপ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্য মানুষের জীবনে সমাজও অপরিহার্য। গ্রীকগণ সমাজকে সুন্দর এবং সুখী জীবনের উপায় হিসাবে দেখিযাছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও সমাজকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় হিসাবে দেখিয়াছে। অপরপক্ষে আদর্শবাদ সমাজকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ই চরম মতবাদ। সমাজকে একাধারে উদ্দেশ্য এবং উপায় হিসাবে দেখিতে হইবে। বর্তমানে উইলোবি (Willoughby) এবং অন্যান্য রাষ্ট্রনীতিবিদগণের ইহাই অভিমত।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ

॥ Theories of the Origin of the State ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Leading theories of the origin of the State—The Theory of Divine Origin—The Theory of Force—The Theory of Social Contract—Views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary theory of the Origin of the State.

বিষয়বস্তু : ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ—বলপ্রয়োগের মতবাদ—পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ—মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ—সামাজিক চুক্তি মতবাদ—বিবর্তনবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করিয়া হইল সে সম্পর্কে নানা প্রকার মতবাদ আছে। এই মতবাদগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) কাল্পনিক মতবাদ এবং (২) যথার্থ মতবাদ। ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগের মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ কাল্পনিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। অপর পক্ষে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে। নিম্নে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল।

[এক] **ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ** (**Theory of Divine Origin**) **:** রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ। এই মতবাদেব মূলকথা হইল রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বর মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার একজন প্রতিনিধির প্রয়োজন, রাজা ঈশ্বরের অনুমোদিত প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্রশাসন করেন, তাই রাজার ইচ্ছাকে অমান্য করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অর্থ হইল ধর্মদ্রোহিতা; রাজপদ বংশানুক্রমিক হইবে। এই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ হইতে রাজাদের "ঐশ্বরিক ক্ষমতাবাদের" (Divine Rights of Kings) উদ্ভব হইয়াছে। রাজা ঈশ্বরের বৈধ প্রতিনিধি বলিয়া তিনি তাঁহার কাজের জন্য ঈশ্বরের নিকটই কেবলমাত্র দায়িত্বশীল, প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। রাজা নিজেই আইন সৃষ্টি করেন তাই তিনি আইনের উর্ধে। ঐশ্বরিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic States) বলে।

বক্তব্য

প্রাচীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশের বহু লোক ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ধর্ম হইতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে না দেখিলেও তাহারা ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাস করিত না। মহাভারতে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে চরম অরাজকতার হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মনুকে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। বাইবেলের Old Testament গ্রন্থে ঈশ্বরকেই রাজার সকল ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মও মোটামুটিভাবে ঐশ্বরিক মতবাদকে সমর্থন করিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পোপ এবং রাজার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় তখন রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ রাজাকেই ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্যার রবার্ট ফিলমার (Filmer) রচিত পেট্রিয়ার্কা (Patriarcha or the natural power of Kings) গ্রন্থে এই মতবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজাদের সময় এই মতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম জেম্‌স্ এই মতবাদের সমর্থনে Law of Free Monarchies নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি দাবী করেন যে রাজা তাঁহার কর্তৃত্ব সরাসরি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি আইন এবং জনগণের উর্ধে। রাজা শুধু ঈশ্বর এবং বিবেকের কাছে দায়ী,—জনগণের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। রাজা অত্যাচারী হইলেও জনগণের বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার নাই কারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামান্তর। রাজা অত্যাচারী হইলে বুঝিতে হইবে যে জনগণের কৃত পাপের শাস্তি বিধান করিবার জন্য ঈশ্বর এরূপ করিয়াছেন। সেণ্ট টমাস একুইনাসের মতে রাজার সকল ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত। চতুর্দশ লুই এর স্বৈরাচারকে সমর্থন করিবার জন্য ফ্রান্সে বোসে (Bousset) এই মতবাদকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেণ্ট অগষ্টাইনের বিখ্যাত গ্রন্থ City of God ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

মতবাদের বিবর্তন

সমালোচনা (Criticism): অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই এই মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। ইউরোপীয় রেনেশাঁ, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতি এবং সামাজিক চুক্তিমতবাদের প্রাধান্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সমাধি রচনা করিল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক অর্থাৎ রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ইতিহাসে কোথাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই

মতবাদ স্বৈরাচারকে সমর্থন জানায় এবং জনগণের অধিকার অস্বীকার করে। রাজাকে আইনের উর্ধে রাখিলে তাঁহাকে দায়িত্বহীন তথা স্বৈরাচারী করিয়া তোলা হয়। আসলে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করাই এই মতবাদের লক্ষ্য ছিল। তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু অত্যাচারী, রক্তপিপাসু ও হননলিপ্সু রাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই সকল রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; তৈমুরলঙ্গ, নাদিরশাহ্, অথবা এটিলার মতো রাজাকে করুণাময় ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থতঃ, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ চরম রাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু অন্য কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থায় ঈশ্বরের প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ, এই দেশের শাসনব্যবস্থায় রাজার কোন স্থান নাই। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে, এই প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদ হইতে পাওয়া যায় না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করে বলিয়া যাহারা কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাহারাই এই মতবাদ বিশ্বাস করিবে। কিন্তু যাহারা নাস্তিক তাহারা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে না ফলে রাষ্ট্র নাস্তিক ব্যক্তিদের সমর্থন ও আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইবে। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র-বিবর্তন সম্পূর্ণ সামাজিক ও লৌকিক ব্যাপার বলিয়াই ইহাতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কল্পনা করা যায় না। যীশু বলিয়াছিলেন, রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও (Render unto Caesar the things that are Caesar's, and render unto God the things that are God's).

মূল্যায়ন

এই মতবাদের বিরুদ্ধে নির্মম এবং কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গেটেল (Gettel) বলেন, যে যুগে আইন ও শৃংখলার বন্ধন গড়িয়া ওঠে নাই, আদিম মানুষের হিংস্র বর্বরতা নৈরাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারিত সেই যুগে এই মতবাদ মানুষকে সুনীতি ও আনুগত্য শিক্ষা দিয়া সমাজবন্ধনকে দৃঢ়তর এবং রাষ্ট্র বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এই ধারণায় মানুষ রাষ্ট্রকে সমর্থন করে।

[দুই] **বলপ্রয়োগের মতবাদ (Theory of Force)**ঃ এই মতবাদ অনুসারে যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। আদিম যুগে বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বলপ্রয়োগের দ্বারা অথবা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বলশালী ব্যক্তি গোষ্ঠীর (clan) অধিপতি হইয়া বসিল; সর্বাপেক্ষা বলশালী গোষ্ঠীর অধিপতি অপর সকল দুর্বল গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল; এইভাবে উপজাতির (tribe) সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে বিজেত

উপজাতি বিজিত উপজাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। বিজেতা উপজাতির দলপতি রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং কালক্রমে রাজ্যই সম্প্রসারিত হইয়া সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইল। 'জোর যার মুল্লুক তার' বা বাহুবলই একমাত্র বল—এই নীতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে ওপেনহাইমার (Oppenheimer), জেন্‌কস (Jenks) হিউম (Hume) বার্ণহার্ডি (Bernhardi) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ্ রহিয়াছেন।

বলপ্রয়োগের মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তিই নয়, উহার ভিত্তিরও ব্যাখ্যা প্রদান করে। শক্তিই রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে, শক্তিই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখে। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাই বলেন, "রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির মধ্যেই ইহার সার্বভৌমত্ব নিহিত রহিয়াছে।"

ওপেনহাইমার বলেন, জন্মলগ্নে সম্পূর্ণরূপে এবং অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে অনিবার্যভাবে রাষ্ট্র হইল বিজিত গোষ্ঠীর উপর প্রতিষ্ঠিত বিজেতা গোষ্ঠীর এক সামাজিক সংস্থা। জেন্‌কস বলেন, সকল রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব যে যুদ্ধজয়ের ফলে সম্ভব হইয়াছে তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে বলপ্রয়োগের গুরুত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া ভলতেয়ার বলিয়াছিলেন যে সৌভাগ্যবান যোদ্ধাই প্রথম রাজার পদ অলংকৃত করে (The first king was a fortunate warrior).

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নীতির সমর্থনে বলপ্রয়োগ মতবাদকে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে বলপ্রয়োগ করিয়া জনসাধারণকে সৎপথে পরিচালিত করা যায়। মধ্যযুগের খৃশ্চান ধর্মযাজকগণ রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে পাশব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচার করে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে রাষ্ট্র হইল পাপের ফসল, এবং সর্বাঙ্গে পাপের চিহ্ন বহন করিতেছে (Government is the offspring of evil, bearing about it the marks of its parentage). নীতিহীন বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যৌক্তিকতা কোথায়? সমাজতন্ত্রবাদীরাও নিজ মতবাদের সমর্থনে বলপ্রয়োগের মতবাদ ব্যবহার করেন। অসীম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র সবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ প্রতিহত করিয়া শ্রমিকদিগের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদান করিবে। আধুনিক জার্মানীতে ট্রিটস্‌কে (Trietschke) বার্ণহার্ডি প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদগণ বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয়া ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদের তত্ত্বগত যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয। বলই

রাষ্ট্রের ধর্ম এবং জাতীয় সম্মান, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্য উহা অপরিহার্য। যুদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজন (war is a biological necessity)। বার্ণহার্ডি বলিয়াছেন শক্তি হইতেই অধিকারের সৃষ্টি হয়, এবং ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসা যুদ্ধের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। জৈবিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যুদ্ধই ন্যায্য সিদ্ধান্ত দান করে কারণ ইহার সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে স্থির হয়। (Might is the supreme right and the dispute as to what is right is decided by the arbitariment of war. War gives a biologically just decision since its decisions rest on the very nature of things)। ট্রিট্‌সকে বলেন, বলবান কর্তৃক দুর্বলের উপর শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত অস্ত্রের প্রতি আবেদন নিষ্ফল হইবে না (Appeal to arms will be valid until the end of history). ল্যাস্কিও এই মতবাদের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন বলপ্রয়োগই হইতেছে রাষ্ট্রের মানদণ্ড। কার্ল মার্কসের সহযোগী লেখক এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন শক্তি ও তরবারির নিষ্ঠুরতা ব্যতীত ইতিহাসের কোন অবদানই মিলে নাই। মার্কসবাদী লেখকগণের মতে পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুর্বল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার একটি যন্ত্র।

সমালোচনা (Criticism): এই মতবাদে কিছুটা সত্য আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। রাষ্ট্রবিবর্তনে বহু শক্তি কাজ করিয়াছে, বলপ্রয়োগ উহার অন্যতম। ডাঃ লীকক (Leacock) যথার্থই বলিয়াছেন যে এই মতবাদের ত্রুটি হইল যে ইহা অন্যতমকে একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। বলপ্রয়োগের মতবাদ মানুষের সমাজগঠনের সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র পাশবিকশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে সে রাষ্ট্র অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তি হইল শাসিতের সম্মতি। ম্যাকাইভার বলেন জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শক্তি রাষ্ট্রের সংহতিবিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীণ (T. A. Green) যথার্থই বলিয়াছেন—শক্তি নয়, জনগণের সম্মতিই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি (Will, not force is the basis of the state), জনসাধারণের সমর্থন থাকে বলিয়াই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। ফরাসী দার্শনিক রুশোর লেখায়ও এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; তিনি বলেন অধিকাররিহীন শক্তি বড় জোর রাষ্ট্রের সাময়িক ভিত্তি হইতে পারে, অধিকারসমন্বিত শক্তিই রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী ভিত্তি (Might without right can at best be only temporary, might with right is a permanent basis for the state).

তৃতীয়তঃ, নীতির দিক হইতে বিচারে এই মতবাদকে সমর্থন করা যায় না। ইহা স্বৈরাচারকে সমর্থন করে, এমন এক হিংস্র নখদন্তযুক্ত রক্তাক্ত আরণ্যক পরিবেশের কল্পনা করে যেখানে বাহুবলই একমাত্র বল, যেখানে জোর যার মুল্লুক-তার, যেখানে রণহুংকার ন্যায়-নীতি ও সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে। যুদ্ধবাদের সমর্থনকারী এই মতবাদ শুধু বিপজ্জনকই নয়, ইহা গণতন্ত্র, অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায় প্রভৃতি মানবিক আদর্শের বিরোধী।

চতুর্থতঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যকে সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। একমাত্র ভীতিবশত লোকে রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলে ইহা সত্য নয়। শুধুমাত্র ভয়ই নয়, নিজ স্বার্থের খাতিরেও মানুষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে।

এই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট হইলেও রাষ্ট্রের বিবর্তন এবং অস্তিত্ব রক্ষায় পাশবিক বলের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আজও পৃথিবী হইতে যুদ্ধের আশংকার অবসান ঘটে নাই, আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল পদধ্বনি সারা পৃথিবীকে আতংকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্র গঠনের মূলে শক্তির বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন সামরিক ক্ষমতাই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভিত্তি। ফাইনার (Finer) বলেন যে সামাজিক আদর্শের সহিত সংঘাত দেখা দিলে রাষ্ট্রের আদিম পাশব সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে বলপ্রয়োগ করা হয় বলিয়া কেহই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে না। উইলসনের (Wilson) মতে সর্বশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সরকার হইল সুসংহত শক্তি (Government, in its last analysis, is organised force).

মূল্যায়ন

[তিন] **পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory) :** স্যার হেনরি মেন (Sir Henry Maine) হইলেন এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং ব্যাখ্যাকর্তা। এই মতবাদ অনুযায়ী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। প্রাচীনকালে সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরুষ পরিবারের উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব করিত। একটি পরিবার কালক্রমে যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িল তখন এই সকল পরিবারের উপরও আদি পরিবারের কর্তার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব বিরাজ করিত। কতকগুলি পরিবারের সমাবেশে গোষ্ঠীর উদ্ভব হইল, আবার গোষ্ঠীর সমাবেশে উপজাতির সৃষ্টি হইল। উপজাতিগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেও রক্তের সম্বন্ধ থাকায় উহাদের

সংহতি বিনষ্ট হয় নাই, ফলে তাহারা মিলিতভাবে কাজ করিতে লাগিল। এইভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

এই মতবাদ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার স্থায়ী বিবাহ এবং রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, (২) আদি পরিবার হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং (৩) পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কর্তা যে অসীম ক্ষমতা ভোগ করিত তাহার মধ্যেই রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

স্যার হেনরি মেন তাঁহার মতবাদের সমর্থনে বলেন যে হিব্রু, গ্রীক, রোমান এবং ভারতীয়দের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। হেনরি মেনের পূর্বেও এই মতবাদ একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এ্যারিষ্টটলের লেখায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে প্রথমে পরিবারের উদ্ভব হয়, তাহার পর কয়েকটি পরিবাব মিলিত হইযা একটি গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং কয়েকটি গ্রাম মিলিযা একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল।

সমালোচনা (**Criticism**)**:** ম্যাকলিনান, জেন্‌কস্, মর্গান প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমত; ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আদিম যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই পিতৃপ্রধান পরিবাব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অনেক লেখক এইমত পোষণ করেন যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাবের বহুপূর্বে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া গোষ্ঠী, গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হইয়া উপজাতি এবং উপজাতি সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে কিন্তু জেন্‌কসের মতে আদি সংগঠন হইল উপজাতি, ইহার পর আসিল গোষ্ঠী এবং পরিশেষে আসিল পরিবার। জেন্‌কস তাহার মতবাদের সমর্থনে অষ্ট্রেলিয়া এবং মালয়ের আদিম অধিবাসীদের পরিবার জীবনের উল্লেখ করেন।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, ইহা আদি সমাজের, বিশেষ করিয়া পরিবারের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে মাত্র।

[চার] **মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ** (**Matriarchal Theory**)**:** ম্যাকলেনান এবং জেন্‌কস মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক। ইহাদের মতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল; আদিম সমাজে স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহণ

প্রথা এবং অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। জেন্‌কস তাঁহার মতের সমর্থনে অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, এবং মালয়ের আদিম অধিবাসীদের বহুপতি গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সমাজে মাতার দিক হইতে রক্তের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইত (maternity is a fact, paternity an opinion) এবং মাতার নামেই সন্তানের বংশ পরিচয় দেওয়া হইত। 'মাতার অধিকার', 'মাতার দিক হইতে রক্তের সম্বন্ধ নির্ধারণ,' 'মাতার দিক হইতে উত্তরাধিকার নির্ধারণ', এবং 'মাতার শাসন'—এইগুলি হইল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই সমাজ ব্যবস্থা স্ত্রীলোককে এক সুউচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমাজে নারীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব বিরাজ করিত। পরবর্তী কালে স্থায়ী কৃষিজীবন গড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়িয়া ওঠে।

সমালোচনা (**Criticism**) : প্রথমতঃ, প্রাচীনকালের কয়েকটি দেশে স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহণের প্রথা থাকিলেও উহা সার্বজনীন ছিল সমাজতত্ত্বে ইহার কোন নজির মেলে না। দ্বিতীয়তঃ 'মাতার শাসন' মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার দিক হইতে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল সুতরাং স্ত্রীলোক পুরুষের উপর শাসন করিয়া আসিয়াছে ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ, পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক উভয় মতবাদই সামাজিক, কোনটাই রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদ নয়; ইহারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির পরিবর্তে পরিবার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে।

[পাঁচ] **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (**Social Contract Theory**) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কাল্পনিক মতবাদগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ "প্রাকৃতিক রাজ্যে" (State of Nature) বাস করিত। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে এই প্রাকৃতিক

মূল বক্তব্য

রাজ্যে কোনরূপ সমাজ ছিল না, আবার কাহারো কাহারো মতে তখন সমাজ ছিল কিন্তু কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই। নানা কারণে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে অধিককাল বসবাস করা সম্ভব না হওয়ায় মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল।

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলের লেখায় সামাজিক চুক্তি মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহারা এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। আমাদের দেশে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"ও এই মতবাদের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়

একাদশ শতাব্দীর ধর্মযাজক ম্যানেগোল্ডের রচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। মধ্যযুগে আলথুসিয়াস এবং ইংরেজ লেখক রিচার্ড হুকার এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রচারক হইলেন তিনজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী—সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক হব্‌স্‌ এবং লক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো। এই তিনজন "চুক্তি মতবাদী" সামাজিক চুক্তি মতবাদ যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিব।

তিনজন দার্শনিকের উদ্দেশ্য

১৬৫১ সালে প্রকাশিত টমাস হব্‌সের (Thomas Hobbes) গ্রন্থ Leviathan রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করে। হব্‌স্‌ দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা তিনি স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচারকে সমর্থন করেন। অপরপক্ষে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে জন লক (John Locke) Civil Government নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থন করা। ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের "গৌরবময় বিপ্লব" বা "রক্তহীন বিপ্লবের" অন্যতম সমর্থক ছিলেন লক। লক সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে রাষ্ট্রশক্তি শাসিতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬২ সালে জাঁ জ্যাক রুশোর (Jean-Jacques Rousseau) Le Contrait Social বা সামাজিক চুক্তি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিভাবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা ব্যাখ্যার ভার লইলেন রুশো।

হব্‌সের ব্যাখ্যা

হব্‌সের (১৫৮৮-১৬৭৯) মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে কোনরূপ সমাজ ছিল না। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতালিপ্সু। স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা লাভের জন্য প্রাকৃতিক রাজ্য পারস্পরিক বিবাদ ও বিরোধ সংঘাত ও সংঘর্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। মানুষ তাহার সামান্য স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে নির্মমভাবে হত্যা করিতেও ইতস্ততঃ করিত না; সেই কারণে দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। জোর যার মুলুক তার—প্রাকৃতিক রাজ্যে এই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার করিবার কোন উপায় ছিল না। মানুষের জীবন ছিল, "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, কদর্য, পাশব এবং ক্ষণস্থায়ী" (Solitary, poor, nasty, brutish and short).

এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া চরম ক্ষমতা একব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের হাতে সমর্পণ করিল। উল্লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ চরম ক্ষমতার অধিকারী হইল এবং প্রাকৃতিক রাজ্যের অবসান ঘটিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

হব্‌স্‌ প্রদত্ত ব্যাখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে : (১) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ চুক্তির উর্ধ্বে কারণ তিনি চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন নাই, জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছে ; (২) প্রজারাই চুক্তি করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্পণ করিয়াছে, রাজা প্রজাদের সহিত কোনরূপ চুক্তি করেন নাই সুতরাং প্রজাদেরও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার নাই ; (৩) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি তথা রাজার আদেশই আইন।

লকের (১৬৩২-১৭০৪) কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন না থাকিলেও সামাজিক সংগঠন ছিল। প্রাকৃতিক রাজ্যে সমাজজীবনের অস্তিত্ব থাকায় উহা হব্‌স্‌ কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের মত ভয়াবহ ছিল না। এই অবস্থায় মানুষ সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বসবাস করিত। মানুষের জীবন স্বাভাবিক আইন দ্বারা পরিচালিত হইত এবং তাহারা "স্বাভাবিক অধিকার" ভোগ করিত। মানুষ সাধারণতঃ শান্তিতে বসবাস করিলেও মানুষে মানুষে যে কখনও বিবাদ বাধিবে না এমন কোন কথা নাই। তাই প্রাকৃতিক রাজ্যে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমতঃ, "স্বাভাবিক আইনের" কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না ; দ্বিতীয়তঃ, উহাকে ব্যাখ্যা করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না ; তৃতীয়তঃ, এই আইনগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য কোন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। লকের মতে দুইটি চুক্তি হইয়াছিল, প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করে, ইহাই প্রথম চুক্তি ; দ্বিতীয় চুক্তিটি হয় সরকার (অর্থাৎ রাজা) এবং জনসাধারণের মধ্যে এবং ইহার ফলে সরকার গঠিত হয়।

লকেব ব্যাখ্যা

লকের মতে এইভাবে রাজা চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হইলেন, সরকারী চুক্তির দ্বারা প্রজারা কিছু পরিমাণ অধিকার রাজাকে সমর্পণ করিয়াছিল এই সর্তে যে রাজা প্রজাদের অন্যান্য অধিকার, যেমন সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং জীবনধারণের অধিকার রক্ষা করিবেন। রাজা যদি মানুষের ন্যস্ত অধিকারগুলি রক্ষা না করে তবে চুক্তি ভংগ করা হইবে এবং সেইক্ষেত্রে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আইনসংগত অধিকার প্রজাদের থাকিবে।

জঁ জাক রুশোর (১৭১২—১৭৭৮) Le Contrait Social গ্রন্থটি তদানীন্তন ফ্রান্সে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছিল। রুশোর মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কথিত আছে রুশোর উল্লিখিত গ্রন্থটি শকটে স্থাপন করিয়া বিদ্রোহী জনতা প্যারিসের পথে পথে মিছিল বাহির করিয়াছিল। 'মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ

(Man is born free but everywhere he is in chains)—রুশোর এই উক্তি ফরাসী বিপ্লবকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্য ছিল আদর্শ অবস্থা, মর্ত্যের স্বর্গ। সেই অবস্থায় অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ সাম্য বিরাজ করিত, সমাজ সৃষ্ট কৃত্রিম বন্ধনের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা খর্ব অথবা জীবন শৃঙ্খলিত হয় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন, সুন্দর, সরল, সুখী এবং ভয়শূন্য জীবনযাপন করিত। তদানীন্তন ফ্রান্সের দুর্নীতিপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ রুশো জনগণকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যদি সুখী হইতে চাও তো আদিম স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাও।" এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যদি সেই প্রাকৃতিক রাজ্যই আদর্শ ছিল তবে কেন স্বেচ্ছায় মানুষ চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়া সেই আদর্শ অবস্থার অবসান ঘটাইল? দুইটি কারণে প্রাকৃতিক রাজ্যের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হইল। প্রথম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর দ্বিতীয় কারণ হইল মানুষের মধ্যে চিন্তা এবং বিচার বুদ্ধির জাগরণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা দিল। মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ হওয়ায় সে আত্মপর ভেদাভেদ করিতে শিখিল এবং কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। এইভাবে প্রাকৃতিক রাজ্যের সুখশান্তি অন্তর্হিত হইল এবং হব্‌স্ কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের মতো মানবজীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রগঠন করিল। চুক্তির ফলে মানুষ স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারাইল বটে কিন্তু পরিবর্তে লাভ করিল সামাজিক স্বাধীনতা।

রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। রাজা বা অন্য কোন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সংসদের নিকট মানুষ চুক্তি করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার সমর্পণ করে নাই। আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সমাজকে —রুশোর ভাষায় "সাধারণের ইচ্ছাকে" (General Will)—সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে।

সমালোচনা (Criticism): এই মতবাদ বিভিন্ন দিক হইতে কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক নজির নাই। অবশ্য অনেক সময় ১৬২০ সালের "মে ফ্লাওয়ার" চুক্তিকে এই মতবাদের ঐতিহাসিক নজির হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ১৬২০ সালের "মে ফ্লাওয়ার" নামক জাহাজে করিয়া ১০১ জন পিউরিটান ইংলণ্ডবাসী আমেরিকা যাইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তকে

অনৈতিহাসিক

চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দেশান্তর গমনকারী অভিযাত্রীদলের কেহই প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করিত না অথবা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য ছিল না। তাহারা কেবলমাত্র এক রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া অপর এক রাষ্ট্রে বসবাস করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিক; প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সহসা তাহারা কিরূপে রাষ্ট্রের ধারণা পাইল? যাহাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা অথবা অভিজ্ঞতা নাই তাহারা হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভব করিল এবং চুক্তি করিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিল ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অযৌক্তিক

ইহা ছাড়া 'প্রাকৃতিক অধিকার' ধারণাটিও অযৌক্তিক, অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রনৈতিক আইন। রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বে ব্যক্তির কোন 'প্রাকৃতিক অধিকার' থাকিতে পারে না, সুতরাং লক এবং রুশো যে প্রাকৃতিক অধিকাবের কথা বলিয়াছেন তাহা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। আরও বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত, কিন্তু স্বাধীনতার ভিত্তিও হইল রাষ্ট্র প্রবর্তিত আইন, সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। লক এবং রুশো প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতার কল্পনা করিয়াছেন তাহা স্বাধীনতা নয়—স্বৈরাচার মাত্র।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ বিপজ্জনক; ব্লণ্টস্লি বলেন এই মতবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের নিছক খেয়ালের ফলে সৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করে বলিয়া ইহা অতীব বিপজ্জনক। রাষ্ট্র যদি চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে যে কোন সময় কাল্পনিক অভিযোগের অছিলায় বিপ্লব করা চলিবে। ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব এবং ১৭৭৬ সালের আমেরিকান বিপ্লবের মূলে এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

বিপজ্জনক

চতুর্থতঃ, চুক্তি করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, প্রাকৃতিক রাজ্যের সকল মানুষই স্বেচ্ছায় চুক্তি করিয়াছিল ইহা কল্পনা করা যায় কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া চুক্তি করিয়াছিল আদি মানুষেরা, সুতরাং শুধু তাহারাই চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে—উত্তর পুরুষের উপর ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।

অবিশ্বাস্য

পরিশেষে, বলা হয় যে দুইটি পক্ষ না থাকিলে চুক্তি হইতে পারে না। প্রাকৃতিক

রাজ্যে বসবাসকারী আদিম মানুষদিগের স্বার্থ এক বলিয়া তাহাদের একটি পক্ষ বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু একটি পক্ষ থাকিলে কোন চুক্তি সম্পাদন করা যায় না। আমরা যেমন চুক্তি করিয়া জন্মগ্রহণ করি না, সেইরূপ আমরা চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রও সৃষ্টি করি নাই। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফল।

দুইটি পক্ষের অভাব

এই মতবাদ কাল্পনিক হইলেও ইহাকে একেবারে মূল্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঐশ্বরিক মতবাদ রাজার প্রতি প্রজাদের অন্ধ আনুগত্যের দাবী জানায়, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই মৌলিক সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিল যে আনুগত্য নির্ভর করে শাসিতে সম্মতির উপর এবং রাজার যথেচ্ছ কাজ করিবার কোন অধিকার নাই। শাসিতের সম্মতিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায় এই মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

মূল্যায়ন

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রগঠনে ব্যক্তির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়াছে মানবিক প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস যে জনসাধারণ তাহা মানিয়া লইয়াছে।

হবস, লক ও রুশোর মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা : (A Comparative Study of the theories of Hobbes, Locke and Rousseau) : হবস্, লক্ এবং রুশো—এই তিনজন দার্শনিক অভিমত পোষণ করেন যে সামাজিক চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইযাছে। এই তিনজন দার্শনিকের মতবাদ আলোচনা করিলে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বহুতর বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁহারা সমমতাবলম্বী ছিলেন।

হবস্, লক ও রুশো অভিমত প্রকাশ করেন যে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করিত। এই প্রকৃতির রাজ্যে রাষ্ট্র সৃষ্ট হয় নাই।

সাদৃশ্য

এই তিনজন দার্শনিক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরন্তু শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে নানারূপে অসুবিধার সম্মুখীন হইত তাহা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তই মানুষ রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। তিনজন দার্শনিকই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি

নয়, এবং ইহা বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই—এই বিষয়েও হবস্, লক্ ও রুশো একমত হইয়াছেন।

রাষ্ট্র সৃষ্টির পর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনজনেই একমত। রাষ্ট্র গঠনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনজন দার্শনিকই মনে করেন যে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হইয়াছে।

হবস্, লক্ ও রুশো তিনজনের মতবাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। তিনজন দার্শনিকই প্রাক্‌রাষ্ট্রীক ও প্রাক্-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করিয়াছেন।

বৈসাদৃশ্য

প্রাকৃতিক রাজ্যের বর্ণনা সম্পর্কে হবস্ বলেন যে এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ, অসহায়, দুঃসহ ও কদর্য। প্রকৃতির রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত না। শক্তির মদমত্ততার তারতম্যের উপর ভিত্তি করিয়াই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। মানুষ সুখ ও শান্তিপূর্ণ সহজ, সরল জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত। রুশো লকের ন্যায় প্রকৃতির রাজ্যকে আরও সুন্দরভাবে "মর্তের স্বর্গ" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সকলের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

হবস্ প্রকৃতির রাজ্যকে প্রাক্-সামাজিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় অবাধ স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হইত। মানুষের প্রণীত কোন আইন বলবৎ ছিল না। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য হইল প্রাক্-রাষ্ট্রিক এবং জনসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনযাপন করিত। রুশো বলেন যে প্রাকৃতিক রাজ্যে জনসাধারণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত হবসের মতে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটিমাত্র চুক্তিই করিয়াছিল, এবং ইহাই হইল সামাজিক চুক্তি। লকের মতে জনসাধারণ দুইটি চুক্তি করিয়াছিল। প্রথমটি হইল জনসাধারণের নিজেদের ভিতর চুক্তি এবং ইহা সামাজিক চুক্তি নামে আখ্যাত; দ্বিতীয় চুক্তিটি হইল জনসাধারণের সহিত রাজার সম্পর্ক লইয়া এবং ইহা সরকারী চুক্তি নামে অভিহিত। হবসের ন্যায় রুশোর মতেও একটি, সামাজিক চুক্তি হইয়াছিল। হবস্ মানুষের প্রকৃতিকে হিংস্র ও বর্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লক্ ও রুশো মানুষের প্রকৃতি সুন্দর, শুভ এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হবস্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। তাঁহার মতে রাষ্ট্র ও সরকার এক ও অভিন্ন। কিন্তু লক্ ও রুশো রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য

করিয়াছেন। লক্ ও রুশোর মতে সরকার হইল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মাত্র। হবসের মতে রাজা চুক্তির অংশ নহেন এবং তিনি চুক্তির শর্তাবলী মানিতে বাধ্য নহেন। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার। রুশো বলেন যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে ; ইহাতে রাজার কোন স্থান নাই।

হবস্ মনে করেন যে জনসাধারণ বিনাসর্তে সমস্ত ক্ষমতা রাজাকে অর্পণ করিয়া ক্ষমতাশূন্য হইয়াছেন। লকের মতে জনসাধারণ কতকগুলি সর্তে রাজাকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। রুশো বলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা সাধারণের ইচ্ছার উপর অর্পিত।

হবসের মতে রাজা হইলেন চুক্তির উর্দ্ধে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জনসাধারণের নাই। হবস রাজার ক্ষমতা অসীম, চরম ও অভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার বলিয়া জনসাধারণের বিদ্রোহের অধিকার আইনসঙ্গত। রাজা চুক্তি লঙ্ঘন করিলে জনসাধারণ দ্বারা পদচ্যুত হইতে পারেন। রুশোর মতে সরকার আদৌ সার্বভৌম, ক্ষমতার অধিকারী নয় ; জনসাধারণের সমর্থন ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই সরকার প্রতিষ্ঠিত।)

হবসের মতে জনসাধারণ একব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। লকের মতে জনসাধারণ আংশিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের উপর অর্পণ করে। রুশো বলেন যে সামাজিক চুক্তির পূর্বে ও পরে জনসাধারণ এককভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। সাধারণের ইচ্ছার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হইবার ফলে জনসাধারণ নিজেরাই এই ক্ষমতার অংশীদার হইল।

হবস্ ছিলেন স্টুয়ার্টরাজ প্রথম চার্লসের গৃহশিক্ষক। তিনি স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচার সমর্থন করিবার নিমিত্ত চরম রাজতন্ত্রের সপক্ষে রায় দেন। লক ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের যুগের লোক। সেই কারণে তিনি তাঁহার মতবাদ দ্বারা জনগণের সম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ইংরেজ দার্শনিক হবস্ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। লক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। রুশো জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মতবাদ প্রচার করেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যাকার হিসাবে হবস্, লক ও রুশোর মতবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে বলা যায়। হবস্ জনগণের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়াছেন এবং রাজার দয়ার উপর জনসাধারণ সম্পূর্ণ

নির্ভরশীল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলেন যে "Hobbes was the first great philosopher of discipline". লক জনগণের ক্ষমতা এবং সাধারণের সম্মতির সহিত রাজতন্ত্রের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন; এইজন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) মন্তব্য করেন যে, "Locke gave to the theory of Consent a permanent place in politics". রুশো গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। ম্যাকাইভারের (MacIver) উদ্ধৃতি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য, "Rousseau poured new wine in the old bottle and the bottle bursts." অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় যে রুশো প্রকৃতির রাজ্যে পালিত মুক্ত জনসাধারণকে নব্য ভাবধারায় সার্বভৌম ক্ষমতায় শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষমতার প্রাচুর্যে এই ভাবসাম্য রক্ষিত হইল না।

[ছয়] **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory):** অধ্যাপক গার্ণার বলিয়াছেন, ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন নাই, বলপ্রয়োগ দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই, চুক্তির দ্বারাও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই আবার পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াও রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে নাই। রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদে। জন মর্লের (Morley) মতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বার্জেসের (Burgess) মতে রাষ্ট্র হইল মানবসমাজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তনের ফল। কোন বিশেষ সামাজিক মুহূর্তকে নির্দেশ করিয়া বলা যায় না যে ওই সময় রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল; মানবসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটাইয়াছে।

এ্যারিষ্টটল তাঁহার Politics গ্রন্থে বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র হইল একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ স্বভাবতই রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী; অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের উপাদান মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সঙ্গলিপ্সা মানুষের ধর্ম, সে একক, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে চায় না। নরনারীর জৈবিক আকর্ষণ পরিবার গঠনে সহায়তা করিয়াছে। একটি পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় কতকগুলি পরিবার একত্র বসবাস করিতে শিখিয়াছে, আর এইভাবে গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি গ্রামও সব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতিতে মিলনের আকাংখা যতখানি প্রবল, বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছাও ঠিক ততখানি প্রবল। আদিম যুগে কতকগুলি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিত। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা

করিবার জন্য কর্তৃত্বের প্রয়োজন হইত, পরবর্তীকালে এই কর্তৃত্বই সরকারে রূপান্তরিত হইল।

রাষ্ট্র বিবর্তনে যে সকল উপাদান কাজ করিয়াছে তাহারা হইল রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এই সকল উপাদানগুলি অবশ্য সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে নাই। কোথাও হয়ত কতকগুলি উপাদান অধিকতর কার্যকরী ছিল আবার অন্য কোথাও হয়ত অপর উপাদানগুলি অধিক পরিমাণে সক্রিয় ছিল।

[এক] **রক্তের সম্বন্ধ (Kinship) :** আদিম যুগে রক্তের সম্পর্কই ছিল পরিবার গঠনের ভিত্তি। রক্তের সম্পর্ক সেইযুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বন্ধন ছিল। রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি আনুগত্য, মানুষ পারিবারিক জীবন হইতেই সেই শিক্ষালাভ করিল। কালক্রমে যখন পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাইয়া উপ-জাতিতে পরিণত হইল তখনো রক্তের সম্পর্ক বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল। পরিবারের উপর কর্তৃত্ব করিত গৃহস্বামী আর একই বংশোদ্ভূত সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব করিত গোষ্ঠীপতি। এইভাবে ধীরে ধীরে রক্তের সম্পর্ক সমাজ সৃষ্টি করিল এবং সমাজ অবশেষে রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল (Kinship creates society and society at length creates the state. MacIver).

[দুই] **ধর্ম (Religion) :** সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করিতে এবং কালক্রমে রাষ্ট্র উদ্ভবের শক্তি হিসাবে কাজ করিতে আদিম যুগের ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িল। এই সময় ধর্মের বন্ধন সমাজকে রক্ষা না করিলে উহা ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হইত। গেটেল যথার্থই বলিয়াছেন যে রক্তের সম্বন্ধ এবং ধর্ম একই জিনিষের দুইটি দিক ছাড়া আর কিছু নয়। রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা যৌথ ধর্মাচরণ আদিম মানুষকে আনুগত্য এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়া সামাজিক সংহতি বোধ সৃষ্টি করিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

আদিম ধর্ম প্রথমে পূর্বপুরুষদের পূজা ও পরে প্রকৃতি-পূজার রূপ গ্রহণ করে। আদিম সমাজে মানুষ মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা করিত এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তির সহিত মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার যোগাযোগ আছে; সুতরাং তাহার আদেশ অমান্য করিলে শাপগ্রস্ত হইতে হইবে; এইভাবে গোষ্ঠীপতি পুরোহিতের আসন অধিকার করিল।

পরবর্তীকালে যখন গোষ্ঠীর আয়তন বৃদ্ধি পাইল তখন ধর্ম প্রকৃতি-পূজার রূপ ধারণ

করিল। ঝড়, বজ্রপাত, মৃত্যু, ভূমিকম্প, বন্যা, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতিকে মানুষ অতি-প্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিত। এই সকল শক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মানুষ ইহাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এই পূজার কার্য সম্পাদনার ভার পড়িল পুরোহিত শ্রেণীর উপর। সাধারণ লোকের ধারণা হইল যে পুরোহিতরাই তাহাদিগকে প্রাকৃতিক শক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে সুতরাং সকলে পুরোহিতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সমাজে কর্তৃত্ব করিতে লাগিল।

[তিন] **যুদ্ধ (War):** যতদিন পর্যন্ত রক্তের সম্বন্ধ এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় ছিল ততদিন পর্যন্ত কোনরূপ সংঘর্ষ দেখা দেয় নাই। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন রক্তের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল তখন বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাত সুরু হইল। যুদ্ধে যিনি সৈন্য পরিচালনা করিতেন তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিলেন। যুদ্ধের সময় ছাড়া শান্তির সময়ও তিনি কলহ-বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেন। যুদ্ধনায়কেরাই বংশগতভাবে রাজপদ লাভ করিতেন; এইভাবে যুদ্ধই রাজার জন্ম দিল (War begot the King).

[চার] **ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private Property):** আদিম সমাজে পরিপূর্ণ সাম্য বিরাজ করিত। সেই অবস্থায় কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। মানুষ পশু শিকার করিয়া যাহা পাইত তাহা সকলে মিলিয়া সমানভাবে ভাগ করিয়া খাইত। শিকার যুগ ও পশুচারণের যুগের পর আসিল কৃষি যুগ। এই অবস্থায় পূর্বের সাম্য আর রহিল না। আদিম যুগে প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে লোকে 'এটা আমার', 'ওটা তোমার'—এইভাবে চিন্তা করিতে শিখিল। কৃষি যুগে মানুষ ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে সুরু করিল। যে ব্যক্তি যে জমি চাষ করিত সে সেই জমি বছরেব পর বছর চাষ করিয়া চলিল এবং উহার উন্নতি ও জলসেচের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিল; কালক্রমে উহাকেই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করে। কৃষি যুগ সুরু হওয়ার সাথে সাথে আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় দুইটি কারণে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের প্রয়োজন দেখা দিল: ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করা। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক হইল।

[পাঁচ] **অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic Necessity):** অর্থনৈতিক

প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠনে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র ও পানীয় সংগ্রহের সুবিধায় মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে। একটি পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় কতকগুলি পরিবার একত্র বসবাস করিতে শিখিয়াছে, এইভাবে গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি গ্রামও সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

[ছয়] **রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা** (**Political Consciousness**)**:** রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও রাষ্ট্রের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। আদিম অবচেতনার যুগে রক্তের সম্বন্ধ এবং ধর্ম মানুষের মনে অন্ধ আনুগত্যের সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাতের সময় মানুষ বুঝিল শত্রুপক্ষীয় উপজাতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইলে, অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে যুদ্ধনায়ক তথা রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ও স্বেচ্ছায় কর প্রদান করা প্রয়োজন। প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়, কালক্রমে উহা সমগ্র জনসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রনৈতিক উপলব্ধি যখন সারা সমাজে ছড়াইয়া পড়িল তখন মানুষ বুঝিল যে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্তমানে কাল্পনিক মতবাদসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সার্থক ব্যাখ্যা প্রদান করে বলিয়া বর্তমানে এই মতবাদই

মূল্যায়ন

গ্রহণ করা হয়। বার্জেস বলিয়াছেন অপূর্ণতার মধ্য দিয়া সুরু করিয়া বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্র সার্বজনীন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে (The state is a continuous development of human society out of a grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind); রাষ্ট্র বিবর্তনে যে উপাদানগুলি কাজ করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ

॥ Theories regarding the Nature of the State ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Theories regarding the nature of the State—the Organic or Biological theory—the Idealistic theory—The Marxist Theory—the Juristic Theory —the Mechanistic Theory.

বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ—জৈবমতবাদ—আদর্শবাদ—মার্কসীয় মতবাদ—আইনমূলক মতবাদ—যান্ত্রিক মতবাদ।

জৈব মতবাদ (The Organic or Organismic or Biological Theory) : রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে জৈব মতবাদ তাহাদের অন্যতম। এই মতবাদ জীববিজ্ঞানের আলোকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্লেটোর সময় হইতে স্বরু করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজ তথা রাষ্ট্রের সহিত জীবন্ত প্রাণীদেহের তুলনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে জৈব মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই মতবাদের মূল কথা হইল যে রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণী—ইহাকে প্রাণহীন যন্ত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাণীদেহের যেরূপ জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু আছে রাষ্ট্রেরও সেইরূপ জন্ম, বিবর্তন এবং ধ্বংস আছে। লীককের ভাষায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত জীবটির যে সম্পর্ক, গাছের পাতার সহিত গাছের যে সম্পর্ক, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেইরূপ সম্পর্ক। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষ (cell) দ্বারা গঠিত সেইরূপ রাষ্ট্রও বহুব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত। 'দেহবিচ্ছিন্ন কোষের যেমন পৃথক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রবহির্ভূত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। রাষ্ট্রের ভিতরই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। রাষ্ট্রনায়ককে জীবাত্মার সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে আত্মা যেমন দেহকে শাসন করে রাষ্ট্রনায়কও সেইরূপ রাষ্ট্রকে শাসন করেন। ব্যক্তির মস্তিষ্ক আছে, উহা চিন্তা করে এবং সমগ্র দেহকে শাসন করে। রাষ্ট্রের আইনসভা উহার মস্তিষ্কস্বরূপ। মানুষের মধ্যে বিচারশক্তি আছে, উহা কাজের গুণাগুণ বিচার করে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ বিচার বিভাগ রহিয়াছে যাহা রাষ্ট্রের দিক হইতে ব্যক্তির কাজের গুণাগুণ বিচার করে। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-

মূল বক্তব্য

প্রত্যঙ্গগুলির সহযোগিতার ফলেই প্রাণীর উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রাভ্যন্তরের অধিবাসীগণের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। প্রাণীর যেমন মুখ ও উদর আছে সেইরূপ রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে ; রাষ্ট্রে যেরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা জীবদেহে সেইরূপ রক্ত চলাচল ব্যবস্থা। ব্লানৎস্লি রাষ্ট্রকে পুরুষ এবং গীর্জাকে নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

তবাদের উদ্দেশ্য

জৈব মতবাদের সমর্থকেরা রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলির সহিত প্রাণীর যে সম্পর্ক, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেরূপ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত—একে অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন কোষের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সেইরূপ রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic theory) অনুসারে সমাজ একটি প্রাণহীন যন্ত্র। কিন্তু জৈব মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করিয়াছে। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ব্যক্তিগণ তাহাদের অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্রও ব্যক্তিগণের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির উন্নতিতেই রাষ্ট্রের উন্নতি। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকিবে। ব্যক্তির যে পৃথক অস্তিত্ব, ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে তাহা এই মতবাদে স্বীকার করা হয় না। জীবদেহ গঠনকারী কোষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি নাই কিন্তু রাষ্ট্রগঠনকারী ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রবহির্ভূত ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

জৈব মতবাদ হইতেই আদর্শবাদের জন্ম হইয়াছে। প্লেটো এবং এরিষ্টটল মনে করিতেন যে সমাজ এবং রাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন আর সমাজের অধিবাসী হইলেই ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। ইহারা বলিলেন রাষ্ট্রের সার্থকতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে। ব্যক্তি স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রের সংঘাত বাধিলে ধরিয়া লইতে হইবে সে ব্যক্তিই ভুল করিতেছে কারণ রাষ্ট্র এমন এক প্রতিষ্ঠান যাহা ভুলভ্রান্তি এবং অন্যায়ের উর্ধে। জৈবমতবাদে রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের জন্য যেমন ব্যক্তি অপরিহার্য সেইরূপ

ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্য মানুষের জীবনে রাষ্ট্রও অপরিহার্য।

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সুরু হইতেই জৈব মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রকে এক বিরাটদেহী মানুষ হিসাবে কল্পনা করিয়া মানুষের কার্যাবলীর সহিত রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সাদৃশ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সমাজকে শাসক, যোদ্ধা এবং শ্রমিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া জ্ঞান, সাহস এবং আকাংখা—মানুষের এই তিন প্রবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকে বড-A-র সহিত তুলনা করিলে ব্যক্তি হইবে ছোট-a। এ্যারিষ্টটল এই মতবাদের বশবর্তী হইয়া বলিয়াছেন দেহ বিচ্যুত হাত যেমন হাত নয় সেইরূপ রাষ্ট্রবহির্ভূত ব্যক্তিও ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের অংশ হিসাবেই মানুষ তাহার জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে। রোমক লেখক সিসেরো (Cicero) রাষ্ট্র-নায়কের সহিত দেহান্তর্গত আত্মার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আত্মা যেরূপ দেহকে শাসন করে সেইরূপ রাষ্ট্রনায়কও দেশকে শাসন করেন।

বিবর্তন

মধ্যযুগের লেখকদিগের মধ্যে সল্‌সবেরীর জন (John of Salisbury) মারসিগ্‌লিও (Marsiglio of Padua) এবং আলথুসিযাসের (Althusius) চিন্তাধারায় জৈবমত-বাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগের গোড়ার লেখকদিগের মধ্যে হব্‌স (Hobbes) এবং রুশো রাষ্ট্র-দেহ এবং জীবদেহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। হব্‌স রাষ্ট্রকে লেভিয়াথা (Leviathan) নামক কাল্পনিক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রুশো রাষ্ট্রের আইন রচনার ক্ষমতাকে হৃদয়, শাসন ক্ষমতাকে মস্তিষ্ক এবং রাজস্বকে রক্তের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রচারিত হইবার ফলে রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং জৈবমতবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই শতকের জৈবমতবাদের উগ্র সমর্থক হিসাবে শাফল (Schaffle), ব্লান্টৎশ্লি (Bluntschli) এবং হার্বার্ট স্পেনসারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জার্মান লেখক ব্লাণ্টশ্লির হাতেই জৈবমতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার মতে রাষ্ট্র জীবদেহের অবিকল প্রতিমূর্তি। রাষ্ট্র জীবদেহের প্রতিমূর্তি হইলেও ইহা কতকগুলি মানুষের সমষ্টি মাত্র নয়—ইহার এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি আছে। তাঁহার ভাষায়, একটি তৈলচিত্র যেমন কতকগুলি তৈলবিন্দুর সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু, একটি মর্মর মূর্তি যেমন কয়েকটি মর্মর প্রস্তর খণ্ড ছাড়া আরও কিছু, একটি মানবদেহ যেমন কয়েকটি কোষের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু সেইরূপ রাষ্ট্রও কয়েকটি

বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি ছাড়াও আরও কিছু। রাষ্ট্রের এক পৃথক সত্তা আছে। রাষ্ট্রকে তিনি পুরুষের সঙ্গে এবং নারীকে গীর্জার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতকের বৃটিশ চিন্তানায়ক হার্বার্ট স্পেন্সারের হাতে জৈবমতবাদটি চরম পরিণতি লাভ করে। তিনি জীবদেহ এবং রাষ্ট্রের সাদৃশ্যের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত সেইরূপ রাষ্ট্রও বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। জীবকোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর এবং সামগ্রিকভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল সেইরূপ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত—একে অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। হাত যেমন বাহুর উপর এবং বাহু যেমন দেহ এবং মস্তকের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ সমাজ শরীরের বিভিন্ন অংশও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

স্পেন্সার প্রাণীদেহ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগত, গঠনগত এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র ও প্রাণী উভয়েরই জীবনের সূচনা হয় ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে। নিম্নস্তরের প্রাণীর প্রধান লক্ষণ যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি, আদিম মানুষেরও সেইরূপ প্রধান লক্ষণ ছিল সংগ্রামশীলতা। বিবর্তনের একই নিয়মে তাহারা বাড়িয়া জটিল রূপ ধারণ করে। বিবর্তনের ফলে জীবদেহ যেমন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে সেইরূপ রাষ্ট্রেও কর্ম-বিভাজনের প্রসার ঘটে। জীবদেহে যেরূপ শিরাউপশিরা আছে, রাষ্ট্রেও সেইরূপ পরিবহন ব্যবস্থা আছে। স্নায়ুমণ্ডলী যেমন জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে সেইরূপ সমগ্র রাষ্ট্রদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। রক্তকণিকা যেমন জীবদেহকে সজীব রাখে সেইরূপ অর্থব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে সচল করে। প্রাণীর যেরূপ মৃত্যু আছে রাষ্ট্রেরও সেইরূপ ধ্বংস আছে—কেহই চিরস্থায়ী নয়। জীবদেহ যেমন কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি সেই-রূপ রাষ্ট্রও বহু ব্যক্তির সমষ্টি। দেহ হইতে যেমন হাত বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কোন তাৎপর্য থাকে না সেইরূপ রাষ্ট্রবিচ্যুত ব্যক্তিরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। প্রাণীদেহের একটি অথবা কয়েকটি কোষ বিনষ্ট হইলে যেমন উহার কোন ক্ষতি হয় না সেইরূপ একটি বা কয়েকটি ব্যক্তির মৃত্যুতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। জীবদেহ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেও স্পেনসার উহাদের বৈসাদৃশ্যও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হার্বার্ট স্পেনসার জৈব-মতবাদ বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে ব্যক্তিস্বাত-ন্ত্র্যবাদ জৈব মতবাদের অস্বীকার মাত্র।

সমালোচনা (Criticism): অধ্যাপক গার্ণার বলেন যে জৈবমতবাদ বলিতে যদি একথা বুঝায় যে রাষ্ট্র এমন 'এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিগণ এক বিশেষ অর্থে সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজও ব্যক্তিগণের উপর নির্ভরশীল তাহা হইলে এই

মতবাদ সমালোচনার উর্ধে। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও উহাকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা কল্পনা করা অর্থহীন বলিয়াই হবহাউস মনে করেন। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির সহিত জীবকোষ তুলনীয় নয়। জীবকোষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই কিন্তু রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবন এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। কোন কোষ জীবদেহ হইতে বিচ্যুত হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে কিন্তু রাষ্ট্রের বাহিরেও ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে ইহা কল্পনা করা যায়। জীবদেহের কোন কোষ একই সঙ্গে একাধিক জীবদেহের অঙ্গীভূত হইতে পারে না কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারে। এক জীবদেহ হইতে অপর এক জীবদেহের জন্ম হয়। কিন্তু জেলিনেক (Jellinek) বলেন যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য নয়। শুধু রক্ত এবং তরবারির সাহায্যে বহু রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। জীবদেহের মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু রাষ্ট্রের ধ্বংস সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা কঠিন। জীবদেহে চেতনাশক্তি মস্তিকে কেন্দ্রীভূত থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের চেতনা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। জীবদেহের কোষগুলি যেভাবে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিগণ সেইভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত নয়।

জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে জৈব মতবাদ ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে ইহাকে ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের কার্যাবলী যতদূর সম্ভব সংকুচিত করিয়াছেন; আবার ব্লাণ্টস্লিও অন্যান্য দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে সংকুচিত করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। অধ্যাপক গেটেল যথার্থই বলিয়াছেন যে জৈব মতবাদ যেমন রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না সেইরূপ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কেও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারে না (The organic theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the state nor a trustworthy guide to state activity.)

জৈবমতবাদ বিপজ্জনকও বটে। এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লইলে ব্যক্তি তাহার স্বাতন্ত্র্য তথা স্বাধীনতা হারাইয়া রাষ্ট্রের অংশ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বলি দিয়া সমাজকল্যাণ করা সম্ভব নয়। এই মতবাদের পরিণতি আদর্শবাদ আর আদর্শবাদই ফ্যাসিবাদ এবং ন্যাৎসীবাদের জন্ম দিয়া বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছে; সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল এবং অগণতান্ত্রিক জৈব মতবাদ গ্রহণের অযোগ্য এবং তত্ত্বগতভাবে অযৌক্তিক।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বলা যায় যে সাদৃশ্য এবং যুক্তি এক নয়। দুইটি জিনিষের মধ্যে তুলনীয় বিষয় পাইলেই প্রমাণ হয় না যে উহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে। রাষ্ট্র কোন জীবদেহ নয়—কতকগুলি ক্ষেত্রে জীবদেহের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে আর কতকগুলি ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে। (The state is not an organism. It is like an organism in some respects and unlike an organism in other respects) তুলনা অধিক দূর পর্যন্ত টানিলে ভুল করা হইবে। দেহগত গঠন আছে এই অর্থে রাষ্ট্র একটি প্রাণী নয়। ইহা একটি মানসিক সত্তা, 'এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বহু মনের সমবায়। (The state is not an organism in the sense of being a physical structure. It is a mental structure, a union of different minds in a common purpose); হবহাউস রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করা অর্থহীন বলিয়া মনে করেন।

মূল্যায়ন (Evaluation) : এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সমালোচনা হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলা যায় না। এই মতবাদের তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহা নাগরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং রাষ্ট্রের মূলগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতবাদ এই সত্যের উপর আলোক সম্পাত করে যে সমাজ শুধুমাত্র যোগসূত্রহীন ব্যক্তি সমবায় ছাড়া আরও কিছু—প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজের উপর এবং সমাজও তাহার অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল। জৈব মতবাদ বিশ্বাস করে যে মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীব এবং তাহাদের সমাজ গঠনের সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র ক্রমবিবর্তনের ফল। এই তত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র উদ্ভব সম্পর্কে প্রচলিত যান্ত্রিক মতবাদের (Mechanistic) অসারত্ব প্রমাণিত করিয়াছে। উপসংহারে বলা যায় জৈব মতবাদ নমনীয় প্রকৃতির বলিয়া অতি সাবধানতা সহকারে ইহা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তুলনা অধিক দূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে না। বর্তমানে হেগেলীয় মতবাদ ছাড়া অন্য কোথাও এই মতবাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

আদর্শবাদ (Idealistic Theory of the State) : রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল মতবাদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে আদর্শবাদ তাহাদের অন্যতম; ইহা চরম মতবাদ (Absolutist Theory) এবং দার্শনিক মতবাদ (Metaphysical theory) নামেও পরিচিত। ম্যাকাইভার ইহাকে 'মিষ্টিক' মতবাদ (Mystical theory) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটল

টলের লেখায় আদর্শবাদের সূচনা হয়। গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারায় রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় সংস্থা বলিয়া মনে করা হইত। তাহাদের নিকট রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা, এবং রাষ্ট্র ব্যতিরেকে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না। রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই। মানুষ স্বভাবতই সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীব আর রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবেই মানুষ তাহার জীবনকে সার্থক, সুন্দর, এবং পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রের বাহিরে ব্যক্তিসত্তার কোন তাৎপর্য নাই। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ব্যক্তি 'নীতিহীন শূন্যতা' (unethical abstraction)।

পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (Kant) (১৭২৪-১৮০৪) এবং হেগেলের (Hegel) (১৭৭০-১৮৩১) হাতে আদর্শবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণতঃ কাণ্টকেই আদর্শবাদের জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অবশ্য কাহাকে কাহারো মতে হেগেলই ইহার স্রষ্টা। কাণ্টের মতে রাষ্ট্র হইল সর্বশক্তিমান, অভ্রান্ত এবং মূলত ঐশ্বরিক (The state is omnipotent infallible and divine in essence) রাষ্ট্র কোনরূপ অন্যায় করিতে পারে না এবং রাষ্ট্র ঐশ্বরিক বলিয়া ইহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ব্যক্তির এক পবিত্র কর্তব্য। হেগেলের নামের সহিত আদর্শবাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের রক্ষণকর্তা এবং একঅর্থে উহার স্রষ্টা হিসাবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা হেগেলের দর্শনেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁর মতে সমাজে বাস করিয়া মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা—সমাজ গঠনের পূর্বে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এই স্বাধীনতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ভোগ করা সম্ভব—রাষ্ট্রের বাহিরে কোথাও স্বাধীনতা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে না। (Nothing short of the State is the actualization of freedom) রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ তাহার বাহ্যিক সত্তাকে তাহার আন্তর সত্তার স্তরে উন্নীত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে ; প্রকৃত স্বাধীনতা সমাজের মধ্যে বিরাজ করে এবং ইহা সমাজেরই অবদান। আইনের মধ্যে, সমাজ হইতে লব্ধ আভ্যন্তরীণ নীতির শাসনের মধ্যে এবং সামাজিক সংস্থাসমূহ ও প্রভাবের মধ্যে—এই তিনভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছা থাকায় রাষ্ট্রেই ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির "প্রকৃত ইচ্ছার" (real will) সমবায়ে যে "সাধারণ ইচ্ছা" (General Will) গঠিত হেগেলের মতে তাহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিসমষ্টির ব্যক্তিত্ব হইতে শ্রেয়, রাষ্ট্রের ইচ্ছা ব্যক্তি সমষ্টির

ইচ্ছা হইতে শ্রেয়। সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই যুক্তিপূর্ণ এবং ঠিক (always rationa and right) ইহা ভুল ভ্রান্তির উর্ধে বলিয়া ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত রাষ্ট্রের সাধার ইচ্ছার বিরোধ বাধিলে ধরিয়া লইতে হইবে ব্যক্তিই ভুল করিতেছে। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিলে ধরিতে হইবে যে ব্যক্তির প্রকৃ ইচ্ছাই তাহাকে পরিবর্তনে বাধ্য করিতেছে। প্রকৃত ইচ্ছানুসারে চলিলে তবে ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রাষ্ট্র ব্যক্তির সকল অধিকারে উৎস বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে যাইবার অধিকার কাহারো নাই। হেগেল রাষ্ট্রের উপ দেবত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন রাষ্ট্র হইল আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্ম জ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি (A self-conscious ethical substanc and self-knowing and self actualizing individual). হেগেলীয় দর্শনে রা শুধু চরম ক্ষমতাসম্পন্ন নৈতিক প্রতিষ্ঠানই নয়—ইহা মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদসঞ্চা (March of God on Earth).

রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের ধারণা হইতে তিনটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, রা ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, ইহা কখনোই সত্য নয়—অন্যভাবে বল যায় যে রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। পুলিশ যে চোরকে গ্রেপ্তার করে তাহা চোরের প্রকৃত ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। আদর্শবাদ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে—আইনের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বাধীনত উপভোগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সম্পর্ক ব্যক্তিকে অপরাপর ব্যক্তিদিগে এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সহিত বাঁধিয়া রাখে তাহারা ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ ওই সকল সম্পর্ক বাদ দিলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইবে। বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসাবে ব্যক্তি কোন কিছু করিতে পারে না—সে যাহা করে তাহা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রই হইতেছে নাগরিকগণের সামাজিক নীতিবোধের মূর্ত প্রতীক

হেগেল পরবর্তী যুগের জার্মান দার্শনিকগণ আদর্শবাদকে চরম পর্যায়ে তুলিয় ইহাকে যুদ্ধবাদে (Militarism) রূপান্তরিত করিলেন। নিট্‌সে (Nietzsche ট্রিটস্কে (Treitschke) এবং বার্ণহার্ডির (Bernhardi) চিন্তাধারায় যুদ্ধবাদ সোচ্চা হইয়া উঠিল। ট্রিটস্কের মধ্যে মেকিয়াভেলির আত্মা প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল রাষ্ট্র শক্তি তথা পৌরুষের মূর্ত প্রতীক (The State is power), শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা যায়; ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকা উচিত নয়। রাষ্ট্রকে বৃহদায়তন হইতে হইবে আর তাহার জন্য যুদ্ধের মাধ্যমে পররাজ্য গ্রাস করা অন্যায় বা পাপ নয়—বর উহাই রাষ্ট্রের মহান কর্তব্য—রণরক্ত সফলতাই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবে। রণ দামামার ছন্দে জীবনের স্পন্দনই পৌরুষের পরিচয়। এইভাবে যুদ্ধবাদকে সক্রি

থন জানাইয়া এই সকল দার্শনিকগণ সাম্রাজ্যবাদের যৌক্তিকতা প্রচার রিয়াছিলেন। ইহাদের এই যুদ্ধবাদ প্রচারই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ লিয়া কথিত হয়।

জার্মান আদর্শবাদ ইংরেজ আদর্শবাদীদিগের হাতে আসিয়া পরিমার্জিত হয়। রেজ আদর্শবাদীগণের মধ্যে ব্রাডলে (F. H. Bradley) গ্রীণ (T. H. Green) ং বোসাংকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নয়া আদর্শবাদী ব্রাডলেও গেলের মত রাষ্ট্রকে একটি সচেতন নৈতিক সত্তা হিসাবে দেখিয়াছেন। কিন্তু ডলের আদর্শবাদ ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থে বলি না দিয়া ব্যক্তির মধ্য দিয়া সমাজ ত্তাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে (Bradley's Hagelianism does not sacrifice ıe individúal to the group but rather seeks to realize tho group in ıe individual). গ্রীণের মতে রাষ্ট্রের স্থান সবার উপরে আর রাষ্ট্রের মধ্যেই ক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব। ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকার ীণ স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধবাদকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের প্নও দেখিয়াছেন। বোসাংকে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার রিলেও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমারেখা নির্দেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির হান জীবন বিকশিত করিয়া তোলা আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল অন্তরায় াছে তাহাদের উচ্ছেদ করা। বোসাংকে শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং াধিত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে বলা যায় আদর্শবাদের মূলকথা হইল রাষ্ট্রকে একটি আদর্শের উপর তিষ্ঠিত করিয়া সমাজজীবনে উহার প্রাধান্য স্বীকার করা। রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে এক সমুচ্চ বেদীমূলে স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত সকল ক্তিগণকে সেই বেদীমূলে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ারাধনা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় নৈতিক সংগঠন, ন্যান্য সকল সংস্থার উর্ধে। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। ষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; উভয়েরই উদ্দেশ্য ক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। রাষ্ট্র কোন লক্ষ্যে পৌছানর উপায় নয়—উহা স্বয়ং উদ্দেশ্য— ষ্ট্রের স্বার্থকতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল বলপ্রয়োগ নয়— চ্ছা। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে কিন্তু ইহা ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের আদেশ পালন বশ্য কর্তব্য কারণ উহার ফলে সাধারণ কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে আর ব্যক্তি কল্যাণ াধারণ কল্যাণের একটি অংশ।

আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল এবং প্লেটোর চিন্তাধারার আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। উভয়েই রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখিয়াছেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই। মানুষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীব হিসাবেই জীবনকে সার্থক, সুন্দর এবং পূর্ণতা দিতে পারে।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের তুলনায় চার্চের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার দরুন গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা প্রায় হাজার বছর ধরিয়া স্তিমিত থাকে। রুশোর চিন্তাধারার সহিত গ্রীক রাজনৈতিক মতবাদ আধুনিক চিন্তাধারাকে পুনপ্রভাবিত করিতে সুরু করে। রুশো তাঁহার যুগান্তকারী রচনা Le Contract Sociale-এ বলেন যে রাষ্ট্র মূলত একটি নৈতিক সংগঠন—উহার মধ্য দিয়াই ব্যক্তি তাহার নৈতিক পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সদস্য না হইলে মানুষ নির্বোধ এবং সীমাবদ্ধ জীব (a stupid and limited animal), রাষ্ট্রের সদস্য হইয়াই মানুষ বুদ্ধিমান জীবে পরিণত হয়। রুশো "সাধারণের ইচ্ছার" (General Will) মতবাদ প্রচার করিয়া বলেন যে প্রত্যেকেরই উহাতে অংশ আছে।

রুশোর চিন্তাধারার বাহক কাণ্টের (Kant) হাতে আদর্শবাদ এক নবরূপ ধারণ করিল এতদিন ধরিয়া রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদ প্রচলিত ছিল, কাণ্ট আসিয় রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্ব প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান অভ্রান্ত এবং মূলত ঐশ্বরিক। রাষ্ট্র ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহার প্রতি আনুগত প্রদর্শন করা ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য। অবশ্য কাণ্ট রাষ্ট্রের অন্ধ পূজারী ছিলেন না তাঁহার রাষ্ট্রদর্শনের সাধারণ প্রবণতা হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি। এই কারণে তিনি রাষ্ট্রের কার্যপরিধিকে সর্বব্যাপক হইতে দেন নাই। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তি জীবনের বিকাশের পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহাদের অপসারণ করা (to hinder the hindrances to freedom) ; মানব জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য বলিয়া ব্যক্তির বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না ; উহা অন্যায় এবং পাপ ; সংবিধান ত্রুটিপূর্ণ হইলে সংস্কারের মাধ্যমে রাজাই উহার পরিবর্তন করিবে।

ফিক্‌টে (১৭৬২-১৮১৪) একজন বাস্তবপন্থী আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি প্রথমে আন্তর্জাতিকতার সমর্থনকারী থাকিলেও পরে জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়েন। তিনি ব্যক্তিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহিত একীভূত করেন নাই ; নৈতিক যুক্তিতে ফিক্‌টে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছেন।

জার্মান দার্শনিকগণের মধ্যে হেগেলের চিন্তাধারাই নিজ দেশে সর্বাধিক প্রভাব

প্রচার করিয়াছিল। হেগেলকে আদর্শবাদী বলা হইলেও আসলে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। যে আদর্শের ভিত্তিমূল স্বর্গে সে সম্পর্কে তাঁহার ধৈর্য বা আকাংখা ছিল না। হেগেল রাষ্ট্রকে অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে (mystical height) উত্তোলন করিয়া বলিয়াছেন ইহা এক আত্মসচেতন, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মোপলব্ধিকারী অতিমানবীয় সংস্থা। ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রসম্পর্কিত ধারণা হেগেলের মতবাদে পূর্ণতা লাভ করে। হেগেল বলিলেন রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি কোথাও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল স্বাধীনতা কারণ ইহা যুক্তির মূর্ত প্রকাশ—ত্রুটি-বিহীন যুক্তিসত্তা (perfected rationality) ; রাষ্ট্রের আইন মানিয়াই ব্যক্তি যথার্থ স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রই অধিকারের উৎস বলিয়া কাহারো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অধিকার নাই। হেগেলের নিকট রাষ্ট্র হইল প্রকৃত স্বাধীনতার মূর্তপ্রকাশ-; সামাজিক নীতিবোধের অভিব্যক্তি।

হেগেল পরবর্তী জার্মান দার্শনিকগণ—নিট্সে (Nietzche) ট্রিট্স্কে (Trietchke) এবং বার্ণহার্ডি (Bernhardi)—আদর্শবাদকে যুদ্ধবাদে পরিণত করেন। যুদ্ধ অন্যায় নয়, ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র শক্তির প্রতীক এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্র তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবে।

জার্মান লেখকদিগের দ্বারা সৃষ্ট আদর্শবাদ ইংরেজ আদর্শবাদীগণের হাতে আসিয়া পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত হয়। এই নয়া আদর্শবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে ব্রাডলে, গ্রীণ, ওয়ালেস (Wallace) এবং বোসাংকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ব্যক্তিসত্তাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেন নাই। গ্রীণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা, ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গ্রীণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সীমিত করিয়াছেন। গ্রীণ যুদ্ধবাদকে স্বীকার করেন না—যুদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াও তিনি মনে করেন না।

গ্রীণের মতে রাষ্ট্র স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় এবং নৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল অধিকার বলবৎ করা। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে কারণ ইহা "সাধারণ ইচ্ছা" প্রকাশ করে ; রাষ্ট্র অবাধ অথবা সর্বশক্তিমান নয়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিক হইতেই ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আইন মানুষের বাহ্যিক কার্যাবলীই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—কিন্তু মানুষের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। বাহ্যিক দিক হইতে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। গ্রীণ আন্তর্জাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করিতেন। ব্রাডলে রাষ্ট্রকে একটি সচেতন নৈতিক সত্তা হিসাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সামাজিক সম্পর্কই মানুষের যথার্থ স্থান

নির্ধারণ করে। মানুষ তাহার স্বীয় কর্তব্য পালন (my station and its duties) করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। বোসাংকের মতে রাষ্ট্র "সাধারণ ইচ্ছার" সঠিক প্রকাশ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল বাধা আছে তাহাদের দূর করিয়া উহার পথ সুগম করা।

জার্মান আদর্শবাদের সহিত নয়া আদর্শবাদের কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিয়াছিলেন। নয়া আদর্শবাদীরা মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও গণতান্ত্রিক ছিলেন। ইহারা ব্যক্তির স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্মান আদর্শবাদীগণ রাষ্ট্রব্যতীত অন্য কোন সামাজিক সংস্থাকে স্বীকার করেন নাই কিন্তু নয়া আদর্শবাদীরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, জার্মান দার্শনিকগণের মতে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং চরম। কিন্তু ইংরেজ আদর্শবাদীগণের মতে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ। চতুর্থতঃ, জার্মান দার্শনিকগণ ছিলেন জাতীয়তাবাদী কিন্তু বৃটিশ দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

জার্মান ও নয়া আদর্শবাদের পার্থক্য

সমালোচনা (Criticism) : জোয়াডের মতে আদর্শবাদ তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক, বাস্তবতার দিক হইতে অসত্য এবং রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির দিক হইতে বিপজ্জনক। আদর্শবাদীগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া রাষ্ট্রের সহিত সমাজের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। ইহা সত্য যে মানুষ রাষ্ট্রের বাহিরে তাহার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না কিন্তু তাহার অর্থ নয় যে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান। ব্যক্তির ইচ্ছা এবং স্বার্থের উর্ধে রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে ইহা সত্য নয়। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার মূল্য আছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কোন তাৎপর্য অথবা মূল্য নাই যদি না উহা রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করে ; অন্যভাবে বলা যায়, যে রাষ্ট্র ও সমাজ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য নয়।

আদর্শবাদীরা ব্যক্তির "প্রকৃত ইচ্ছা" (Real will) এবং বাস্তব ইচ্ছার (Actual will) মধ্যে যে পার্থক্য করেন জোয়াড ও ম্যাকাইভারের মতে তাহা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক এবং বাস্তবতার দিক হইতে অসত্য। আদর্শবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার শত্রু কারণ ব্যক্তিস্বার্থের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কোন বিরোধ বাধিলে ধরিতে হইবে যে ব্যক্তিই ভুল করিতেছে ; এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না।

আদর্শবাদ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন একটি নিছক দার্শনিক মতবাদ;

ইহাতে মানুষকে বুদ্ধিশীল জীবরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং মানবজীবনের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যেমন, আবেগ, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হইযাছে ; সুতরাং এই মতবাদ একদেশদর্শী।

আদর্শবাদ আদর্শ লইয়া আলোচনা করে—বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বার্কার (Barker) বলেন প্রত্যেক নাগবিকেব সম্মতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রের কল্পনা আদর্শবাদীরা করেন তাহা কল্পনার স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করিতে পারে—বাস্তব পৃথিবীতে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

আদর্শবাদীরা আইন ও স্বাধীনতাকে অভিন্ন হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। আইনকে স্বাধীনতারূপে কল্পনা করিযা আদর্শবাদ ন্যায ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারকে সমর্থন করিযাছে। তাই হবহাউস বলেন আদর্শবাদে যাহাকে স্বাধীনতা বলা হইযাছে আসলে তাহা স্বাধীনতাব অস্বীকার মাত্র। ল্যাস্কি বলেন যে, স্বাধীনতার সত্যকাব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইলে আদর্শবাদেব প্রতিটি ধারণাকে বাতিল কবিতে হইবে।

আদর্শবাদীদের মতে রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। সমালোচকদের মতে এই তত্ত্ব প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে কারণ সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজেব মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না কিন্তু বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায সমাজ ও রাষ্ট্রেব মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ছাডাও যে সকল অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান রহিযাছে ব্যক্তির জীবনে তাহাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায না।

আদর্শবাদীরা কোন আদর্শ সমাজ গঠনে আগ্রহী নয়—অসম্পূর্ণ সমাজকেই আদর্শ বলিযা প্রচার করিয়াছেন। এ্যারিষ্টটল ক্রীতদাস প্রথাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিযাছিলেন ; হেগেল যুদ্ধকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন, রাজতন্ত্রকে আদর্শ বলিযাছেন এবং গ্রীণ ধনতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তাই হবসন (Hobson) বলেন আদর্শবাদ রক্ষণশীলতার কলাকৌশলের একটি অঙ্গ ছাডা আর কিছু নয় Idealism is a part of the tactics of conservatism) ; আদর্শবাদ পার্থিব অবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদাসীন। সুতরাং বলা যায় যে ব্যবহারিক দিক হইতে ইহার কোন আদর্শগত মূল্য নাই।

হবহাউস একদিন বাগানে বসিয়া হেগেল পডিতেছিলেন এমন সময় একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। লণ্ডনে এই বোমা বর্ষণের কারণ হিসাবে হবহাউস হেগেলের আদর্শবাদকেই দায়ী করেন। বিকৃত আদর্শবাদই ন্যাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়াছে।

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আদর্শবাদের প্রয়োগ বিপজ্জনক পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে। যুদ্ধকে রাষ্ট্রের অধিকার হিসাবে স্বীকার করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

অরাজকতার সৃষ্টি হইবে এবং মানব সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যুদ্ধবাদকে সমর্থন করিয়া আদর্শবাদ মানবতার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদর্শবাদ হইতে চরমবাদ (Absolutism) এবং উহা হইতে পাশববাদের (Brutalism) উদ্ভব।

মুল্যায়ন (Evaluation) ঃ চরম আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য না হইলেও নব্য আদর্শবাদের কিছুটা মূল্য আছে। আদর্শবাদ নীতি এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনে নৈতিক সূত্রের প্রয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়। এই মতবাদে যে বলা হয় সমাজের বাহিরে ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাষ্ট্রই আইন ও অধিকারের উৎস বলিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করিতে পারে। আদর্শবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা না হইলে ইহা এতো হেয় এবং নিন্দনীয় হইত না।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (Marxist Conception of the State) ঃ আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাজগতে কার্ল হেনরিখ মার্কসের (Karl Heinrich Marx—1818-1883) অবদান এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়। মার্কসের রাষ্ট্রের প্রকৃতিসংক্রান্ত ধারণা তাঁহার Das Capital এবং Communist Manifesto এই দুইটি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। শেষোক্ত গ্রন্থটি মার্কস এঙ্গেলের (Engels) সহযোগিতায় রচনা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলের মতবাদ পরবর্তীকালে লেনিনের হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। লেনিনের State and Revolution গ্রন্থে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এরিষ্টটলের মতে মানব জীবনকে সুন্দর, সুখী এবং পরিপূর্ণ করিবার জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। আদর্শবাদী লেখক হেগেল রাষ্ট্রকে এক ঐশ্বরিক সংগঠন হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন—ইহা পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদসঞ্চার। কিন্তু মার্কস রাষ্ট্রকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাঁহার মতে রাষ্ট্র হইল শ্রেণী-শোষণের একটি যন্ত্র (a machine for maintaining the rule of one class over another) হেগেলের মতে রাষ্ট্র হইল চিরন্তন প্রতিষ্ঠান কিন্তু মার্কসের মতে রাষ্ট্র কোন চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। মানবেতিহাসের সুরুতে আদিম সাম্যাবস্থায় কোনরূপ পরস্পর বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ না থাকায় রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবার অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাসের নির্ভুল ধারায় যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হইবে তখন রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (The State will wither away).

মার্কসের মতে পাশব শক্তিকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহা

শ্রেণীস্বার্থের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। যে শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানসমূহের (means of production) উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করিয়া অন্য শ্রেণীকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। সমাজের অর্থনৈতিক প্রকৃতির উপরই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভর করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ভূম্যধিকারীগণের স্বার্থরক্ষা করিত, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নিয়োজিত। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা শ্রেণীহীন বলিয়া শোষণের যন্ত্র রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকিবে না, ফলে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজে প্রত্যেকেই তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু পাইবে এবং সামর্থ অনুযায়ী শ্রম প্রদান করিবে (From each according to his abilities, to each according to his needs).

মার্কসের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ তাঁহার নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—(১) দ্বন্দ্ববাদ (Dialectic), (২) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (The Economic Interpretation of History), (৩) উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Theory of Surplus Value), শ্রেণীসংগ্রাম (Doctrine of Class Struggle) এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat).

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি হইল হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ। জাগতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কস দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ করেন। দ্বন্দ্ববাদের মূলকথা হইল অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের (contradictions) পথ ধরিয়া মানব সভ্যতা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী শক্তি রহিয়াছে এবং উহাদের সংঘাতের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতার পরিবর্তনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে।

হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ

হেগেলের মতে সমাজ বিবর্তনের জন্য বস্তু অপেক্ষা ভাব (Idea) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বের মূলে রহিয়াছে বিশ্বচেতনা (World Spirit) বা পরম ভাব (Absolute Idea). প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তুই হইল এই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। হেগেল বলেন যে ভাবের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ পরিবর্তিত হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া মার্কস সমাজ বিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছেন—আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism), ঐতিহাসিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজ (Historical or Capitalist Society) এবং উচ্চ পর্যায়ের সাম্যবাদী (Higher Communism) সমাজ। এই তৃতীয় পর্যায়ে আদিম সাম্যবাদের সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিবে। আদিম সাম্যবাদ হইতে ধনতান্ত্রিক সমাজের

পরিবর্তন ধীর গতিতে হইবে কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ হইতে সাম্যবাদী সমাজের রূপান্তর আকস্মিকভাবে এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ঘটিবে।

মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হেগেলের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল ভাব, (idea) অপর পক্ষে মার্কসের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল জড় পদার্থ (matter), সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই যুগে যুগে সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করিয়াছে। হেগেলের নিকট ভাবই হইল এই বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব পৃথিবী ভাবেরই জাগতিক রূপ। মার্কসের মতে এই জড়জগৎকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের চিন্তা ও ভাব গড়িয়া ওঠে; বস্তু হইতেই ভাবের বিবর্তন হয়।

মার্ক্স ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন অর্থনৈতিক শক্তি অন্যান্য যে কোন শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী। অর্থনীতিই সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সমাজের প্রচলিত ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, নীতিবোধ, সামাজিক রীতিনীতি সকল কিছুকেই অর্থনীতি প্রভাবিত করিয়া তোলে। আমেরিকায় দাসব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ মানবতাবোধ নয়, মার্ক্স ইহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিবেন। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি কালক্রমে বুঝিতে পারিল যে দাস শ্রমিক স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা কম দক্ষ এবং ব্যয়বহুল তাই তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিল। ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ইহারা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। মার্ক্স ধর্মের উপর বিশেষভাবে বিরূপ ছিলেন—পুঁজিপতিগণ ধর্মের দোহাই দিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। ক্রীতদাসের শ্রমশোষণের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থা হইতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এবং উহা হইতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হইতে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হইবে—ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইহাই নির্দেশ করে।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

মার্কসের মতে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের যে ইতিহাস তাহা মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস (The history of all hitherto existing society is the history of class struggle). শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হইল শ্রেণীসংগ্রাম। যুগে যুগে মানব সমাজে শোষক ও শোষিত, উৎপীড়নকারী এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত—এই দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সেই শ্রেণী রাষ্ট্রের উপরও আধিপত্য করিয়া রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। শোষকশ্রেণীর শোষণ যখ

শ্রেণীসংগ্রাম

চরম আকার ধারণ করে তখনই তাহার পতন দেখা দেয়। অগণিত শোষিত জনতা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমে এইরূপ দুইটি শ্রেণীস্বার্থ হইল প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান ; যাহারা সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিল তাহারা হইল অভিজাত শ্রেণী (প্যাট্রিসিয়ান) আর শোষিত সম্প্রদায় হইল সাধারণ লোক (প্লেবিয়ান)। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভূমির মালিকানা বলে ভূম্যধিকারীগণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধীরে ধীরে করতলগত করিয়া ভূমিহীনশ্রেণীকে (Serf) শোষণ করিয়াছে। বর্তমান সমাজে মূলধন উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বলিয়া মূলধন মালিক (Bourgeoisie) সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রকে স্বীয় স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিপতি (bourgois) এবং মজুর বা সর্বহারা (Proletariat)—এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত। মূলধন মালিকদের লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক করা। মজুরদের জীবনধারণোপযোগী মজুরী দিলে তবেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হইবে। পুঁজিপতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট পুঁজিপতিগণ পরাভূত হইযা সর্বহারায় পরিণত হইবে। এইভাবে একদিকে মূলধন মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে আসিযা কেন্দ্রীভূত হইবে আর অপর দিকে সর্বহারার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। পরিশেষে, শোষণ চরমে উঠিলে সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লব করিয়া পুজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ কবিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিবে।

উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য উহার উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক। এই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির কৃতিত্ব শ্রমিকের কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে পুঁজিপতি বলিযা সে উহা আত্মসাৎ করে ; অর্থাৎ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা অনেক কম সে মজুরী হিসাবে পুঁজিপতির কাছ হইতে পায়। যে অতিরিক্ত মুনাফা শ্রমিকদেরই ন্যায্য পাওনা কিন্তু মালিক শ্রেণী তাহা অন্যায় উপায়ে ভোগ করিতেছে তাহাকেই মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় M – C – M.[1] ; পুঁজিপতি টাকা (M) লইযা বাজারে গিয়া যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং শ্রমিক ক্রয় করে। উহাদের সমন্বয়ে দ্রব্য (C) উৎপাদন করিয়া পুনরায় বাজারে লইয়া গিয়া অর্থের (M) বিনিময়ে বিক্রয় করে ; অর্থই উৎপাদনের সুরু এবং শেষ। এখন প্রথম M অপেক্ষা দ্বিতীয় M এর মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকেই মার্ক্স উদ্বৃত্তমূল্য বলিয়াছেন ; পুঁজিপতি হিসাবে ইহাই মূলধন মালিকের আয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে মার্ক্স অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উভয় দিক হইতেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব হইল উহার অর্থনৈতিক দিক আর শ্রেণীসংগ্রাম হইল উহার রাষ্ট্রনৈতিক দিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সমাজে সকল প্রকার ব্যক্তিগত শোষণের অবসান ঘটিবে।

মার্কসের মতে রাষ্ট্র হইল শ্রেণীস্বার্থের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। যে শ্রেণী উৎপাদন উপায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করে উহাই রাষ্ট্রকে অন্য শ্রেণী শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে (the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another). বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্বহারারা উৎপাদন উপায়সমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিবে। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই (transition period) শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হইবে না ; পরাজিত পুঁজিপতিগণ বিপ্লবকে বানচাল করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হইবে ; ধীরে ধীরে শ্রেণীস্বার্থের অবসান ঘটিয়া শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়াই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল, শ্রেণীস্বার্থ এবং শোষণের অবসানে রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। (The State will wither away), এই সমাজে প্রত্যেকে তাহার ক্ষমতা অনুসারে কাজ করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যবস্তু পাইবে। এই সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত শোষণের কোন সুযোগ থাকিবে না—পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য বিরাজ করিবে।

সর্বহারার একনায়কত্ব

সমালোচনা (Criticism): মার্কসীয় দর্শন যেরূপ মানুষের সনাতন চিন্তাধারার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছে সেইরূপ নানাদিক হইতে তীব্রভাবে ইহার সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের অভিমত হইল রাষ্ট্র পাশবশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শোষণের যন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধারণা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রগঠনে পাশব শক্তি অন্যতম উপাদান সন্দেহ নাই কিন্তু উহাকে একমাত্র উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রই সমাজকল্যাণের ভিত্তিতে গঠিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Welfare State) আদর্শে বিশ্বাসী। মালিকশ্রেণী যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কারখানা আইন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন (Social Security Act) পাশ করিয়া শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা করে। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কোনমতেই শোষণের যন্ত্র বলা চলে না।

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সাহায্যে ইতিহাসের জটিল ধারাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মার্কস ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক কারণগুলিকেই গুরুত্ব দিয়াছেন আর অর্থনৈতিক প্রভাব বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুষ শুধুমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই পরিচালিত হয় না; দেশপ্রেম, ক্ষমতালিপ্সা, মানসিক পরিতৃপ্তি, ধর্ম ইত্যাদির বিষয়ও মানুষের কর্মপ্রেরণাকে প্রভাবিত করে। অর্থনীতি ইতিহাসের অগ্রগতিকে পরিপূর্ণরূপে নয়, আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। মার্কস মতাদর্শের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই কিন্তু দেখা যায় যে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের জন্যই সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। মার্কস্ শুধুমাত্র মতাদর্শের ভূমিকাকেই নয়, সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের ভূমিকাকেও অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বলা যায় যে মার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সঠিক নয় কারণ অন্যতমকে তিনি একমাত্র উপাদান বলিয়া অভিহিত করেন।

তৃতীয়তঃ, মার্কসীয় কোন ভবিষ্যৎবাণীই সফল হয় নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম উন্নতির পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দিবে। এই কারণে মার্কস ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন যে জার্মানী অথবা ইংলণ্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হইবে। কিন্তু কৃষিপ্রধান এবং অনুন্নত রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়—ইহা মার্কসের কল্পনাতীত ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পরিবর্তনযুগে (transition period) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে ধ্বংস করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে কিন্তু তারপর হইতেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইযা যাইবে। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হইলেও সেখানে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও মার্কসীয় ভবিষ্যৎবাণী সফল হয় নাই। অবশ্য একথা উল্লেখযোগ্য যে নয়া চীনের দৃষ্টিতে সোভিয়েত রাশিয়া আজ আর প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়—সে শোধনবাদী (Revisionist)—উহা সমাজতন্ত্রের উচ্চ আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মার্কসের আর একটি ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশে ধনী অধিকতর ধনী হইলেও দরিদ্র জনগণের অবস্থা ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতেছে। সুতরাং সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুঃখদুদশার যে ভবিষ্যৎবাণী মার্কস করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। শ্রমিক সংগঠন, যৌথ দরাদরির ক্ষমতা (collective bargaining) এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান

দুঃখদুর্দশাব নিয়ম মিথ্যা হইযা গিয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্র যে তাহাব কবর বচনা করিতেছে (digging its own grave) ইহাও সত্য নয়।

চতুর্থতঃ মার্কস সমাজকে যে দুইটি পবস্পরবিবোধী শ্রেণী এবং যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত কবিয়াছেন তাহাও ঠিক নয়। সমাজের সকল ব্যক্তিকে ঠিক দুইটি শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত কবা যায না—বিভিন্ন ধবনেব শ্রেণী ও উপশ্রেণী লইযা সমাজ গঠিত। এই শ্রেণীবিভাগ অনমনীয নয় কাবণ মানুষেব অর্থনৈতিক অবস্থাব পবিবর্তনেব ফলে এক শ্রেণীব মানুষ অন্য শ্রেণীব মানুষে পবিবর্তিত হইতেছে আবাব একই শ্রেণীব মধ্যে যথেষ্ট বিবোধ বহিযাছে। সুতবাং সমাজকে বুর্জোযা এবং সর্বহাবা শুধুমাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবিযা শ্রেণীস্বার্থেব জটিলতা পবিহাব কবিযা উহাব যে সবল ব্যাখ্যা দেওযা হইযাছে তাহা অসত্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব পব যে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাবও নিশ্চয়তা নাই। তাই পোপাব (K R Popper) মনে করেন যে বিপ্লবেব পব বিপ্লবেব নেতাবা এক নূতন শাসকশ্রেণীব সৃষ্টি কবিবাব সম্ভাবনা বহিযাছে। সোভিযেত বাশিযায সত্যসত্যই কম্যুনিষ্ট পার্টিব সদস্য এবং সাধারণ লোকেব মধ্যে পার্থক্য বাড়িযা চলিযাছে।

পঞ্চমতঃ,উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বকে ভিত্তি কবিযা মার্কস পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক সর্বহাবাশ্রেণীর শোষণ ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। এই উদ্বৃত্ত মল্যতত্ত্বেব ধাবণাটিও তীব্রভাবে সমালোচিত হইযাছে। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসাবে শ্রমিকই মূল্য সৃষ্টি করে কিন্তু পরিবর্তে সে শুধুমাত্র জীবন ধাবণোপযোগী মজুবী পাইযা থাকে। দ্রব্যেব দাম এবং মজুবীও কাঁচামাল বাবদ ব্যযেব যে পার্থক্য তাহা মুনাফা হিসাবে পুঁজিপতি আত্মসাৎ কবে। মার্কসীয় দ্রব্যমল্যেব ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ কাবণ মালিকেব ধার্য ব্যয় (overhead charges) সম্পর্কে ইহাতে কোন ইঙ্গিত নাই। আমবা জানি যে উৎপাদন ব্যযেব দুইটি অংশ আছে—ধার্য ব্যয় এবং পবিবর্তনশীল ব্যয (variable cost), মার্কস শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যযের কথা চিন্তা কবিযাছিলেন।

ষষ্ঠতঃ মার্কসীযতত্ত্ব অনুসাবে সমাজতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রেব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (peaceful coexistence) সম্ভব নয। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেখা যাইতেছে যে এই দুই ধবনেব সমাজব্যবস্থা পাশাপাশি শান্তিতে অবস্থান কবিতে পারে।

সপ্তমতঃ সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত হইযা শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত হইলেও সমাজে কার্যাবলী শুধু থাকিবেই নয, উহাব পরিধি বিস্তৃত হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার জন্য একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার প্রয়োজন হইবে। রাষ্ট্র ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান কি হইতে পাবে তাহা কল্পনা কবা যায় না।

মূল্যায়ন (Evaluation) : মার্কসের চিন্তাধারারায় মৌলিকত্বের অভাব থাকিলেও তাঁহার সমন্বয় (synthesis) সম্পূর্ণ মৌলিক। মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব কিছু মৌলিক নয়, রডবারটাস Rodbertus), ব্রে (Bray) এবং উইলিয়ম টম্পসনের (William Thompson) লখায় উনবিংশ শতকের সুরুতেই এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশার নিয়ম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হইয়াছে। মার্কসীয় তত্ত্ব সমালোচনার উর্ধে না হইলেও মানুষের চিন্তাধারায় মার্কসের আবির্ভাব অসাধারণ বলিলে কম বলা হয়—তিনি বিশ্বের অবিস্মরণীয় বিস্ময়। অনেক অর্থনীতিবিদের মধ্যে তিনি শুধু একজন অর্থনীতিবিদ নন, অনেক চিন্তানায়কের মধ্যে তিনি শুধু একজন চিন্তানায়ক নন, অনেক ঐতিহাসিকের মধ্যে শুধু একজন ঐতিহাসিক নন, অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে তিনি শুধু একজন সমাজবিজ্ঞানী নন—তিনি শতাব্দীর বিস্ময়। আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের কোটি কোটি মানুষ মার্কসীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। বিশ্বের ইতিহাসে তিনি একক—তিনি দেশ দেশ বন্দিত, মন্ত্রিত তার ভেরী।

সমাজজীবনে অর্থনীতি একমাত্র প্রভাব না হইলেও ইহার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের বিবর্তনে শ্রেণীসংঘর্ষের ভূমিকা মার্কস অতিরঞ্জিত করিলেও মূলত উহা সত্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো হইতে সুরু করিয়া স্যার টমাস মুর পর্যন্ত বহু লেখক সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন কিন্তু এই সকল আলোচনাই ছিল অবাস্তব। মার্কসই প্রথম লেখক যিনি সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সারাজীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মার্কস সমগ্র মানবজাতির অভাব হইতে মুক্তি তথা শোষণ হইতে মুক্তির মহান কামনা করিয়াছিলেন। মার্কসীয় মতবাদ সার্বজনীন মানবতার মতবাদ বলিয়া বিশ্বজনের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, পৃথিবীর যে কোন দেশেই মানুষ সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে সেখানেই মার্কস তাহাদের প্রেরণা দিয়াছে, সাহস দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে—মার্কসকেই মানুষ ভবিষ্যতদ্রষ্টা বলিয়া পূজা করিয়াছে। মানুষের চিন্তার তরঙ্গধারায় জার্মান ইহুদি আজ সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আইনমূলক মতবাদ (The Juristic or Juridical Theory of the State) : আইনমূলক মতবাদ রাষ্ট্রকে আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়; আইন প্রবর্তনও

বলবৎ করা এবং আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করাই হইল রাষ্ট্রের কাজ (It views the state as a legal person existing for the creation and enforcement of law and the protection of legal rights). এই মতবাদে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয় বলিয়া কল্পনা করা হয় যে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা, অধিকার এবং সত্তা আছে। রাষ্ট্রের অধিকার হইল সমষ্টির অধিকার, রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল সমষ্টির ইচ্ছা, রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব হইল সমষ্টির ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিগত অধিকার, ইচ্ছা এবং সত্তার সহিত ইহার সংগতি থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। ব্লাণ্টস্লি রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব সত্তা এবং স্বার্থ আছে যাহা রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিগণের সত্তা এবং স্বার্থ হইতে ভিন্ন। রাষ্ট্র কাজের মাধ্যমে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে, ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে অভিযোগকারী অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানাধিকার করে।

রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংস্থা, ইহা শুধুমাত্র বর্তমান নাগরিকগণের স্বার্থই রক্ষা করে না, ভবিষ্যত নাগরিকদিগের স্বার্থের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। (The state is a permanent and enduring association, it is a sort of trustee or guardian of the interest not only of the people who comprise it today but of future generations) রাষ্ট্র একটি সংস্থা হইলেও অন্যান্য সংস্থার সহিত ইহার পার্থক্য হইল যে রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতাই হইল চূড়ান্ত।

সমালোচনা (Criticism): এই মতবাদকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা যায়। প্রথমতঃ, ইহা রাষ্ট্র সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ মতবাদ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রের আইনগত দিকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক কিন্তু উহাই রাষ্ট্রের একমাত্র দিক নয়। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদিগকে অধিকার প্রদান করে এবং কর্তব্য আদায় করে। কিন্তু ইহাতেই রাষ্ট্রের কার্য শেষ হইয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সংক্রান্ত আইনমূলক মতবাদ রাষ্ট্রের উচ্চতর জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মিস ফলেট (Follett) বলেন আমার আত্মার আবাসস্থল হইল রাষ্ট্র (The home of my soul is in the state)। হেগেলের মতে রাষ্ট্র এক অতি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। আইনগত সত্তার মতো রাষ্ট্রের আত্মিক সত্তাও আছে।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকদিগের মতে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। দুগুই (Duguit) বলেন রাষ্ট্রের উপর যে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হইয়াছে তাহা বাস্তবতাবিবর্জিত একটি মানসিক ব্যাপার (a pure mental concept devoid of all positive reality).

যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory of the State): যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করে। যন্ত্র যেরূপ স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র, রাষ্ট্রের সেইরূপ নিজস্ব কোন মূল্য নাই উহা নাগরিকগণের স্বার্থসাধনেব নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র। যান্ত্রিক মতবাদের মূল কথা হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। পরস্পরনিরপেক্ষ, স্বাধীন ব্যক্তিগণ চুক্তি করিয়া স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রগঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনে একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, রাষ্ট্রব্যতিরেকেও মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে। যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র কোন স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা জীবদেহের অনুরূপ নয়, রাষ্ট্র বিশ্বে ঈশ্বরের পদসঞ্চার নয়—রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা গঠিত একটি চুক্তিগত সংগঠন। ব্যক্তি তাহার স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়—ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্র মাত্র। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে যান্ত্রিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। হব্‌স্‌, লক এবং রুশোর মতে মানুষ চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। জনস্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম প্রভৃতি হিতবাদীরাও (Utilitarians) যান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী। সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। মার্কসীয় মতবাদের সহিত যান্ত্রিক মতবাদের পার্থক্য রহিয়াছে। মার্কসের মতে রাষ্ট্র হইল শোষণের যন্ত্র; কিন্তু যান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের উপায় মাত্র।

রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। বার্জেসের মতে রাষ্ট্র হইল মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তনের ফল; রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান—ইহা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। পরিশেষে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র উপায় হিসাবে দেখিলেই চলিবে না—ইহাকে একাধারে উদ্দেশ্য এবং উপায় হিসাবে দেখিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বভৌমত্ব

॥ Sovereignty ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Definition of Sovereignty—Characteristics of Sovereignty—Classifications of Sovereignty—Legal, Polilcal and Popular Sovereignty—Austnian Theory of Sovereignty—Pluralist Theory of Sovereignty.

বিষয়বস্তু : সার্বভামিকতাব সংজ্ঞা—সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য—সাবভৌমিকতার শ্রেণী বিভাগ—আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্ব—অষ্টিনেব মতবাদ—বহুত্ববাদ।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন দেশ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় না। সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; ইংরেজী Sovereignty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Superanus শব্দ হইতে আসিয়াছে ; Superanus শব্দের অর্থ Supreme বা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন হইতে পৃথক করে। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে বোঁদার (Bodin) উক্তি উল্লেখযোগ্য "Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects unrestrained by laws" অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা হইল নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যাহা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। উইলোবির (Willoughby) মতে সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের চরম ইচ্ছা "Sovereignty is the supreme will of the state"। রাষ্ট্রের এই চরম ইচ্ছার কাছে প্রত্যেকটি সংঘ ও প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা হইল আদেশ করারও আদেশ পালনে বাধ্য করানোর চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।

সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র অভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চরম আনুগত্য দাবী করে এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব বলিতে আমরা রাষ্ট্রের আদিম, মৌলিক ও স্বৈর ক্ষমতাগুলি বুঝিয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে বার্জেসের (Burgess) এর উক্তি উল্লেখযোগ্য, "Sovereignty is the orginal, absolute and unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects. "সার্বভৌমত্বের দুইটি দিক রহিয়াছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সঙ্ঘের উপর অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের ইচ্ছার সহিত অন্য কাহারও ইচ্ছার সঙ্ঘর্ষ হইলে, রাষ্ট্রের ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের

বলে উহা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ভোগ করে। কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে পারে না।

সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল (১) আদিম, মৌলিক ও স্বৈর ক্ষমতা, (২) অসীম ও অপরিসীম ক্ষমতা (৩) হস্তান্তরঅযোগ্য ক্ষমতা, (৪) অভ্রান্ত ক্ষমতা, ৫) অবিভাজ্য ; (৬) সার্বজনীন (৭) চিরস্থায়ী।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আদিম, মৌলিক ও স্বৈর বলিয়া রাষ্ট্র আইনপ্রণয়নে চরম-ক্ষমতা ভোগ করে। এই আইন প্রণয়নেব ক্ষমতা রাষ্ট্রেব মধ্যে আর কাহারও নাই। এই আইন প্রণয়নের দ্বারা রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চরম কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম এবং এই ক্ষমতা যতদিন রাষ্ট্রের করায়ত্ব থাকিবে ততদিন সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতাব অধিকারী হইবে। রাষ্ট্রের ধ্বংস হইলে, সার্বভৌম ক্ষমতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অসীম ও নিরঙ্কুশ বলিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। ইহাকে খণ্ডন করা যায় না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবিভাজ্য হইবার ফলে একই রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে গেটেলের (Gettel) উক্তি উল্লেখযোগ্য "If sovereignty is not absolute, no state exists ; if it be divided, more than one state exists. A divided soverignty is a contradiction in terms."

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং এই ক্ষমতার অর্থ হইল যে সরকারের ক্ষমতার পরিবর্তন হইলেও, সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত কবা যায না। রাষ্ট্র ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে পারে না। মার্কিন লেখক লাইবারের (Lieber) মতে বৃক্ষ যেমন তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তারের অধিকাব ও বৃদ্ধির অধিকার হস্তান্তর করিতে পারে না, মানুষ যেমন নিজেকে ধ্বংস না করিয়া নিজের জীবন ও ব্যক্তিত্ব হস্তান্তর করিতে পারে না, অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রও তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারে না।

রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত হইবার ফলে রাষ্ট্র কোন অন্যায় করিতে পারে না। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মান্য করিয়া চলা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্র কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না, এই কারণে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সহিত অন্য কাহারও ইচ্ছার সঙ্ঘর্ষ হইলে, রাষ্ট্রে ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে।

সার্বভৌমত্বের আরেকটি রূপ হইল ইহার সার্বজনীনতা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তি, ব্যক্তিসঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপরই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে। কেবল রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অন্য রাষ্ট্রের দূত ও তাহার কর্মচারিবৃন্দ এই ক্ষমতার অধীন নয়।

বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ না করার কারণ আন্তর্জাতিক শিষ্টতা মাত্র; রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে এই শিষ্টতা প্রত্যাহার করিতে পারে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চিরস্থায়ী। সরকার অথবা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না: উদাহরণস্বরূপ বৃটেনের মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের কথা বলা যায়। বৃটেনে একাধিকবার রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল শাসনতন্ত্রে একাদিক্রমে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে বৃটেনের সার্বভৌমত্ব কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বর্তমান যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অবিভাজ্যতা সম্পর্কে বহুত্ববাদিগণ সমালোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী নয়। রাষ্ট্র হইল বহুর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চরম কর্তৃত্ব ভোগ করা উচিত নয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব থাকিলেও বাহ্যিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ—সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং এই ক্ষমতার অধিকারী সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপগুলি হইল:—(১) নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular and Actual Sovereignty) (২) আইন অনুমোদিত ও বাস্তব অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব (De jure and De facto Sovereignty) (৩) আইনগত সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ব (Legal, Political and Popular Sovereignty)।

নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব—যাহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলবৎ হয়, তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্যের প্রধান হিসাবে যিনি আনুষ্ঠানিক সকল ক্ষমতাধিকারী, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছানুযায়ী এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ যিনি করিতে 'অসমর্থ' তাঁহাকেই নামমাত্র সার্বভৌম বলা হয়; বৃটেনের রাজা বা রাণী, ভারতের রাষ্ট্রপতি নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন। ইহাদের নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা যায়। অপরপক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে যিনি বা যাঁহারা শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং রাষ্ট্র পরিচালনার পূর্ণক্ষমতার অধিকারী তাঁহারাই হইলেন প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। বৃটেন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ হইলেন প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

আইন অনুমোদিত ও বাস্তব অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব—সার্বভৌম ক্ষমতা আইন

নুমোদিত ও বাস্তব অনুমোদিত উভয় প্রকারই হইতে পারে। সাধারণতঃ য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনপ্রণয়নে চরম ক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁহাকেই আইন অনুমোদিত সার্বভৌম বলা হয়। এই সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্রের জনগণের নিকট হইতে রম আনুগত্য দাবী করিয়া থাকে। কখনো কখনো দেখা যায় যে আইন অনুমোদিত সার্বভৌম ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া শক্তিশালী নায়ক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিপরিষদ যাহাদের পশ্চাতে আইনের কোন স্বীকৃতি নাই। বাস্তব ক্ষমতায় অধিকারী হইয়া নিজ ক্ষমতার বলে জনগণের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। পরবর্তীকালে জনগণের সম্মতি ও আইনের স্বীকৃতি পাইয়া আইনঅনুমোদিত সার্বভৌমত্বের অধিকারী হন। ইতিহাসে বাস্তব সার্বভৌমত্বের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; উদাহরণস্বরূপ ইংলণ্ডের ক্রমওয়েল, জার্মানীর হিট্‌লার, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন, ইটালীর মুসোলিনী এবং পাকিস্থানের আয়ুব খাঁর কথা উল্লেখযোগ্য। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য জনগণকেও নিজেদের অনুকূলে আনিতে সক্ষম হন। সুতরাং বাস্তব অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব আইন অনুমোদিত সার্বভৌমত্বের পূর্ববর্তী স্তর বলা যায়।

আইনগত, রাজনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্ব—ইহাদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকার হইলেন আইনবিদ্ অস্টিন (Austin)। আইন ও রাষ্ট্রনীতি এই দুয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইন-গত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অস্টিনের মতে আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়নে চরম ক্ষমতার অধিকারী তিনি বা তাঁহারা আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আদেশ জারী করিবার ক্ষমতা এই সার্বভৌম শক্তির উপর অর্পিত।

গ্রেটবৃটেনের রাজা সহ আইনসভা, অর্থাৎ রাজা, লর্ডসভা ও কমন্সসভা আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। বৃটেনের লর্ডসভা ও কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিলগুলি রাজা বা রাণীর সম্মতিক্রমেই আইনে পরিণত হয়। আদালত আইন প্রবর্তনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া আইনগত সাবভৌমত্ব অপরিসীম।

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমত্বের হস্তে থাকিলেও বাস্তবে সেই ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমত্ব ভোগ করে না। এই কারণেই আইনসম্মত সার্বভৌমত্বের অধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সকল সময়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে ডাইসির (Dicey) উক্তি উল্লেখ করা যায়, "Behind the Sover-

eign, which the lawyer recognises, there is another Sovereign to which legal Sovereign must bow." আইনবিদগণ যে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহার পশ্চাতে আরেকটি সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে, যাহার নিকট আইনবিদগণকে নতি স্বীকার করিতে হয়। এই সার্বভৌম শক্তিকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম শীর্ষক আখ্যা দেওয়া হয়। গিলক্রিষ্টের (Gilchrist) মতে আইনের আড়ালে এমন কতকগুলি প্রভাব আছে যেগুলিকে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী উপেক্ষা করিতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন দেশের নির্বাচকমণ্ডলী এবং ইহারাই সরকার নির্বাচন করিয়া থাকেন। সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলী এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ভোটের প্রার্থী মনোনীত করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচকমণ্ডলীর শক্তি নির্ভর করে রাজনৈতিক চেতনার উপর। সাধারণ নির্বাচনে শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন আনিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আইনগত সার্বভৌমত্ব অসীম ও চরম হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইংলণ্ডের রাজাসহ আইনসভা আইনজগতে সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা যায়। তত্ত্বগতভাবে আইনসভার ক্ষমতা অসীম ও সর্বব্যাপী, বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা জনগণের ইচ্ছাদ্বারা সীমাবদ্ধ সুতরাং আইনগত সার্বভৌমত্বের আড়ালে আরেকটি সার্বভৌম শক্তি কার্য করিতেছে, যাহাকে আইনবিদ্গণ স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব একই হস্তে অর্পিত, এবং ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না। পরোক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনগত সার্বভৌমত্ব ভোগ করেন জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এবং রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল জনসাধারণ। উপসংহারে বলা যায় যে আইনজীবিদের সার্বভৌমত্বের ধারণা আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিফলিত। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বুঝাইয়া থাকে।

জনগণের সার্বভৌমত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। রাজার অসীম, সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বের তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) জনগণর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেন। অধ্যাপক রীচির (Ritchie) মতে জনগণেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাহাই হউক না কেন। এই সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাকে হস্তান্তরিত করা যায় না। এই

ক্ষমতা প্রয়োগ না করিলেও লুপ্ত হয় না। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির মাধ্যমে এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে। পরোক্ষভাবে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিবার শক্তির দ্বারাই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযোগ করিয়া থাকেন। জনগণের সার্বভৌমত্বের মূল বিষয়বস্তু হইল যে জনগণই দেশের শাসক। জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য প্রকাশ করেন, সেই আনুগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধিদের প্রতিই উদ্দিষ্ট। জনগণের সম্মিলিত শক্তির নিকট সকল শক্তিকেই নতি স্বীকার করিতে হয়। রুশোর জনসার্বভৌমত্বের মূল বক্তব্য হইল জনগণের কথাই ঈশ্বরের বাণী। রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য দাবী করে, আবার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্রাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। রাষ্ট্র কখনোই জনমতকে দমন করিতে পারে না। এই জনমত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থই বিদ্রোহ করা। সুতরাং শেষপর্যন্ত জনসার্বভৌমত্বই কার্যকরী হয়, কারণ কোন সরকারই জনসাধারণের অনুমোদন ব্যতীত দীর্ঘদিন চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ নির্বাচকমণ্ডলী রাষ্ট্রের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। দেশের জনসমষ্টির একটি বৃহত্তর অংশ ভোটদানের অংশ হইতে বঞ্চিত। এই অবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীকে জনসার্বভৌমত্ব বলা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচকমণ্ডলী দলীয় ভিত্তিতেই ভোট প্রদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ দলীয় নেতার ইচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং ভোটাধিকার সাহায্যে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে, এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আইন পরিষদে সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া সর্বসাধারণের সংখ্যালঘু অংশ সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করে। কেহ কেহ বলেন যে জনমতের সাহায্যে এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং আইন প্রণয়নকালে বিবেচনা করিবার অধিকার আইনসভার। জনগণ কখনোও একমত হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। বিচারপতিগণও বিচারকালে জনগণের নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিষয়ের বিচার করেন না। তাঁহারা বিচার করেন ন্যায় এবং আইন অনুযায়ী, সুতরাং জনসার্বভৌমত্বের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। রীচি বলেন যে জনগণের শক্তি রাষ্ট্রের শক্তি অপেক্ষা বেশী। ইহার দ্বারাই গণসার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থন করা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে বশ্যতা স্বীকার করানো যায় না। যদি সকল লোককেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় তবে জনমত গ্রহণ ও গণউদ্যোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রে ইহা সহজসাধ্য নহে। গেটেল (Gettell) বলেন যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে।

জনগণের সার্বভৌমত্ব সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তবু বলা যায় জনসাধারণের ইচ্ছাকে কোন শক্তিই অধিকদিন উপেক্ষা করিতে পারে না। জনগণ হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেই মাত্র সরকার উহার অস্তিত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে সমর্থন করেন। জনসাধারণের কল্যাণার্থে সরকার না চালিত হইলেও, শেষ পর্যন্ত জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। জনগণের এই সার্বভৌমত্বই একমাত্র রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির (Laski) মতে যে শক্তির দ্বারা জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তাহাই হইল জন সার্বভৌম শক্তি। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীকেই জনসার্বভৌমত্ব বলা হয়।

সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা—এই ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রের চরম, পরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা যাহা রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ডাইসীর মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনমত, ঐশ্বরিক বিধান ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ মনে করেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন ও পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তির মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি সাক্ষর করিয়াও যে কোন রাষ্ট্র সেই চুক্তির সর্ত পালন করিতে অস্বীকার করিতেও পারে। আন্তর্জাতিক আইন মান্য করা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক আইনকে মান্য করিয়া চলে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে জাতি সংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রগুলির বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বিশ্বশান্তি ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

প্রাচীন লেখকগণ অনেকেই মনে করেন যে ঐশ্বরিক ও নৈতিক বিধান দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক বিধান, নৈতিক নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। সার্বভৌম শক্তি যদি জনসাধারণের নৈতিক চিন্তাধারা এবং বিশ্বাসের প্রতি সম্মান না দেয় তাহা হইলে সেই সার্বভৌম শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক চিন্তাধারা সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করিয়া থাকে।

অনেকের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক, আইন ও বিধিবদ্ধ আইন দ্বারাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঐশ্বরিক বিধান, নৈতিক নিয়ম যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, সেইরূপ শাসনতান্ত্রিক আইনও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে কিন্তু সরকারের ক্ষমতার সহিত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষ·তার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের কার্যাবলীর সীমা নির্দেশ করিতে পারে। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে না। শাসতান্ত্রিক আইনের সংশোধন পদ্ধতিও সাবভৌম ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে পারে।

জনমত যত শক্তিশালী হোক না কেন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব (Austinian Theory of Sovereignty)

আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রধান বাখ্যাকার হইলেন ইংরেজ আইনবিদ অষ্টিন। তিনি ১৮৩২ সালে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Lectures on Jurisprudenceএ সার্বভৌমিকতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হবস ও বেন্থামের ন্যায় অষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি আইনজ্ঞের দৃষ্টিকোণ হইতেই সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করেন; তাঁহার মতে…"If a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society and the society including the superior is a society political and independent."

অষ্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রে যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাহারও নিকট আনুগত্য স্বীকার না করেন এবং অপর পক্ষে সেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং উক্ত সার্বভৌম সমন্বিত সমাজ একটি স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ"।

অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিল কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :—

১। প্রত্যেক সমাজে একজন উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ থাকিবেন ;

২। সেই উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ কাহারও নিকট আনুগত্য স্বীকার করিবেন না ;

৩। সেই সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির সেই মানবীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি স্বাভাবি আনুগত্য বোধ থাকিবে ;

৪। আইনের ভাষায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশের দায়িত্ব লইবে সার্বভৌম শক্তি ;

৫। আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ বা নির্দেশ ;

৬। সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতা অসীম, চরম ও অবাধ—এই ক্ষমতার কো সীমা নাই।

হেনরি মেন, ক্লার্ক, সিজউইক, পোলক প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ অষ্টিনের সার্ব ভৌম তত্ত্বের বহু সমালোচনা করিয়াছেন।

অষ্টিন সার্বভৌমিকতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আইনগত সার্বভৌমত্বকে প্রকাশ করিয়াছে। তিনি প্রথাগত বিধানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন তাঁহার মতে আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এমন ব সামাজিক রীতিনীতি আছে যাহা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তি অমান্য করিতে সাহস করেন না ; উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংএর কথা উল্লেখ কর যাইতে পারে। তিনি স্বৈরাচারী শাসক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগত বিধানগুলিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

অষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছে তিনি আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ে তাঁহার মতে রাষ্ট্রের মধ্যে যিনি বা যাহারা আইন প্রণয়ণে চরম ক্ষমতা ভোগ করে তাহারাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহার মতে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের বিশেষ কো মূল্য নাই।

অষ্টিনের মতবাদে জনগণের সার্বভৌমিকতাকেও স্বীকার করা হয় নাই। তাঁহা মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। বর্তমান যুগে জনগণের মতামতের যথে মূল্য রহিয়াছে। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশ গ্রহ করার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অষ্টিন গণতান্ত্রিক আদর্শে একেবারে বিশ্বাসী নহেন।

অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার মধ্যে বলপ্রয়োগের ইংগিত পাওয়া যায়। এই কারণে বোসাংকে (Bosanquet) বলেন যে "Austenion theory of Soverengnty is based on the idea of force" কারণ অষ্টিনের মতে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট আইনকে অমান্য করিলে রাষ্ট্র আইনসংগত ভাবেই অমান্যকারীর উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারেন।

অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব বৃটেনের ন্যায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপ

তাই অষ্টিনের মতে বৃটেনের রাজাসহ আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে অষ্টিনের সার্বভৌম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে "The Location of Sovereignty in federal state is an impossible adventure."

প্রথাগত বিধানগুলিকে কখনই সাবভৌম শক্তির আদেশ বলা যায় না। বস্তুতঃ সে সব আইন রাজা ও জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং উভয়েরই পালনীয়। উপরন্তু সেইগুলির উপর কোন ব্যক্তি সংসদ বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নাই। অনুমতি জ্ঞাপন সূচক অনেক আইন আছে যাহাকে আইন বলিয়া কখনই গণ্য করা যায় না।

অষ্টিনের মতবাদ বা একত্ববাদ আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ ও বহুত্ববাদীগণের দ্বারাও বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়ছে। অষ্টিন প্রদত্ত সাবভৌমত্ব আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীগণ দ্বারা এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। বর্তমান যুগে জাতি সংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গেটেলের উক্তি উল্লেখযোগ্য, "The internationlists would shackle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operation of its interior."

অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বের এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া সমাজে যে অন্য কোন আইন থাকিতে পারে তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। প্রচলিত প্রথা, শাসনতান্ত্রিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি সব কিছুই তিনি মানিয়া লইয়াছেন। সাবভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম আইনগত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অধ্যাপক গার্নারের মতে সার্বভৌমিকতার আইনগত ব্যাখ্যা হিসাবে অষ্টিনের মতবাদ সুস্পষ্ট এবং যুক্তিসংগত। অষ্টিনের মতবাদ অনেকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন।

একনায়কগণ শাসনভার গ্রহণ করিা জনগণের প্রবল বিরোধীতা উপেক্ষা করিয়া বলপূর্বক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। সুতরাং দেখা যায় যে আইনতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে বহুত্ববাদ (Pluralistic conception of Sovereignty) :—রাষ্ট্রের চরম ও অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীগণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। বহুত্ববাদীগণের মতে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনই প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের চরম ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর এক প্রকার মতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী নয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং একের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তে বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী বলিয়া এই মতবাদকে বহুত্ববাদ বলা হয়।

সার্বভৌম ক্ষমতাই আইনের একমাত্র উৎস—এই মতবাদের তীব্র সমালোচক হইলেন বহুত্ববাদীগণ। ডুগুই, ক্র্যাবে প্রমুখ আইনবিদগণ মনে করেন যে সামাজিক প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই আইন সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা কথনই আইনের উৎস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অস্টিনের মতবাদ ও একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বর্তমানযুগে বহুত্ববাদের উদ্ভব হইয়াছে। বহুত্ববাদের মতে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নয়। সুতরা সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ফলে কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইতেছে না। ওয়ার্ডের (Ward) মতে "There is appoplexy at the Centre and anaemiea at the extremites." মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। তাই মানবসমাজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশের জন্যই সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। বহুত্ববাদিগণের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নিছক কুসংস্কার ও কল্পনা প্রসূত মতবাদ এবং এই মতবাদ যতশীঘ্র পরিত্যাগ করা যায় ততই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে মঙ্গল ; রাষ্ট্র মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি সাধনের জন্য বহু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের মূলে কুঠারঘাত করা অপরিহার্য।

বহুত্ববাদের সমর্থক হিসাবে কোকার, ফিগিস, মেটলাণ্ড, বার্কার, ম্যাকাইভার, লাস্কি প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোকারের মতে সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন তেমনি বিশেষ বিশেষ

স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত। ফিগিস বলেন যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্টি হয় নাই। প্রত্যেকটি সংঘ ও প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা থাকা কখনই উচিত নয়। ম্যাকাইভার বলেন যে "The state is one among many associations, so the sovereignty should be divided among different groups and associations" রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান, সুতরাং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের একটি নির্দিষ্ট পরিধি ও সীমারেখা আছে। সমাজের অন্যান্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। লাস্কির মতে রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। তাই তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পূর্ণ অসহায় ও ভিত্তিহীন। এই মতবাদ অনুযায়ী বলা যায় যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। এই প্রসংগে ওয়ার্ডের (Ward) উক্তি উল্লেখযোগ্য "The state may be compared to a gouty old gentleman who promises good many things to his relatives and attendants but does not and cannot fulfil any fraction of it, so the state should be declared mentally incompetent and put away."

বহুত্ববাদীগণ অস্টিনের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের প্রয়োজনেই ধর্মীয় সংঘ, সামাজিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও রাষ্ট্রের ন্যায় আনুগত্য লাভের অধিকারী। ল্যাস্কি (Laski) বলেন যে রাষ্ট্র চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না, ইহা কেবল অন্যান্য সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংঘের মধ্যে সমন্বয় আনিবে। মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাই। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের এমন অনেক দিক আছে যেগুলির উপর রাষ্ট্রের প্রভাব একেবারেই নাই। বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চায় না, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সংঘগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার পক্ষপাতী। বহুত্ববাদিগণের মধ্যে দুইটি মত আছে, একপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন সংঘের মধ্যে একটি সংঘ মাত্র, আবার অপরপক্ষের মতে সমক্ষমতাসম্পন্ন সংঘের মধ্যে রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংঘ। রাষ্ট্রের সর্বাভৌম ক্ষমতা অসীম ও অবিভাজ্য নয়।

বহুত্ববাদিগণ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ বাহ্যিক দিক হইতেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলে বিশ্বশান্তি যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, বিংশশতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ বলেন যে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিংশশতাব্দীতে জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গেটেলের (Gettell) উক্তি উল্লেখযোগ্য, The internationalists would shackle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operation of its interior.

রাষ্ট্রের চরম ও স্বৈর ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহুত্ববাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। গেটেল (Gettell) বলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য সংঘগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা বহুত্ববাদের ফলেই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা খুবই সত্য যে রাষ্ট্র ও সংঘ কখনোই এক হইতে পারে না। বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অবিভাজ্য এই মত কখনোই সমর্থন করা যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্র ও সংঘগুলির মধ্যে বিভক্তও করা যায় না। কলহাউনের (Colhoun) মতে "Sovereignty is an entire thing, to divide it is to distroy it'" রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন সংঘকে থাকিতে দিতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সংঘগুলির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বিরোধের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রের শক্তির অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রয়োজন। রাষ্ট্র অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে সংঘগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্র ও প্রত্যেক সংঘকে সমান মর্যাদা দেওয়া হইলে যেসকল রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সেই সকল রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন নয়। ক্ষমতাবণ্টন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা কখনও বণ্টন হয় না। রাষ্ট্রের উপর চরম ক্ষমতা অর্পিত না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে এবং এই কারণে প্রত্যক্ষ সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ব থাকা উচিত। রাষ্ট্রের উচিত জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখিয়া সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যতদূর সম্ভব আইনগত স্বাধীনতা প্রদান করা। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লক্ষণই হইল উহার সার্বভৌমত্ব—সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আবার

াষ্ট্র না থাকিলে সার্বভৌমত্ব থাকে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত সমস্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

বহুত্ববাদের মূল্য ও গুরুত্ব আংশিক ভাবে সত্য। বহুত্ববাদের অবদান হইল াষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করা। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লোপ করিতে পারে নাই। তবে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সত্য বহুত্ববাদীরাও স্বীকার করিয়াছে। ল্যাস্কির মতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইল বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। যদি রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী না হয় তবে রাষ্ট্র সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। তাই বহুত্ববাদের মূল্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

॥ Law and Liberty ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Definition and Nature of Law—Different kinds of Law—Sources of Law—Distinction between Law and Morality—Relation between Law and Liberty—the concept of Liberty—Safeguards of Liberty in a modern state—Concept of Natural Law and Natural Right.—International Law.

বিষয়বস্তু ঃ আইনের সংজ্ঞা—আইনের প্রকৃতি—আইনের শ্রেণীবিভাগ—আইনের উৎস—আইন ও স্বাধীনতা—স্বাধীনতার রূপ—আইন ও নীতি—স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার—আন্তর্জাতিক আইন।

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law) : রাষ্ট্রের নিয়মকানুনকে আইন বলা হয়। রাষ্ট্র সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বলিয়া লোকে রাষ্ট্রের নিয়মকে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। যদি কেহ রাষ্ট্রের নিয়ম অর্থাৎ আইন ভংগ করে তাহা হইলে রাষ্ট্র আইন ভংগকারীকে শাস্তি দিয়া আইনের মর্যাদা রক্ষা করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে বলিয়া তাহার পক্ষে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলা প্রয়োজন ; তাহা না হইলে সভ্য এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ব্যক্তি জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সকল নিয়ম বলবৎ করা রাষ্ট্রের কাজ।

অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন "সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হইল আইন।" (A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority.") হল্যাণ্ডের সংজ্ঞা হইতে আইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় : প্রথমতঃ, আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে—ইহা মানুষের মানসিক চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি চুরি করে তবেই তাহার বিরুদ্ধে আইন ভংগের অভিযোগ আনা যাইবে কিন্তু সে যদি চুরি করিবে বলিয়া মনে মনে চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনের কিছু

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বণীয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র আইনকে বলবৎ করে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার ধিকারী বলিয়া উহা আইন ভংগকারীকে শাস্তি দিয়া থাকে।

অধ্যাপক উইলসন (Wilson) আইনের এক ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: াইন হইল প্রতিষ্ঠিত আচরণ এবং চিন্তাধারার সেই অংশ যাহা সাধারণ নিয়মাবলীতে বিণত হইয়া সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং যাহার পিছনে রকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে। অস্টিন (Austin) আইনের অপেক্ষাকৃত কীর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন; তাঁহার মতে আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ (Law , the command of the sovereign.)

আইনের উৎস (Sources of Law): বর্তমানকালে আইনসভাই ইল আইনের উৎস। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই আইনের একমাত্র উৎস নয়।

ৃটি উৎস

অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে আইনের উৎস হইল ছয়টি—প্রথা, ধর্ম, বিচারকের রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায়বোধ (equity) ং আইনসভা। ইহাদের পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

[এক] **প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতি (Customs):** মানবেতিহাসের থম যুগে প্রচলিত রীতিনীতিই ছিল আইনের প্রধান উৎস। বহুদিন ধরিয়া য সকল রীতিনীতি সমাজে প্রচলিত ছিল তাহারাই মানুষের সামাজিক জীবনকে নয়ন্ত্রণ করিত। প্রাচীনযুগে সামাজিক রীতিনীতি দ্বারাই বিবাদ এবং বিরোধের চার ও মীমাংসা করা হইত। কিভাবে, কখন এবং কাহার দ্বারা আচারব্যবহারগুলি দ্ভাবিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। ধর্মের অনুশাসনের জন্যই হউক অথবা হাদের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াই হউক মানুষ ইহাদিগকে মান্য করিয়া চলিত। র্তমান যুগে প্রথাকে ভিত্তি করিয়া বহু আইনের ইমারৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের াসনব্যবস্থায় প্রথাগত আইনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে।

[দুই] **ধর্ম (Religion):** আদিমযুগে ধর্মের অনুশাসন ব্যক্তির ার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিত। সেই যুগে ধর্ম এবং আইন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। যে যুগে লোকে পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত ছিল সেই সময় পুরোহিত নির্দেশিত বিধিসমূহকে আইনের মর্যাদা দিতে সমাজ ইতঃস্তত করে নাই। উইলসন বলেন যে প্রাচীন রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ প্রভৃতি ধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

[তিন] **বিচারকের রায়** (**Judicial Decision or 'Adjudication**) বিচারকের রায় হইতে অনেক আইনের উদ্ভব হয়। আইনের কোন অর্থ যদি অস্প অথবা দ্ব্যর্থক হয় তখন বিচারক উহার যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। বিচারকগ আইনের যে সব ব্যাখ্যা দেন তাহার দ্বারা প্রচলিত আইন পরিবর্তিত হইয়া নূত আইনের সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত মার্কিন বিচারপতি হোম্‌স (Holmes) বলিয়াছিলে যে বিচারকেরা আইন সৃষ্টি করেন এবং অবশ্যই করিবেন (Judges do an must legislate).

[চার] **বৈজ্ঞানিক আলোচনা** (**Scientific Commentaries**) আইনজ্ঞ লেখকেরা আইনের যে টীকা বা ভাষ্য দান করেন তাহাও আইনের উৎ হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশের বিচারকগণ পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা অি শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। আইনের কোন ধারায় অস্পষ্টতা থাকিলে ব উহা দ্ব্যর্থক হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আলোচনা উহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শাইয়া দেয় মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, কৌটিল্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আলোচনা হিন্দু আই ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কোরাণের বয়েৎকে ভি করিয়া হাদিজ নামে পরিচিত যে সকল গ্রন্থ রহিয়াছে তাহা মুসলমান আইন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে। ইংলণ্ডে কোক (Coke) এবং ব্ল্যাকস্টো (Blackstone) বৃটিশ আইনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছেন।

[পাঁচ] **ন্যায়বোধ** (**Equity**): প্রচলিত আইনের সাহায্যে যখ কোন বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না তখন বিচারকগণ তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি এব ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করিয়া উহার মীমাংসা করেন। এই সকল নীতিগুলি পরবর্তীকালে বিচারকেরা অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং এইভাবে আইনের সৃষ্টি হয়। বহু পুরাতন আইন অনেক সময় সামাজিক ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কবিহী হইয়া পড়িতে পারে। আইনের কোন অংশ সামাজিক ন্যায়বোধের সহিত সংগতিহীন হইয়া পড়িল বিচারক ন্যায়বোধের ভিত্তিতে বিচার করিয়া মূল আইনে উদ্দেশ্য বজায় রাখিতে পারেন।

[ছয়] **অর্ডিন্যান্স** (**Ordinance**): জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে সরকা আইনসভার অনুমোদন না লইয়াই সাময়িক আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। এই সকল অর্ডিন্যান্স সাময়িকভাবে আইনরূপে গৃহীত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই উহা হইতে নূতন আইনের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের বোনাস অর্ডিন্যান্স ও পরবর্তী সময়ে বোনাস আইনের উল্লেখ করা যায়।

সাত] **আইনসভা** (**Legislature**): বর্তমানকালে সকল গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভাই আইন সৃষ্টির সর্বপ্রধান উৎস। জনমতই আইনের একমাত্র উৎস, এবং আইনসভাই জনমতকে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আইনের রূপ দেয়। বর্তমানকালে আইনের অন্যান্য উৎসগুলি ক্রমশই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য নূতন আইন প্রণয়নের সময় প্রচলিত রীতিনীতি, ধর্মের অনুশাসন এবং ন্যায়বোধ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিলেও আইনের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে ক্রমশই ইহারা অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে।

আইন ও নীতি (**Law and Morality**): প্রাচীনযুগে আইন ও নীতি পরস্পরের সহিত বিজড়িত ছিল ও উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নীতিবোধই আইনের মতো সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। যাহা কিছু নীতিবিরুদ্ধ তাহাই বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইত। বর্তমানকালেও নৈতিকবোধ আইনের অন্যতম প্রধান উৎস বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য রাষ্ট্র বিবর্তনের পরবর্তী যুগে আইন এবং নীতিবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

প্রথমতঃ, নীতিশাস্ত্রের তুলনায় আইনের পরিধি সংকীর্ণ। আইনের উদ্দেশ্য হইল সামাজিক মঙ্গল বিধান করা আর সেই উদ্দেশ্যে ইহা মানুষের বাহ্যিক আচরণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরপক্ষে, নীতিশাস্ত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণ এবং মনের চিন্তা অর্থাৎ সমগ্র মানবজীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে। যদি শ্যাম কোন ব্যক্তিকে খুন করে তবেই আইন তাহার শাস্তি বিধান করিবে। কিন্তু শ্যাম যদি মনে মনে কোন ব্যক্তিকে খুন করিবার কথা চিন্তা করে তাহা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ না হইলেও উহা পাপ বা নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরিধি

দ্বিতীয়তঃ, আইনের পশ্চাতে রহিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং সমর্থন। আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নীতির পশ্চাতে রাষ্ট্রের কোন সমর্থন নাই অর্থাৎ নৈতিক বিধান ভংগ করিলে রাষ্ট্র কোন শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে না। নীতি ভংগকারীকে শুধুমাত্র লোকনিন্দা এবং বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয়, রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ দৈহিক শাস্তি পাইতে হয় না। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানের; ইহা একটি পবিত্র নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু যদি কেহ এই নৈতিক কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাহা হইলে সে সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হইলেও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

তৃতীয়তঃ, নীতির তুলনায় আইন অধিকতর নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। আইন সৃষ্টি করিবার এবং ব্যাখ্যা করিবার জন্য আইনসভা ও বিচারবিভাগ রহিয়াছে কিন্তু নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা করিবার মতো সর্বজনস্বীকৃত এরূপ কোন সংস্থা নাই।

নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট

চতুর্থতঃ, নীতিবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। এমন কি এক ব্যক্তি যাহাকে দুর্নীতি-মূলক বলিয়া মনে করে অপরের নিকট তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথার পিছনে ধর্মীয় অনুশাসন তথা নৈতিক বিধির সমর্থন ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষের নীতিবোধ পরিবর্তিত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। নীতি যেমন আইনকে প্রভাবিত করিতে পারে, আইনও সেইরূপ নীতিকে প্রভাবিত করিতে পারে। হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইবার পর বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে জনগণের নৈতিক ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে।

আপেক্ষিক

পঞ্চমতঃ, সকল বে-আইনী কাজই নীতিবিরুদ্ধ নয়। রাস্তার ডান দিক দিয়া গাড়ী চালনা করা বে-আইনী কিন্তু উহা নীতিবিরুদ্ধ বলা চলে না। বৃটিশ যুগে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক লবণ আইন ভংগ বেআইনী কাজ হইয়াছিল কিন্তু ইহার পিছনে নৈতিক সমর্থন থাকায় তিনি ভারতবাসীর সহযোগিতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ট্রাম-বাস বা প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান করা বেআইনী কিন্তু ইহারা দুর্নীতিমূলক একথা বলা চলে না।

বেআইনী কাজ সর্বদা নীতিবিরোধী নয়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)ঃ আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতা বলিতে নিজের অধীনতা বুঝায়। নিজের খেয়াল-খুশীমত কাজ করিবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলা যায় না। 'স্বাধীনতা' শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বোধ হয় আর কোন শব্দ অতো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এনার্কিষ্ট লেখকদের ধারণা যে, রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বেই প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া ইহারা রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার পক্ষপাতী। অপরপক্ষে আদর্শবাদী জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) রাষ্ট্রের সকল আইনকেই স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া মনে করেন। এই দুইটিই চরম মতবাদ এবং আধুনিক লেখকেরা মধ্যপন্থাই সমর্থন করেন।

নিজেদের ইচ্ছামত কাজকর্ম বা চলাফেরা করাকে স্বাধীনতা বলে না। নিজের খুসিমত কাজ করাকে উচ্ছৃঙ্খলতা (licence) বলে। স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচার এক

নয়। অপরের ক্ষতি না করিয়া কোন কিছু করিবার অধিকারকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। আইন স্বাধীনতাকে খর্ব না করিয়া বরং উহাকে বজায় রাখিতেই সহায়তা করে। প্রত্যেকেই যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পরে তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং আইন। আইন অস্ত্যর্থক (Positive) এবং নেতিমূলক (Negative) পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি সমাজবিরোধী কাজ করে রাষ্ট্র তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করে। আইন দ্বারা জনগণের অধিকার সুরক্ষিত থাকে বলিয়া আইনকে স্বাধীনতার সর্ত বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগী হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কারখানা ও নিরাপত্তামূলক আইনের (Social Security Legislation) ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সর্ত, বৃদ্ধ এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই ধরনের আইন পাশ করিয়া রাষ্ট্র কয়েকজন মালিকের ইচ্ছামত কাজ করিবার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ মজুর মালিকের শোষণ হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা

আইন স্বাধীনতা খর্ব না করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করে। আইন মানুষের আচরণে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করিলেও পরিণামে সমাজের সকল ব্যক্তিই সমান স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। অধ্যাপক হবহাউস (Hobhouse) একটি উপমার সাহায্যে বলিয়াছেন যে, বাগানে মালি কাঁচি দিয়া গাছের ডালপালা ছাটিয়া দিলে সাময়িকভাবে উহার বৃদ্ধি ব্যাহত হইলেও পরিণামে উহা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। আইন না থাকিলে যে স্বাধীনতা তাহা কয়েকজন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোকই ভোগ করিতে পারিত, বাকী লোক উহা হইতে বঞ্চিত থাকিত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন রচনা করেন। সুতরাং দেশের জনমত অনুসারে আইন প্রণীত হয় বলিয়া আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু রাজতন্ত্রে বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একনায়কের অথবা রাজার ইচ্ছাই আইন। এই ধরনের রাষ্ট্রের আইনে জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না বলিলেই চলে। এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে।

মৌলিক অধিকার

আইন ব্যবস্থায় এরূপ কতকগুলি আইন আছে যাহাদের মৌলিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ধরনের মৌলিক আইন থাকার দরুন কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার আশংকা দূর হইয়াছে; এই শ্রেণীর আইন না থাকিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িত।

অবশ্য আইন দ্বারা কখন কখন স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টাকরা ও যাইতে পারে। ইহাদিগকে বে-আইনী আইন (Lawless Law) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইংরেজ আমলে ভারতে বহু আইন ছিল যাহারা স্পষ্টতঃই স্বাধীনতার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ ভার্ণাকুলার প্রেস এক্ট-এর কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই ধরনের আইনের পিছনে কোনরূপ জনসমর্থন ছিল না, শুধুমাত্র দমননীতির অনুসরণে ইহাদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অবশ্য জনসমর্থিত আইনের সহিত স্বাধীনতার কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না।

মানবজীবনের এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত দিক আছে যাহাদের আইনের বাহিরে রাখাই বাঞ্ছনীয় ; এরূপক্ষেত্রে আইনের অনুপ্রবেশ ঘটিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হইবে। ব্যক্তির বিবাহ, পারিবারিক জীবন গঠনের প্রকৃতি, ধর্ম প্রভৃতিকে আইনের ঊর্ধে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং বলা যায় যে আইন ব্যতিরেকে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

রিচির (Ritchie) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : স্বাধীনতা বলিতে আত্মবিকাশের সুযোগ বুঝায়, উহা আইনের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। সমাজের সাধারণ মঙ্গলের জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যদি সমাজ মনে করে যে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থে আইন বলবৎ করা হইয়াছে তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দিবে, এমন কি বিপ্লব পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। আইনের প্রতি আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইলে তবেই আইনের সহিত স্বাধীনতার মিলন ঘটিবে। তাই রুশো বলিয়াছেন, যে আইন নিজের জন্য নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আনুগত্যই হইল স্বাধীনতা ("Obedience to a law which we prescribe to ourselves is liberty") ; ল্যাস্কির মন্তব্যেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়— আইন কেবলমাত্র আদেশ নয়, ইহা একটি আবেদনও বটে ("Law is not merely a command ; it is also an appeal").

স্বাধীনতা—সংজ্ঞা ও রূপ (Liberty : its Definition and Forms) : ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় স্ব অর্থাৎ নিজের অধীনতা। সাধারণ লোক স্বাধীনতা বলিতে নিজের খেয়াল খুশীমত চলিবার অবাধ অধিকারকেই বুঝিয়া থাকে। নিজের খেয়াল খুসীমত কাজ করা বা চলাফেরাকে স্বাধীনতা বলে না— উহা উচ্ছৃঙ্খলতা। অপরের কোন ক্ষতি না করিয়া ব্যক্তির কোন কিছু করিবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে। 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে মানুষের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত

হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আর কোন শব্দ বোধহয় এতো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই এবং মানুষের মনকে ইহা যত গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে আর কোন ধারণা তাহা করে নাই। ব্যক্তির মতো সমাজজীবনেও স্বাধীনতা চরম কামনার ধন। স্বাধীনতা হীনতায় কেহ বাঁচিতে চায় না, পরাধীন জীবন গ্লানিকর এবং দুর্বিসহ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় 'Life is unbearable without Swaraj.'

স্বাধীনতা বলিতে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে বলিয়া একের আচরণ যাহাতে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হয়। এক ব্যক্তির অবাধ অধিকার অপরের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে; সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে অবাধ অধিকার বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না। ল্যাস্কি বলেন "যে সকল সামাজিক অধিকার না থাকিলে সভ্যসমাজে ব্যক্তি তাহার সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ সাধন করিতে পারে না, সেই সকল অধিকার হইতে নিয়ন্ত্রণের অপসারণকেই স্বাধীনতা বলে"।

সংজ্ঞা

স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিল প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীর অধিবাসীগণ। এথেন্সীয় স্বাধীনতার ধারণাই বিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। এথেন্সের অধিবাসীগণ স্বাধীনতার আদর্শের স্রষ্টা হইলেও ক্রীতদাস প্রথাকে তাহারা স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের কথা চিন্তা করে নাই এবং অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিতে দ্বিধা করে নাই।

অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতাকে একটি পরিবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বাধীনতা এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ করিবার সুযোগ পায়। (By liberty I mean eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves).

স্বাধীনতা একটি পরিবেশ

কদর্যতার অভাবই যেমন সৌন্দর্য নয় সেইরূপ নিয়ন্ত্রণের অভাবকেই স্বাধীনতা বলে না। স্বাধীনতার একটা অস্ত্যর্থক (positive) রূপও আছে। স্বাধীনতা এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করিবে যাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব এবং ইহাদের উপর হইতে বাধানিষেধের অপসারণ।

স্বাধীনতার রূপ (Forms of Liberty): বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী হইতে স্বাধীনতাকে আলোচনা করা হয় বলিয়া ইহাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

[এক] **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty): প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ধারণার স্রষ্টা হইলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো। রাষ্ট্র গঠন করিবার পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহাকেই রুশো প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিয়াছেন। রুশো তাঁহার Le Contrat Social গ্রন্থে বলিলেন, মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আজ সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত (Man was born free, but he is everywhere in chains). বাকুনিন (Bakunin) প্রভৃতি এনার্কিষ্ট লেখকদের মতেও রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বেই প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল; রাষ্ট্রীয় জীবন স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া ইহারা রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীনতা থাকিতে পাবে না বলিযা প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[দুই] **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা** (Personal Liberty): প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কামনা করে। নিজের পরিকল্পনা এবং ধ্যানধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষই তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে চায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, রুচি, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, অবাধে কারবার করিবার অধিকার প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। নাগরিকের এই সকল বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইলে বহু আইনমান্যকারী নাগরিকও ইহাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বিবেচনা করিয়া এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং আধুনিক কালে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ব্যক্তি স্বাধীনতার বিখ্যাত সমর্থক।

[তিন] **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty): জাতীয় স্বাধীনতা দেশের সর্বপ্রকার উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। যে দেশ অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীন নয় সেই দেশ জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। পরাধীন দেশের অধিবাসীগণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না, ফলে ওই পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশ হয় না। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত পরশাসনের অধীন থাকায় তাহার জাতীয় স্বাধীনতা ছিল না। পরশাসনের অবসান হইলে ভারত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে।

[চার] **সামাজিক স্বাধীনতা** (Civil Liberty): সামাজিক স্বাধীনতা হইল সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং তাহার কাজে কোনরূপ বাহিরের হস্তক্ষেপ থাকিবে না। সামাজিক অধিকার ভোগ করিয়াই সামাজিক স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চক্ষে সমতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চুক্তি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি সামাজিক স্বাধীনতার উদাহরণ।

[পাঁচ] **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty): রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার মারফৎ ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার, সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law): আইন হইল রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি সামাজিক নিয়মকানুন যাহা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা অনুমোদন লাভ করিয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা আইনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আইন আলোচনা দ্বারা যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক জানিতে পারা যায়। উইলসনের মতে আইন সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি এবং সক্রিয় শক্তি (Law is both a mirror of conception and an active force). আইন সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং আইন লংঘন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাস্তি পাইতে হয়। সামাজিক আইন লংঘন করিলে শাস্তি পাইতে হয় না কিন্তু রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হয়। সুতরাং আইনের শারীরিক বাধ্যতা এবং নৈতিক বাধ্যতা আছে। আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে আইন রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা প্রযুক্ত এবং রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমর্থিত। আইন অমান্য করিয়া মানুষ যখন অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তখনই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং আইন হইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলব্ধ ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বজনীন নিয়ম।

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কতকগুলি নিয়মকানুন যাহা জনসাধারণের সম্মতির দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ল্যাস্কির মতে আইন কার্যকরী চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া থাকে (Legal imperatives, are a function of effective demand.)। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আইন অমান্যকারীর উপর রাষ্ট্র আইনসংগতভাবেই বলপ্রয়োগ করিতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জনসাধারণের সম্মতিকে আইনের প্রকৃত শক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের জন্য আইন অপরিহার্য।

আইনকে সার্বভৌম শক্তির সুসংহত প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। কেহ কেহ আইনকে রুশোর "সাধারণ ইচ্ছার" (General Will) অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। গ্রীণ বলিয়াছেন সার্বভৌমত্ব চরম ক্ষমতা সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা তখনই সত্যকার চরম ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয় যখন ইহা সাধারণের ইচ্ছার দ্বারা সমর্থিত হয় (Sovereignty is supreme power, but it is only supreme power when supported by the general will). আইন জনমতকে প্রকাশ করে বলিয়া উহা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law): আইন বিভিন্নপ্রকার হইতে পারে। আইনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমরা আইনকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ—ব্যক্তিগত আইন, সরকারী আইন, সংবিধান সংক্রান্ত আইন, সাধারণ আইন, শাসনসংক্রান্ত আইন পৌর বা রাষ্ট্রীয় আইন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি।

নাগরিকদের প্রত্যেকের জন্য যে সকল অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং যেসকল অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাই হইল ব্যক্তিগত আইন। অপরপক্ষে সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার ও সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। দেশের শাসন সম্পর্কিত সরকারের কার্যাবলী, বিভিন্ন রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক এবং নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে যেসকল আইনকানুন বলবৎ থাকে, তাহা হইল সাংবিধানিক আইন। সাংবিধানিক আইনকে দেশের চরম আইন বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাংবিধানিক আইনকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। রীতিনীতি, প্রথা, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি হইল সাধারণ আইনের উৎস। আইনপরিষদ রচিত আইনের ন্যায় সাধারণ আইনগুলিও আদালত বলবৎ করিয়া থাকে। যেসকল আইন সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ সংক্রান্ত বিচারের ব্যবস্থা করে তাহাদের আমরা শাসনসংক্রান্ত আইন বলিতে পারি। রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক যে আইন কার্যকরী হইয়া থাকে তাহাকে রাষ্ট্রীয় আইন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে তাহাকে আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন বলিয়া থাকি। রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট এবং নাগরিকদের উপর প্রযুক্ত হয়। অপরপক্ষে সভ্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যেসকল আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তাহাই হইল আন্তর্জাতিক আইন। রাষ্ট্রীয় আইন যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আন্তর্জাতিক আইন সেইরূপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ

ব্যক্তিগত আইন	সরকারী আইন	সাধারণ আইন	সংবিধান সংক্রান্ত আইন	শাসনতান্ত্রিক আইন	জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আইন	আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইন (International Law): প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে যে নিয়মকানুন পালন করে তাহাই হইল আন্তর্জাতিক আইন। লরেন্স (T. J. Lawrence) আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলেন, যে সকল নিয়ম কানুন দ্বারা সুসভ্য রাষ্টসমূহের পারস্পরিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাদের আন্তর্জাতিক আইন বলে (The rules which determine the conduct of the general body of civilised states in their mutual dealings). ওপেনহিমের ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইল সেই সকল আইনকানুন ও চুক্তির সমষ্টি সভ্য রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাহাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে (International law is the name for the body of customery and treaty rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other). বর্তমান যুগে বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের যোগসূত্র এবং আদানপ্রদান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক আইনের উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধ ও শান্তির সময় রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

আন্তর্জাতিক আইনকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law) এবং সরকারী আন্তজাতিক আইন (Public International Law); ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে। সরকারী আন্তর্জাতিক আইন আবার তিন ধরনের হইতে পারে—শান্তিকালীন আইন (Laws of Peace), যুদ্ধকালীন আইন (Laws of War) এবং নিরপেক্ষতা আইন (Laws of Neutrality).

আইনবিদ্ অস্টিন (Austin) আইনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তদনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায় না। রাষ্ট্র যে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন গ্রহণ করিতে সম্মত আছে ততদূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর International Law is valid for a given state to the degree that it is

prepared to accept its substance). 'যে আইন সাধারণভাবে প্রতিপালিত হয় না তাহাকে আইন বলা যায় না। আইনের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিলে আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করার জন্য উর্ধতন সার্বভৌম শক্তির কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। আন্তর্জাতিক আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি প্রদান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই কারণেই অস্টিন (Austin) বলিয়াছেন যে "International Law is the orphan child of jurisprudence", এবং অধ্যাপক হল্যাণ্ডের (Holland) মতে "International Law is the vanishing point of jurisprudence. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন হইল বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান। আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন নয়, কারণ ইহা কোন নির্দিষ্ট মানবীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত হয় না। কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। সুতরাং যে আইন অমান্যের পশ্চাতে কোন শাস্তির ভয় নাই সে আইনকে আইন বলা যায় না। এই কারণেই অনেকে আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা পুরোপুরি দিতে চাহেন না। আন্তর্জাতিক আইনকে জনমত অথবা আন্তর্জাতিক প্রথাগত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আন্তর্জাতিক আইনকে নীতি ও আইনের সংমিশ্রণ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আইনের দিক হইতে বিচার করিলে আন্তর্জাতিক আইন নিষ্প্রাণ এবং ইহা কখনোই রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

আন্তর্জাতিক আইন যে প্রকৃত আইনের মর্যাদা পাইতে পারে এ সম্পর্কে হেনরি মেন, স্যাভিগনি (Savigny) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালিত হয়; আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হয় বলিয়া ইহা আইনের মর্যাদা পাইবে না ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণ রাষ্ট্রীয় আইনও ভঙ্গ হয়; তৃতীয়তঃ, আইনের ভিত্তি হইল জনগণের সম্মতি; আন্তর্জাতিক আইনের সমর্থনে এক সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক জনমত (international public opinion) গড়িয়া উঠিতেছে।

হল (Hall) ওপেনহাম (Oppenheim), পোলোক (Pollock) প্রভৃতি আইনবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্রীয় আইনকে পরিচালিত করে না। জনমতের ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় আইন জনমতের সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনও বলবৎ করিবার পশ্চাতে জনমতের সম্মতি বিশেষ

ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান যুগে বিশেষতঃ বিংশশতাব্দীতে জাতিসংঘ (League of Nations) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O) প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে আন্তর্জাতিক আইন জাতীয় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই কারণেই বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার স্বার্থে বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। আন্তর্জাতিক আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়, এবং এই কারণেই বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষভাবে এই আইন অমান্য করিতে সাহসী হয় না। যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই আইনভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়, অভিযুক্ত রাষ্ট্র সেই দোষস্খালনের চেষ্টা করে। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে আন্তজাতিক আইন জাতীয় আইনের মর্যাদা লাভের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আন্তর্জাতিক আইনের উন্নযন ও পরিস্ফুটনের ফলে রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আন্তর্জাতিক জনমতের প্রভাব যতই সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় হইবে ততই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আন্তজাতিক আইনের বিধিনিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই সম্পর্কের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। বর্তমানে জাতিপুঞ্জের অন্যতম কার্য হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পালিত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা। বাস্তবক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন এখনও জাতীয় আইনের মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচিত রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় আন্তজাতিক আইনকে মান্য করিয়া চলা। আন্তর্জাতিক বিচারালয় এই আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তিপ্রদান করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া এই আইনকে আইনের মর্যাদাদান অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই আইন অস্টিন (Austin) এবং হল্যাণ্ডের (Holland) সংজ্ঞা অনুযায়ী আইন বলিয়া পরিগণিত না হইলেও মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণমূলক উন্নতি ও প্রগতির জন্য বিশিষ্ট মর্যাদা পাইবার অধিকারী। কিটনের (Keeton উক্তি উল্লেখযোগ্য, "International Law may not be law according to the Austinian norm; but it would surely be law according to many modern definitions which are derived from a functional or sociological

approach to Law." উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে বর্তমানে আন্তর্জাতি আইন নৈতিক নিয়ম এবং প্রকৃত আইনের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আ((International law is an uneasy stage between Morality and La proper, Lloyd).

স্বাভাবিক আইন (**Natural Law**) **:** স্বাভাবিক আইনসম্বন্ধে ধারণা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এ্যারিস্টটলের (Aristotle) মতে আই দুইপ্রকার, বিশেষ আইন ও সার্বজনীন আইন। তিনি সার্বজনীন আইনকেই স্বাভা আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আইনের মূল বক্তব্য হইল যে প্রকৃতিই হই সকল আইনের উৎস। মানুষের বিচারবুদ্ধি এই প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল বিশ্বে এই প্রাকৃতিক আইনকে নাগরিকের প্রয়োজনে বল করা। এ্যারিস্টটলের পর জেনো (Zeno) এবং স্টোইকগণ (Stoic) স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আইনের স্বরূপ আলোচনা করেন। স্বাভাবিক আইন রোমান আই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়; স্টোইকগণের মতে সকল মানুষই সমান। স্বাভাবিক আই সকল মানুষের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাভাবিক আইন হইল ঈশ্বরের স্বর ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় ধারণা। স্বাভাবিক আইনের বৈশিষ্ট্য হইল সমগ্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। এই স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনে মর্যাদা লাভ করিয়া নির্দিষ্ট আইনের প্রতিযোগী হয়। প্রাচীন রোমের নাগরিকগ জীবনযাত্রা যে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহাকে Jus civile বলা হইত। রো Jus Gentium আইন ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফ অনেক বিদেশী রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের অধীনে আসিয়া পড়ে। তখন এ Jus Gentium আইন গড়িয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইহা হইতেই সৃষ্ট হই Jus Naturale। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি হইল Jus Naturale আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম লেখক গ্রসিয়াস (Grotius) স্বাভাবিক আইনে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বর্তমানে স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্বকে অনেকেই অস্বীকার করেন। এই আই কোন নির্দিষ্ট অর্থে কোনদিনই ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাভাবি আইন বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদ ব্যতীত কোন আইন হইতে পারে না। স্বাভাবিক আইনসম্বন্ধে ধারণা আদর্শবা লেখকের কল্পনামাত্র। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। মানুষের নীতি ধারণা নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে। সেই কারণে স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে মানুষে ধারণাও পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্রীয় আইন অমান্যকারীকে যেমন শাস্তি দেওয়া যায় স্বাভা

াইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে সেইরূপ শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিক াইন সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। যখনই নির্দিষ্ট াইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে তখনই নির্দিষ্ট আইন কার্যকরী ই।াছে।

স্বাভাবিক আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা ন্যায়বিচাব ও বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করিযাই আইন সৃষ্ট হওয়া চত, ইহা স্বাভাবিক আইনবিদগণ স্বীকার করিযাছেন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় য স্বাভাবিক আইনের অন্যতম ভূমিকা হইল আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি।

স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right) : গ্রীক দার্শনিকগণ এবং সামাজিক ক্তি মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকালে কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে সমাজসৃষ্টিব পূর্বে ছিল প্রকৃতির রাজত্ব। এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। মানুষের নিজেব ইচ্ছাকে অপবেব ইচ্ছার উপর প্রয়োগ করিবার স্বাভাবিক অধিকাব রহিয়াছে। স্বাভাবিক অধিকারের প্রকৃত তাৎপর্য হইল যে মানুষের এমন কতকগুলি অধিকার আছে যাহা লইয়াই মানুষ জন্মায এবং কোন প্রকারেই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয না। স্বাভাবিক অধিকারগুলি সহজাত, অবাধ ও চিরন্তন। জীবনধাবণেব অধিকাব, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজ করিত। হব্স্ (Hobbes) লক্, (Locke) ও রুশোর (Rousseau) মতে স্বাভাবিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে; ইহারা প্রকৃতির রাজত্বে বিরাজ করিত।

বেন্থাম (Bentham) হার্বার্ট স্পেন্সার (Spencer), গ্রীন (Green), ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিকগণের মতে স্বাভাবিক অধিকারের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। বেনথাম (Bentham) মনে করেন যে মানুষের অধিকারগুলি সৃষ্ট হইয়াছে রাষ্ট্রগঠনের পরে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এই অধিকারগুলি রক্ষা করা সম্ভব। রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষের অধিকার সৃষ্ট হয় নাই, এবং স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। স্পেন্সারের (Spencer) মতে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের অধিকার। ভলটেয়ার (Voltaire) মনে করেন যে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ, আইনের সমান সুযোগ লাভ করা প্রভৃতি হইল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। মানুষ মাত্রেই কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকারের অধিকারী। এই মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় এবং ফরাসী বিপ্লবে মানুষের অধিকারকে আরও অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইবার

পর এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও স্বাভাবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং এই অক্ষুণ্ণ রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের। অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) মনে করেন যে বাক্ স্বাধীনতা, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, ন্যায্য মজুরি লাভ, প্রকৃত শিক্ষা প্রভৃতি নাগরিকগণের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার কারণ এইগুলি ব্যতীত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হই‌য়া যাইবে। আধুনিককালে সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) মনে করেন যে স্বাভাবিক অধিকার হইল এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকারের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা করা যাইতে পারে। 'স্বাভাবিক' শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নাই। বিভিন্ন অর্থে স্বাভাবিক কথাটি ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক অধিকার বলিতে নির্দিষ্টরূপে কোন অধিকারগুলি বুঝায়, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক অধিকারের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নাই অধিকার কখনো স্বাভাবিক হইতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্ব নিছক কল্পনামাত্র। রাষ্ট্র ছাড়া অধিকার রক্ষা ও সৃষ্টি একান্তই অসম্ভব। অধিকার কখনোই চিরন্তন হইতে পারে না। স্বাভাবিক অধিকার অর্থহীন শব্দমাত্র। স্বাভাবিক অধিকারের অজুহাতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়। স্বাভাবিক অধিকার কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিপন্থী হইতে পারে না।

স্বাভাবিক অধিকার ধারণা একেবারে মূল্যহীন নহে। মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য স্বাভাবিক অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবিক অধিকারের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। একারণেই সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক সকল অধিকারই স্বাভাবিক অধিকার। যে অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহযোগিতা করে এবং সামাজিক কল্যাণের অনুকূল তাহাকেই আমরা স্বাভাবিক অধিকার আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরি যুক্তিহীন নহে।

সাম্য (Equality): সাম্য বলিতে বুঝায় যে সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমান সুযোগসুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে সমাজের সকল ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এই কল্যাণ সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সাম্যনীতির প্রকৃত অর্থ হইল যে সমাজে মুষ্টিমেয় লোক যেন বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে না

পারে। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরেই অসাম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই অসাম্য থাকিলে নাগরিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কখনই সম্ভব হয় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন যে সাম্য ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সাম্য বলিতে এমন একটি পরিবেশে বুঝায় যাহার মধ্যে মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইয়া থাকে। সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই কারণ সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, অবাধ স্বাধীনতা কখনই কাহারও ভোগ করা উচিত নয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থের খাতিরে স্বাধীনতার নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ স্বাধীনতা হইল স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়, অপর পক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাহাতে প্রত্যেকটি নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে সেই কারণে নাগরিকদের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাম্য হইল স্বাধীনতার পরিপূরক এবং ইহা স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যদি রাষ্ট্রে কোন স্বাধীনতা থাকে এবং সাম্য নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। দুর্বল শ্রেণীর উপর সবলের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। সাম্যনীতি মানুষে মানুষে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকেই সমান হইবে ইহা কখনো আশা করা যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল যে প্রত্যেক ব্যক্তি বংশ, পদমর্যাদা, শিক্ষা ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। আইনের চক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান, রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদের সৃষ্টি করিবে না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহাতে ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগসুবিধা পায়, তাহা দেখাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং সাম্যের অর্থ হইল প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ববিকাশের পথে বাধাগুলির অপসারণ করা। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান, এবং ইহা হইল এমন একটি পরিবেশ যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকও ব্যক্তিত্ববিকাশের পূর্ণ সুযোগ পায়।

সাম্যের বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়:—(১) সামাজিক সাম্য (২) রাষ্ট্রনৈতিক

সাম্য, (৩) অর্থনৈতিক সাম্য, (৪) পৌর সাম্য, (৫) আইনগত সাম্য ও (৬) প্রাকৃতিক সাম্য।

সামাজিক সাম্য—সামাজিক সাম্য বলিতে বুঝায় যে সমাজজীবনে সকলেই সমান। যখন সমাজব্যবস্থার জন্ম, বংশ, জাতি, ধর্ম, বৃত্তি ও বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে নাগরিকগণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না তখনই সামাজিক সাম্য দৃষ্ট হয়। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একশ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে এবং উচ্চনীচ ভেদাভেদ দেখা যায়, সে রাষ্ট্রে কখনই সামাজিক সাম্য থাকিতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য—রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলীতে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটি নাগরিক স্বাধীনভাবে ভোটদান করিবার, সরকারি কার্যে অংশগ্রহণ করিবার, সরকারি চাকুরী পাইবার, সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবার কার্যে সমান সুযোগ ভোগ করে; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাষ্ট্রের মধ্যে উন্মাদ, দেউলিয়া, নাবালক, অপরাধী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অস্বীকার করা হয় না। কারণ এইসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়। অপরপক্ষে যদি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্থনৈতিক সাম্য—অর্থনৈতিক সাম্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লেলিনের মতে অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও ভিত্তিহীন; ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত করিতে না পারিলে কখনই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতীয় আয়ের সুসম বণ্টন প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্য পূর্ণমাত্রায় বজায় না থাকিলে সমাজ জীবনে কখনই সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পরিচালনার অধীনে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় কখনই অর্থনৈতিক সাম্য থাকিতে পারে না। বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা কার্যকর করার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য অপরিহার্য।

পৌর সাম্য—পৌর সাম্যের অর্থ হইল যে সমাজ জীবনে প্রত্যেকটি নাগরিক সমানভাবে পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার পূর্ণ সুযোগ ভোগ করিবে। বাক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা

সম্পত্তি রক্ষা, বসবাস ও চলাফেরা প্রভৃতির অধিকার রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই সমানভাবে ভোগ করার অর্থ হইল পৌর সাম্য। পৌর সাম্য মানুষের মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকার জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আইনগত সাম্য—আইনের চক্ষে সকলেই সমান। আইন সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আইন কোনরূপ ভেদাভেদ, প্রভেদ অথবা পার্থক্যের সৃষ্টি করিবে না। বৃটেনে আইনের অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেকটি নাগরিককে আইনগত সাম্য ভোগ করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের মধ্যে আইনগত সাম্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপসংহারে বলা যায় যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্যের মধ্যে বিরোধিতা রহিয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য থাকে না কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় জনগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ ভোগ করিয়া থাকে।

[ছয়] **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** (Economic Liberty): অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে অভাব হইতে মুক্তিকে বুঝায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতা অর্থহীন। শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন, পর্যাপ্ত অবসর, বেকার, বার্ধক্য এবং পংগু অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। সাম্যবাদী দেশগুলি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হইয়াছে; সোভিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধান নাগরিকের কাজ পাইবার অধিকার দিয়াছে। বার্জেস (Burgess) বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্ন পরিণামে বিষ কিন্তু অন্নহীন স্বাধীনতা বর্তমানে প্রহসন; বুভুক্ষুরা অন্নকেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে—প্রাতঃরাশের সহিত স্বাধীনতার সুরু হয়।

[সাত] **নৈতিক স্বাধীনতা** (Moral Liberty): অন্যান্য সকল স্বাধীনতা থাকিলেও যদি ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তির ক্রীতদাস হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি 'আমি' আছে— 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'; মানুষ যখন তাহার "বড় আমি" দ্বারা পরিচালিত হয় তখনই সে নৈতিক স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। নৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। দার্শনিক গ্রীণ এবং বোসাংকে নৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty): মানব জীবনের

পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। রুশো বলিয়াছেন, স্বাধীনতা অস্বীকার করা হইলে মনুষ্যত্ব অস্বীকার করা হয়—মানুষের অধিকার, এমন কি কর্তব্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। পরাধীন জীবন ক্রীতদাসের জীবন বলিয়া ইহা ঘৃণ্য, ইহা মানবজীবনের সকল তাৎপর্য বিনাশ করিয়া মানুষকে একটি সজীব যন্ত্রে পরিণত করে। এই কারণেই স্বাধীনতাকে এতো মূল্যবান আদর্শ বলিয়া তাহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় বিদ্রোহী জনতার কণ্ঠে যে তিনটি আদর্শ উচ্চারিত হইয়াছিল স্বাধীনতা তাহার অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলিকে যে আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহাও জাতীয় স্বাধীনতা—পরশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিবার আমৃত্যু প্রতিজ্ঞা, স্বাধীনতা হীনতায় কেহই বাঁচিতে চায় না—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন স্বরাজ ব্যতিরেকে জীবন দুর্বিসহ। রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনেও মানুষ বিচলিত নয়। স্বাধীনতা অর্জন করাই শুধু কঠিন নয়, উহা রক্ষা করাও বেশ দুরূহ ব্যাপার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া গণ্য করা হয়।

[এক] **জাতীয় স্বাধীনতা:** ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রথম রক্ষাকবচ হইল জাতীয় স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে না। বৃটিশযুগে ভারতে জনগণের কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না।

[দুই] **গণতন্ত্র:** গণতান্ত্রিক সরকার না হইলে নাগরিকের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকায় ইহা জনস্বার্থের প্রতিকূলে পরিচালিত হইবে না, ইহাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে গণতন্ত্রে দলগত শাসন চলে—অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে। এইজন্য প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগের উপর নির্বাচকগণের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আবার আইনসভার সদস্যগণও মন্ত্রীদিগের কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে উহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে।

[তিন] **ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ:** ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু (Montesquieu) মতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সরকারের তিনটি বিভাগ—আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরস্পরবিচ্ছিন্ন

থাকিবে। একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে এই ত্রিবিধ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে স্বৈরাচারের আশংকা থাকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতে পারে। যে ব্যক্তি আইন প্রণয়ণ করেন, তিনিই যদি আইনকে বলবৎ করেন এবং আইনভংগকারীর শাস্তি বিধান করেন তাহা হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ পাইবে। আধুনিক লেখকগণের মতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভাজন সম্ভবও নয়, আর কাম্যও নয়। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের বিশেষ অভাব রহিয়াছে তথাপি উহার নাগরিকেরা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাহা ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ অপরিহায বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন এ বিষয়ে সকলেই একমত। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহাকে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ না হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগকে হইতে মুক্ত রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

[চার] **সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা:** ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে লিপিবদ্ধ করা। মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিত থাকিলে সাধারণ আইনের তুলনায় উহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। অধিকারগুলি লিখিত থাকায় ব্যক্তি উহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে; মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. সোভিয়েৎ রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় সংবিধানে সাতটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে, (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, (৬) সম্পত্তি ভোগের অধিকার এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকা র।

[পাঁচ] **আইনের শাসন (Rule of Law):** আইনের শাসন বলিতে আইনের প্রাধান্য বুঝায়। ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে: (১) সরকারের কোন ইচ্ছাধীন (arbitrary) বা বিশেষ ক্ষমতা (prerogative) নাই; আদালত কর্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা চলিবে না। অন্যায়ভাবে কাহাকেও গ্রেফতার করা হইলে সে হেবিয়াস কর্পাস আইনের মারফৎ আদালতের সাহায্যে মুক্তি পাইতে পারে; (২) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার লোক পর্যন্ত সকলেই দেশের সাধারণ আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য ; (৩) জনগণের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারাই সংরক্ষিত হয়। ব্যক্তির অধিকারে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করা হইলে সাধারণ আইনেই তাহার প্রতিকার পাওয়া যায়। 'আইনের শাসন' ধারণার স্রষ্টা হইলেন ডাইসি (Dicey)। তাঁহার মতে গ্রেট বৃটেনে নাগরিকগণ যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে তাহার মূলে রহিয়াছে এই আইনের শাসন।

[ছয়] **রাষ্ট্রনৈতিক দল:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় রাষ্ট্রনৈতিক দলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাদিগকে আইনসভায় বিরোধীদলের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। বিরোধীদল ক্ষমতায় আসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার প্রবণতাকে বাধা দেয়। এই জন্য একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়।

[সাত] **স্বাধীনতা স্পৃহা:** জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহাই হইল ইহার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। স্বাধীনতা মানবজীবনের এক পরম মূল্যবান সম্পদ, ইহা ভোগ করিতে হইলে অবশ্যই কিছু মূল্য দিতে হইবে ; এই মূল্য হইল চিরন্তন এবং নিরলস সতর্কতা ("Eternal Vigilance is the price of liberty")। নিজেদের অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে জনগণকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে এবং বেআইনীভাবে অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বৃটিশ নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে তাহার কারণ তাহাদের জাতীয় চরিত্রের সাহসিকতা এবং অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহা। ব্যক্তি তাহার অধিকার রক্ষা করিতে যত্নবান হইলে সরকার বা অন্য কেহ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

জাতি ও জাতীয়তাবাদ

॥ The Nation and Nationalism ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Nation,—Nationalism and Nationality—elements of Nationality—Principle of self-determination, (one nation, one state theory)—Nationalism and Internationalism—League of Nations—U.N.O.

বিষয়বস্তু—জাতি ও জাতীযতাবাদ—জাতীযতাবাদেব বৈশিষ্ট্য—আত্মনিযন্ত্রণের নীতি—এক জাতি এক রাষ্ট্র—জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

'রাষ্ট্র' 'জাতি' 'জাতীয় জনসমাজ' এবং 'জনসমাজ' (State, Nation, Nationality and People) : রাষ্ট্র, জাতি, 'জাতীয় জনসমাজ' 'জনসমাজ' প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণ কথাবার্তায় সমার্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইসকল শব্দ বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে এই শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

"জাতি" (Nation) এবং "রাষ্ট্র" (State) শব্দ দুইটি অনেকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে "জাতি" বলিতে রাষ্ট্রের জনগণকে বুঝাইত। ফরাসী বিপ্লবের সময় শব্দটি "দেশপ্রেম" অর্থে ব্যবহৃত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর পর হইতে "জাতি" এবং "জাতীয়তাবাদ" শব্দ দুইটির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন জনসমষ্টি যখন একটি স্বাধীন শাসনযন্ত্র গড়িয়া তোলে বা গড়িবার আকাংখা পোষণ করে তখন তাহাকে জাতি বলা হয়।

জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু জাতি গঠনে সার্বভৌমত্ব অপরিহার্য নয়। জনসমষ্টির মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখা থাকিলেই তাহাকে জাতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপরন্তু জাতির সীমারেখার, সহিত রাষ্ট্রের সীমারেখার কোন সম্পর্ক নাই। একই রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বসবাস করিতে পারে যেমন গ্রেট বৃটেনে স্কচ এবং ইংরেজ এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি বাস করিলেও উহারা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। গিলক্রিস্ট (Gilcrist) যথার্থই বলিয়াছেন যে জাতি হইল রাষ্ট্র ব্যতীত আরও কিছু।

জাতি ও বাষ্ট্র

"জনসমাজ" (People) বলিতে বুঝায় এমন এক জনসমষ্টি যাহারা একই ভূখণ্ডে

বসবাস করে,—ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, আচারব্যবহারে এবং অধিকারবোধ ও অভিযোগে যাঁহাদের মধ্যে এক সহজাত ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। জনসমাজ এবং জাতীয় জনসমাজের (Nationality) মধ্যে পার্থক্য হইল যে, "জাতীয় জনসমাজ" বিশেষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হয় কিন্তু "জনসমাজে" এই বোধ অনুপস্থিত, এইজন্য জাতীয় জনসমাজকে 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ' (a politically conscious people), বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজ

জাতীয়তাবাদ হইল একটি "সামগ্রিক ভাবাবেগ" (a collective sentiment); ইহার সহিত রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক নাই, আর ইহা পরাধীন জাতিরও থাকিতে পারে। সংক্ষেপে, জাতীয়তাবাদকে জাতির গুণ বা সামগ্রিক ঐক্য বলা যায়। রাষ্ট্র মূলতঃ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এক সাংস্কৃতিক এবং প্রসঙ্গতঃ রাজনৈতিক সত্তা।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদান (Elements of Nationality): জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলিকে বাহ্যিক এবং মনস্তাত্ত্বিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বাহ্যিক উপাদানগুলির মধ্যে রহিয়াছে ভৌগোলিক নৈকট্য, বংশগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, অর্থনৈতিক ঐক্য ইত্যাদি। মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য প্রধানতঃ ভাবগত।

ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করিলে স্বাভাবিক কারণেই অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় একই ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের ভাবধারায় ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে। কিন্তু ভৌগোলিক সান্নিধ্য জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্যতম উপাদান হইলেও অপরিহার্য বলা চলে না। বর্তমানে পাকিস্তানে ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও একটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে নিজেদের রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে ইহুদীরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তীব্র এবং গভীর ছিল।

ভৌগোলিক সান্নিধ্য

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির একটি শক্তিশালী ভিত্তি বলিয়া দাবী করা হয়। সকলে একই বংশ হইতে উদ্ভূত এই ধারণা থাকিলে জাতীয়তাবাধ দৃঢ় হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে সকল সভ্য মানুষই বর্ণসংকর। কুলগত বিশুদ্ধতা আছে এরূপ কোন সভ্য মানুষ নাই বলিলেই চলে।

বংশগত ঐক্য

ভারতে 'শক-হূন-দল-পাঠান-মোগল' এক দেহে লীন হইয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা সত্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে বংশগত ঐক্য নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব আছে ইহা বলা চলে না।

ভাষাগত ঐক্য

তৃতীয়তঃ, ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এক ভাষাভাষী ব্যক্তিগণ অতি সহজেই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিতে পারে। কিন্তু জাতীয়তাবোধ গঠনে ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। ভারতে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও একজাতীয়তাবোধ সৃষ্ট হইযাছে। ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানে ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর্মগত ঐক্য

চতুর্থতঃ, ধর্মগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে সহজেই ঐক্যবদ্ধ করা যায়। ধর্মের ঐক্যই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মনে একাত্মবোধ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু জাতীয়তাবোধ গঠনে ধর্ম অপরিহার্য একথা বলে চলে না; সোভিয়েট রাশিযা, চীন, এবং ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকিলেও এক-জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

এইজন্য হায়েস (Hayes) বলিয়াছেন. অধিকাংশ আধুনিক জাতি ধর্মগত ঐক্য ব্যতিবেকেই সম্প্রসারিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ঐক্য

পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক ঐক্য জাতীয়তাবোধ গঠনের একটি উপাদান বলিয়া গণ্য হয়। জাপানী এবং অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়াছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। 'শ্বেত অষ্ট্রেলিয়ান নীতি' অনুসরণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার নেতারা এসিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। অর্থনৈতিক স্বার্থের অভিন্নতা কোথাও কোথাও জাতীয়তাবোধ গঠনে ইন্ধন যোগাইলেও উহা স্বয়ং যথেষ্ট নয়, কারণ তাহা হইলে শ্রমিকগণ এবং পুঁজিপতিগণ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিত।

আচার ব্যবহারের ঐক্য

ষষ্ঠতঃ, আচারব্যবহারে ঐক্য থাকিলে ইহা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য অথবা ঐতিহাসিক কারণে অধিবাসীদের আচার-ব্যবহারে ঐক্য থাকিলে স্বাভাবিক কারণেই তাহারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিবে। অবশ্য ইহাকেও অপরিহার্য উপাদান বলা চলে না। রাশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আচারব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য কোন বাহ্যিক উপাদানই যথেষ্ট নয়। উল্লিখিত উপাদানগুলির দুই একটি থাকিলেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইতে পারে। জাতীয় জনসমাজ গঠনে বাহ্যিক উপাদান অপেক্ষা ভাবগত উপাদানই অধিক প্রয়োজনীয়। তাই রেনার (Renar) বলিয়াছেন জাতীয় জনসমাজ সম্পর্কে ধারণা মূলতঃ ভাবগত। অতীতের সুখের স্মৃতি, দুঃখের বেদনাবোধ এবং ঐতিহ্য রক্ষার আকাংখা ভাবগত একাত্মতা গড়িয়া তোলে। জিমার্ণ (Zimmern) বলিয়াছেন জাতীয়তাবাদ ধর্মের মতোই ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective), মনস্তাত্ত্বিক, মনের অবস্থা, আত্মিক উপলব্ধি—অনুভব করা, চিন্তা করা এবং জীবনধারণ করার একটি বিশেষ পথ।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অথবা "এক জাতি এক রাষ্ট্রের" নীতি (Right of Self-Determination or the principle of "One Nation, one State").

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন মতবাদ। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময় (১৮১৫) হইতে এই মতবাদ সারা উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করে। "এক জাতি এক রাষ্ট্রের" নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং এই মতবাদ তখন হইতে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে বুঝায় প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জাতির সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত এক হওয়া উচিত ("The boundaries of government should coincide with those of nationality.") বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন এই তত্ত্বটিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় বলিয়া প্রচার করেন। তিনি বলিলেন যে, কোন জাতি যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় তাহা হইলে তাহার সেই অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। উইলসন যে ১৪-দফা শান্তি প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তাহার অন্যতম।

"এক জাতি এক রাষ্ট্র" এই নীতির স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়।

প্রথমতঃ, প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবী পূরণ হইয়া যাইবে ফলে পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান হইবে, সভ্যতার সংকটমুক্তি ঘটিবে এবং বিশ্বশান্তির পথ সুগম হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার পাইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের অবসান ঘটিবে এবং প্রত্যেক জাতি আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইবে। ইহা ব্যতীত শাসনকার্যও খুব সাবলীলগতিতে অগ্রসর হইতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে দুর্বল জাতির উপর শক্তিশালী জাতি আর অত্যাচার করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ, জাতীয়তার ভিত্তিতে বড বড সুগঠিত রাষ্ট্রগুলি ভাঙ্গিয়া অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠন করিলে নাগরিকের মর্যাদা হ্রাস পাইবে। ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যতখানি মর্যাদাব্যঞ্জক, পশ্চিমবংগ বা বিহারের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া নিশ্চয়ই তাহার সমকক্ষ নয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যবহারিক অসুবিধা থাকার জন্য ইহাকে বাস্তবে কার্যকর করা কঠিন।

প্রথমতঃ, এই নীতিকে কার্যকর করিতে হইলে বহু সুগঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী, জার্মানি এবং ইতালীয় ভাষাভাষীগণ বসবাস করে সুতরাং উহাকে ভাঙ্গিয়া তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে; বেলজিয়ামে দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। বর্তমানে ইউরোপে ২৮টি রাষ্ট্র রহিয়াছে, এই নীতিকে কার্যকর করা হইলে সেখানে ৬৮টি রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে। যেখানে ২৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করাই এক দুরূহ কাজ, সেখানে ৬৮টি রাষ্ট্র হইলে, সমস্যা যে তীব্রতর আকার ধারণ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা হইলে বিশ্বশান্তির পথ সুগম হওয়ার পরিবর্তে উহার পথে নূতন বাধার সৃষ্টি হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, একই রাষ্ট্রে বহু জাতির লোক একত্র বসবাস করায় বিভিন্ন ভাবধারা এবং সংস্কৃতির মিলনে সভ্যতা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধতর হইবে। কোন জাতি বিচ্ছিন্ন হইলে পিছাইয়া পডিবে। সুসভ্য এবং গতিশীল জীবনের জন্য বিভিন্ন জাতির একত্রে মিলিতভাবে থাকা উচিত। এই নীতি কার্যকর হইলে সোবিয়েত রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারিত না।

তৃতীয়তঃ, লর্ড কার্জন (Curzon) যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হইল শাঁখের করাত—ইহার দুই দিকই সমান বিপজ্জনক। ইহার ফলে জনগণ যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তেমনিই অন্যান্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু এই স্বতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তির কোন শেষ নাই। এই নীতিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিলে প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামও এই অধিকার চাহিয়া বসিবে। মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two nations theory) ভিত্তিতে ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তি এখানেই শেষ হয় নাই। সাম্প্রতিককালে পূর্বপাকিস্তানে

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানেও পাখ্‌তুনগণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়াছে।

চতুর্থতঃ, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি এমনভাবে পরস্পরের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে যে জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব নয়। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হইলেও সেখানে বহু অ-মুসলমান নরনারী বাস করে। ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ হইলেও মুসলমানদিগের সংখ্যাও এখানে কম নয়, আট কোটি। ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র।

বৃটিশ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাকটন (Acton), আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তীব্র বিরোধিতা করিয়া উহাকে উদ্ভট এবং ইতিহাসের পশ্চাৎগতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জিমার্ণ (Zimmern) লিখিয়াছেন জাতীয় রাষ্ট্রের মতবাদ অষ্টমহেনরী এবং লুথারের জাতীয় গির্জার মতবাদের পরিণতি লাভ করিবে। বার্ণাড জোসেফের (Bernard Joseph) মতে জাতীয়তার নীতি বিপজ্জনক মতবাদ এবং বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। বহু জাতি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস করিয়াও জাতীয় জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে তবেই বিশ্বশান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আদিম যুগেই মানুষ পৃথক হইয়া থাকিতে ভালবাসিত কিন্তু সভ্য জগতের মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চায় না। মিলিতভাবে বসবাস করিলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলি উন্নততর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উন্নতি করিতে পারিবে। সাধারণতঃ দুইটি ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা উচিত: (১) যখন একটি সমগ্র দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাহিবে তখন এই দাবি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য এবং (২) যখন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকাংশই এই অধিকার দাবী করিবে তখন ইহাকে সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত।

জাতীয়তাবাদ বনাম্ আন্তর্জাতিকতাবাদ : জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সংকট (Nationalism Vs. Internationalism : Nationalism, a menace to Internationalism) : জাতীয়তাবাদের অর্থ হইল যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ যাহা অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া অনুভব করে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ কখনই বিভিন্ন জনসমাজকে বিচ্ছিন্ন হইতে উৎসাহিত করে না। অপরপক্ষে সহযোগিতা এবং সহঅবস্থানের নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই উহা গড়িয়া উঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবাবেগ। জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেয় জাতির প্রতিটি মানুষ জাতীয় জীবনের আনুগত্য স্বীকার করিবে।

তীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ভাবগত এবং এই ভাবগত ঐক্যের ফলে জনসমাজ অন্য জনসমাজ তে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবোধে ভাষা, চিন্তা, দর্শ, সংস্কৃতির সাদৃশ্য বিভিন্ন মানুষের মনে সহযোগিতার প্রেরণা দেয়। জাতীয়তা-দের এই বৈশিষ্ট্য হইতে আসে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা হইতে তে হয় স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছা। সবল জাতিগুলি দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ রিয়া তাহাদের অধীনে আনয়ন করিতে চায়। বিভিন্ন জাতির এই আত্মগরিমা ও হংকার বোধ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাদের সৃষ্টি হয়। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, s power extends, nationalism becomes transformed into imperialism." ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। : সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাদ হইল সভ্যতার সংকট ; এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সঙ্কট (Nationalism is a menace to civilisation)। র্থের প্রকৃতি লইয়াই বিরোধ। জাতির স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহুক্ষেত্রেই তিতে জাতিতে সংঘর্ষ দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদ শুরু হয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং মন্ত্রতন্ত্রের অবসানের মধ্যে দিয়া। মুনাফার লোভে রাষ্ট্রগুলি বিদেশের বাজারে মাল বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হয়। এইভাবে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি ধীরে ধীরে অপররাষ্ট্রে নিবেশ স্থাপন করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের শেষ পরিণতি হইল সাম্রাজ্যবাদ ; ই সাম্রাজ্যবাদই সভ্যতার সঙ্কট ডাকিয়া আনে।

জাতীয়তাবাদ জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রেরণা জোগায়। জাতীয়তাবাদ মন এক দিকে জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাইয়া তোলে, তেমনি অপরদিকে অন্যান্য তিগুলির সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। বর্তমান যুগে জাতিগুলির রাষ্ট্রনৈতিক, মাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকিবার ফলে এক জাতির ক্ষ অপরজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। ল্যাস্কি (Laski) বলেন যে মানে বিশ্বের জাতিগুলি এতবেশী পরস্পর নির্ভরশীল যে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ অপরিহার্য। পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক সহাবস্থানই প্রকৃত তীয়তাবাদের আদর্শ। এই জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ই রূপ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তির সহায়ক। ইহা আন্তর্জাতিক আদর্শের পথ সুগম রিয়া থাকে। উদারনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ কখনোই সভ্যতার কট হইতে পারে না। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ মানুষে, মানুষে জাতিতে জাতিতে নোই বিরোধ সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখনই জাতীয়তাবোধ আত্মগরিমায় পূর্ণ য়া অপর-রাষ্ট্রের উপর হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়, তখনই দেখা দেয় সভ্যতার কট। স্বদেশ প্রীতি ও দেশাত্মবোধ একটি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু যখন এই উচ্চাদর্শ

হইতে জনসমাজ ভ্রষ্ট হয়, তখনই দেখা দেয় পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, রেষারেষি ও কলহ; এই ভ্রান্ত দেশপ্রেমের দ্বারাই বিশ্বশান্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

সাম্রাজ্যবাদই জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্র আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করে। প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিকে অধীনে আনিতে প্রয়াসী হয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অপর জাতিকে শাসন করিয়াছে। মানুষ নিজেকে ভালবাসিবে সত্যই তবে ন... তাহা সংকীর্ণরূপ ধারণ করে তখনই দেখা দেয় মানসিক সংকীর্ণতা। দেশপ্রেম স্বদেশপ্রীতি কোন মতেই অন্যায় নয় তবে যখন এই স্বদেশপ্রেম অপর জাতির প্রতি দ্বেষ, ও হিংসায় পরিণত হয় তখনই দেখা দেয় সভ্যতার সংকট। এই প্রসঙ্গে জির্মানের (Alfred Zimmern) এর উক্তি উল্লেখযোগ্য "The road to internationalism lies through nationalism." জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়াই আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ উপলব্ধি করা সম্ভবপর। জার্মানী, জাপান, ইতালী প্রভৃতি বা... উগ্র জাতীয়তাবাদ ইহাদের যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত করিয়াছিল। উগ্র *বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাতির প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে লই*যায়। এইজন্যই ল্যাস্কি বলেন যে জাতির ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই জাতিগুলি নিজে... ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে; পরবর্তীকালে এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। ইহার ফলে জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি দেখা দেয়, বিশ্বশান্তি ব্যাহত হয়; ঘোর যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। জাতীয়তাবা... আদর্শ রূপ গ্রহণ করিলে মানব সমাজের অগ্রগতি সম্ভবপর। উগ্ররূপ ধারণ করি... জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শকে বিনষ্ট করে। সবল জাতি দুর্বল জাতির উ... প্রভাব বিস্তার করিতে চায়। সাম্রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা জাতীয়তাবাদকে সংকটে... পথে লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদকে সভ্যতার সংকট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে আন্তর্জাতিক আদ... অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মানব সভ্যতা... অগ্রগতি কখনই সম্ভবপর নয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদের কুফল দূর করার জ... আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শ সমন্বয়ের ফলে ... সুন্দর ও সার্থক যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। ইহার ফলে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক আ... প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং প্রকৃত ও আদর্শ জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবা... মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিশ্বজনীন বোধ জাগ্রত হইলেই জাতীয়তাবা...

বিনষ্ট হইবে এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জাতিসংঘ (League of Nations): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে চৌদ্দ দফা শান্তি প্রস্তাব পন করেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জাতিসংঘ গড়িয়া ওঠে। ১৯২০ সালে সংঘ গঠিত হয়। তখন ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০, উইলসনের চেষ্টা সত্ত্বেও ন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। সোবিয়েৎ রাশিয়াও গোড়ার জাতিসংঘে যোগদান করে নাই, পরে ১৯৩৪ সালে উহা জাতিসংঘের সদস্য হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বের কল্যাণসাধন করা এবং যুদ্ধের ভযাবহ ধ্বংসলীলা প্রতিরোধ করিয়া বিশ্বশান্তির পথ সুগম করাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল; অবশ্য জাতিসংঘের কোন নিজস্ব বাহিনী বা পুলিশবাহিনী ছিল না।

জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সভা (Assembly), পরিষদ (Council) এবং কর্মদপ্তর (Secretariat)—এই তিনটি ছিল প্রধান। সকল সদস্য রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সভায় তিনজন করিয়া প্রতিনিধি াইতে পারিত কিন্তু প্রত্যের সদস্য রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট ছিল। জাতিসংঘের পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল পরিষদ। ১৯৩৯ সালে ইহাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ভিয়েৎ রাশিয়া এই তিনটি স্থায়ী সদস্য ও অন্যান্য ১১টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র এই ১৪ জন সদস্য লইয়া পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। প্রধান কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চালিত জাতিসংঘের একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা য জাতিসংঘের কর্মদপ্তর স্থাপিত হয়।

ইহা ছাড়া জাতিসংঘের আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল—আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন (International Labour Organisation, সংক্ষেপে)। ১৫ জন বিচারক লইয়া গঠিত জাতিসংঘের স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত হেগ্ র স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক বিবাদ প্রভৃতি এই আদালতের কাভুক্ত ছিল। জেনেভা শহরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের কার্যালয় স্থাপিত হয়। বীর সর্বত্র একই ধরনের শ্রম আইন প্রবর্তন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি চেষ্টা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাতিসংঘের চরম ব্যর্থতার নিদর্শন। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক নিয়মভংগকারী কোন রাষ্ট্রকে আদেশ পালনে বাধ্য করিবার তা জাতিসংঘের ছিল না। ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ

ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট জারি করে কিন্তু এই বয়কট ইতা উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর সকল ইহাতে যোগদান করে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করায় গোড়া হই জাতিসংঘ দুর্বল থাকিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমানাধিকার ছিল না। চতুর্থতঃ, জাতিসংঘ ভার্সাই চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠি কিন্তু ভার্সাই চুক্তি যাহাদের মধ্যে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যর্থ হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা উল্লেখযো সফলতা অর্জন করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের প্রচেষ্টায় শ্রমিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে (WHO) সংক্রামক ব্যাধির প্রতি এবং বিভিন্ন রোগের গবেষণা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগা দাসত্ব প্রথার সম্পূর্ণ অবসান প্রভৃতি বহু কল্যাণকব কাজের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রশংস সাফল্য অর্জন করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (**United Nations**) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চির অব ঘটাইয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদান প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪ দফা শান্তি প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ অফ (League of Nations) গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হ এই প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আণবিক নৃশংসতা আ মানুষকে আতংকগ্রস্ত করিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি হইল তাহার নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

১৯৪৪ সালে আমেরিকার ডাম্বারটন ওক্স নামক স্থানে যে বিভিন্ন মিত্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া সম্মেলন বসে তাহাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের প্র গৃহীত হয়। অবশেষে ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া আমেরি সানফ্রান্সিসকো শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টারে ১১১টি ধারা রহিয়াছে। চার্টারের প্রস্তাব (Preamble) এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

মূল উদ্দেশ্য

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল লক্ষ্য হইল পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়তঃ, নরনা সমানাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা ইহার তম উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ অপরিহার্য হইলে শান্তিপূর্ণ উ

উহার মীমাংসা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, ইহা পরাধীন জাতিসমূহকে স্বাধীনতালাভে সহায়তা করিবে। পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা সহযোগিতা এবং সৌহাদ্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে এবং পরিশেষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করিবে।

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য; উহাদের সংখ্যা ছিল ৫১। ১৯৬১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০৪, ভারত জাতিপুঞ্জের একজন মূল সদস্য। পৃথিবীর যে কোন শান্তিকামী রাষ্ট্র ইহার সদস্য হইতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টারে উল্লিখিত নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে এবং সদস্যের দায়দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভায় সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সমর্থিত হইলে নূতন সদস্য গ্রহণ করা হয়।

জাতিপুঞ্জের প্রধান বিভাগ হইল ছয়টি—সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ, কর্মদপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

[এক] **সাধারণ সভা (General Assembly)**: জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য লইয়া সাধারণ সভা গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাঁচজন করিয়া সদস্য পাঠাইতে পারে কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। এই সভার নিয়মিতভাবে বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন বসে; বিশেষ অধিবেশনেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। সভা নানা বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করিতে পারে। প্রতিষ্ঠার সময় ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১, এখন উহা বাড়িয়া শতাধিক হইয়াছে।

[দুই] **নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)**: নিরাপত্তা পরিষদ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা হইল ১১ জন, তন্মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং বাকী ছয়জন হইল অস্থায়ী সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, সোবিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। প্রত্যেক স্থায়ী সদস্যের ভিটো (veto) অর্থাৎ নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। অস্থায়ী সদস্যগণ সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই অস্থায়ী সদস্যকে পুর্ননির্বাচন করা চলে না। কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পরই পুনরায় নির্বাচন করা যাইবে।

[তিন] **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)**: নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য বিশ্বকে যুদ্ধের আতংক হইতে মুক্ত করা,

আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য হইল বিশ্বকে অভাব হইতে মুক্ত করা। একজন লেখকের ভাষায় ইহা হইল বাচাল নিরাপত্তা পরিষদের নীরব যমজ। সাধারণ পরিষদ দ্বারা তিন বৎসরের জন্য মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। সম্প্রতি সদস্য সংখ্যা বাড়াইবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। বৎসরে অন্ততঃ তিনবার এই পরিষদের অধিবেশন বসে; ইহা কেবল সুপারিশ করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৫নং ধারায় বলা হইয়াছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের দায়িত্ব তিনটি:

(ক) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করা;

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান; শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

(গ) জাতি-ধর্ম-ভাষা এবং নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য মানবতার অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা;

এই পরিষদ বিভিন্ন কমিশন, স্থায়ী কমিটি, অস্থায়ী কমিটি এবং সংস্থার মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করে।

[চার] **আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)**: আন্তর্জাতিক বিচারালয় ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারেন। কেবলমাত্র কোন রাষ্ট্রই এই বিচারালয় ব্যবহার করিতে পারে—কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়; বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক বিচারালয় ব্যবহার করিতে পারে। জাতিপুঞ্জের সংবিধানে উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে এই বিচারালয়ে তাহার বিচার প্রার্থনা করা যায়। বিচারকগণ আন্তর্জাতিক আইনানুসারে বিচার করিয়া থাকেন। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে ইহার প্রত্যেক সদস্য বিচারালয়ের রায় মানিয়া চলিতে বাধ্য।

[পাঁচ] **অছি পরিষদ (Trusteeship Council)**: জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি অনুন্নত দেশ শাসিত হয়। ইহাদিগকে স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার দায়িত্ব জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে। অছি পরিষদ এই সকল অছি অঞ্চল তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া অছি পরিষদ গঠিত হয়।

[ছয়] **কর্মদপ্তর (The Secretariat)**: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর রহিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলই হইলেন প্রধান কর্মকর্তা

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন এবং কার্যকাল শেষ হইলে তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। জাতিপুঞ্জের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল হইলেন উথাণ্ট।

মূল্যায়ন (Evaluation): অভিযোগ করা হয় যে জাতিপুঞ্জ তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করিতে পারে নাই। কারণ যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছিল কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতংক এখনো দূর হয় নাই।

কাশ্মীর সমস্যা, ভিয়েৎনাম সমস্যা, আরব-ইস্রাইল সমস্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির মীমাংসা ইহা করিতে পারে নাই। মানবতার মৌলিক অধিকারের মহান আদর্শ ঘোষিত হইলেও তাহা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় সরকার অ-শ্বেতকায় মানুষগুলিকে এখনো মানুষের মর্যাদা দেয় নাই। বিশ্বের পরাধীন জাতিসমূহ এখনো স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় নাই। পরিশেষে, এই অভিযোগও আনা হয় যে, ইহা সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারের নীতি স্বীকার করিলেও পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়া কার্যতঃ পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে উহাদের প্রাধান্য দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার দরুন জাতিসংঘের পতন হয়, আর সোভিয়েত রাশিয়ার অসহযোগিতার ফলে জাতিপুঞ্জের কার্যকর ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে; কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

ত্রুটি থাকিলেও এবং ইপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইলেও জাতিপুঞ্জের অবদানও সামান্য নয়। কোরিয়া-সমস্যা, সিরিয়া ও লেবানন সমস্যা, সুয়েজখাল সংস্থা, কংগো সমস্যা এবং ভারত ও পাকিস্তান সমস্যার সমাধানে জাতিপুঞ্জ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রনৈতিক কাজের সফলতা সম্পর্কে মতবিরোধ থাকিলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উহার বিপুল অবদান সম্পর্কে দ্বিমত নাই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) প্রভৃতি এজেন্সির মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করিতেছে।

জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যতের উপর মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইলে মানুষের জীবনে দারুণ দুঃসময় ঘনাইয়া আসিবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ আন্তর্জাতিকতার চেতনা উপলব্ধি করিলে তবেই রাষ্ট্রপুঞ্জের "একজাতি একপ্রাণ, একতার" মহান আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

॥ Citizenship ॥

Relevant portion of the Syllabus : Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—hindrances to good citizenship.

বিষয়বস্তু : নাগরিক কাহাকে বলে—নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি—নাগরিকতার বিলোপ—সুনাগরিকতা—সুনাগরিকতার পথে বাধা—ভারতীয় নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য—ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি—১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন।

নাগরিক কাহাকে বলে (Meaning of Citizenship) : সাধারণ লোক নাগরিক বলিতে নগরের অধিবাসীকে বুঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে "নাগরিক" শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল "নাগরিক" শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেই নাগরিক বলা হইবে। প্রাচীন গ্রীসে কারিগর (Mechanics), ক্রীতদাস এবং সাধারণ শ্রমিক নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না। বর্তমান যুগে নাগরিক শব্দটির অর্থ বদলাইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সমাজ কল্যাণের জন্য বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই হইল নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য। অন্যভাবে বলা যায় যে নাগরিকগণ হইল রাষ্ট্রের সদস্য, ইহাদের লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং রাষ্ট্র ইহাদের অধিকার রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

নাগরিক হইতে বিদেশীকে (aliens) পার্থক্য করা প্রয়োজন। নাগরিক রাষ্ট্রের সদস্য বলিয়া রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে আর ইহার পরিবর্তে সে রাষ্ট্রের নিকট হইতে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে বিদেশী হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সদস্য, অবশ্য যে রাষ্ট্রে সে, সাময়িকভাবে বাস করিতেছে তাহার প্রতি তাহাকেও আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয় কিন্তু তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। বিদেশীরা সামাজিক অধিকার ভোগ করিতে পারে কিন্তু তাহাদের কোন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থাকে না। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে কেবলমাত্র অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেই পার্থক্য থাকে না, কর্তব্যের ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার তাহার নাগরিকগণকে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিতে পারে কিন্তু বিদেশীদিগকে পারে না। বিদেশীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়—মিত্রপক্ষীয়

বিদেশী (Friendly aliens) এবং শত্রুপক্ষীয় বিদেশী (Enemy aliens); যে সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত কোন বিবাদ থাকে না তাহার নাগরিকদের মিত্রপক্ষীয় বিদেশী বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতে বসবাসকারী আমেরিকান বা বৃটিশদের কথা বলা যায়। আর যে সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ থাকে তাহার নাগরিকদের শত্রু-পক্ষীয় বিদেশী বলা হয়; উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বসবাসকারী চীনাদের কথা উল্লেখ করা যায়।

কথনো কথনো বিদেশীদিগের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়; যেমন তাহাকে পুলিশের নিকট নাম রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। বিদেশী কোন দুষ্কার্য করিলে রাষ্ট্র তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারে।

সাধারণতঃ নাগরিক দুই ধরনের হয়—জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক। এই দুই ধরনের নাগরিকদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করিলে সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারিবে না।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Modes of Acquiring Citizenship) : নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে—জন্ম সূত্রে (By birth or descent) এবং রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদন দ্বারা (by formal grant); জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভ করিলে তাহাকে স্বাভাবিক নাগরিক (Natural born citizen) বলে আর অনুমোদন দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে নাগরিক করা হইলে তাহাকে অনুমোদিত নাগরিক (Naturalised citizen) বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের দুইটি পদ্ধতি আছে—জন্মনীতি (Jus Sanguinis) এবং জন্মস্থান নীতি ((Jus Soli or Jus Loci) জন্মনীতি অনুসারে সন্তান যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন. সে পিতার রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও এই নীতি অনুসারে সে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে। অপরপক্ষে জন্মস্থান, নীতি অনুসারে সন্তান যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই গণ্য হইবে, তাহার পিতা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলেও কিছু আসে যায় না। এই নীতি অনুসারে একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করে তবে সে ফরাসীদেশেরই নাগরিক হইবে, পিতার রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবে না।

জন্মস্থান নীতি অপেক্ষা জন্মনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ধরা যাক, এক ব্যক্তির পৃথিবীর বিভিন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রে পাঁচটি সন্তানের জন্ম হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার পাঁচটি সন্তান পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে; ইহাতে এক

উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন একটি নীতি অনুসৃত হ না। কোন কোন রাষ্ট্র উভয় নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে; ভারত জন্মনীতি এব জন্মস্থাননীতি উভয়কেই স্বীকার করিয়াছে।

অনুমোদনসিদ্ধ উপায়ে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিতে পারে স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা-স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে, সম্পত্তি ক্রয় করিয় দীর্ঘকাল বসবাস করিয়া, সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া নাগরিকতা লাভ করা যায়। এই সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে লিখিতভাবে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া রাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করিতে হয়।

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক পূর্ণ (Grand) অথবা আংশিক (Partial) হইতে পারে। যে রাষ্ট্র জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে না তাহাকে পূর্ণ নাগরিকতা বলা হয়। ভারতে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। অপরপক্ষে যে রাষ্ট্র জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করে সেখানে অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক আংশিক নাগরিকতার অধিকারী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মর্যাদায় পার্থক্য করা হয়। অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারে না।

নাগরিকতার বিলোপঃ (Termination of Citizenship): নানাভাবে নাগরিকতার বিলোপ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকেরা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে এবং নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারায় কারণ এক ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি গুরুতর অপরাধ করিলে যেমন সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দেশদ্রোহিতা প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি নাগরিকত্ব হারায়। চতুর্থতঃ, বিদেশী রাষ্ট্রের সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করিলে, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিলে অথবা দীর্ঘকাল যাবৎ নিজরাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকিলে নাগরিকতার বিলোপ ঘটিতে পারে।

সুনাগরিকতা (Good Citizenship): রাষ্ট্রকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সুনাগরিকের প্রয়োজন। গণতন্ত্র জনগণ শাসিত সরকার—জনগণের দোষগুণ শাসনকার্যে প্রতিফলিত হইবে। গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা করিতে হইলে নাগরিকদিগকেও সমুচ্চ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীকগণ সুনাগরিক

এবং সৎ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই। তাহাদের মতে ভালো লোকই ভালো নাগরিক হইতে পারে।

বর্তমানযুগে সুনাগরিকতার ধারণা কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে নাগরিকতা হইল সমাজকল্যাণের জন্য নাগরিকের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ। সুতরাং সুনাগরিক শুধুমাত্র নিজের কল্যাণের কথাই চিন্তা করিবে না, সমাজের কল্যাণের কথাও ভাবিবে; তাহাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে সেই বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করিবার মতো বুদ্ধিমত্তা তাহার থাকিবে।

লর্ড ব্রাইসও সুনাগরিকের তিনটি অনুরূপ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বিচারবুদ্ধি (Intelligence), আত্মসংযম (Self control) এবং বিবেক (Conscience), প্রথমতঃ সুনাগরিককে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে। বর্তমানকালে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। উহাদের সঠিকভাবে বুঝিবার এবং বিশ্লেষণ করিবার জন্য নাগরিকের উপযুক্ত বিচারবুদ্ধি না থাকিলে অসংখ্য সমস্যার মাঝে নাগরিক সহজেই বিভ্রান্ত এবং বিমূঢ় হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ইহাতে নাগরিক শুধু তাহারই নয়, সারা দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিবে; বিচারবুদ্ধিকে উন্নত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।

সুনাগরিকতার পথে বাধা (Hindrances to Good Citizenship): লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকতার পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়াছেন—উদ্যমহীনতা, (Indolence) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Self interest) এবং দলীয় মনোভাব (Party spirit).

উদ্যমহীনতা বলিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, ঔদাসীন্য এবং উৎসাহের অভাব বুঝায়; নাগরিক যদি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম এবং সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সকলের দায়িত্ব বিশেষ কাহারো দায়িত্ব নয় এই ধারণায় কেহ কর্তব্যে উৎসাহ দেখায় না। নাগরিকের উদ্যমহীনতা নানাভাবে প্রকাশ পায়; সে নির্বাচনের সময় ভোটদান করে না, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে, দেশের সমস্যা লইয়া চিন্তা করে না, নিজের মতকে সত্য জানিয়া তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে চায় না, অধিকার বিপন্ন হইলেও উদাসীন থাকিয়া যায় এবং দেশ আক্রান্ত হইলেও সরকারকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় না। পৌরচেতনা সদা জাগ্রত না থাকিলে শাসনব্যবস্থা নিম্নগামী হইবে, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইবে কারণ সদা সতর্ক দৃষ্টিই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

কয়েকটি কারণে বর্তমান যুগে নাগরিকের এই উদ্যমহীনতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন উদ্যমহীনতার প্রধান কারণ। প্রাচীন

গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ছোট ছিল বলিয়া সকল ব্যক্তিই শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্প্রসারণের খুবই উপযোগী। কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রগুলির আয়তন বৃহৎ, জনসংখ্যা বিশাল। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে নেহাৎ নগণ্য বলিয়া মনে করে। কোটি কোটি ভোটদাতাদের মধ্যে সে মাত্র একজন, তাহার ভোটের মূল্য কতটুকু—এই বোধ মানুষকে নিরুৎসাহ করিয়া তোলে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক, কার্যকলাপ অপেক্ষা সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদ মানুষের মনকে অধিকতর আকর্ষণ করে। এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ লওয়ার ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। ফুটবল খেলার মাঠ এবং কোন নেতার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা এই দুইএর মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইবে অনেকেই খেলার মাঠকে অগ্রাধিকার দিবে। তৃতীয়তঃ, বর্তমানকালে জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকার সমস্যা কঠোর এবং তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনধারণের উপযোগী পর্যাপ্ত আয় করিতেই মানুষের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হইয়া যায়। রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার মতো পর্যাপ্ত অবসর তাহার কোথায়?

সুনাগরিকতার পথে দ্বিতীয় অন্তরায় হইল ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা। সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া নাগরিক কখনো কখনো রাষ্ট্রবিরোধী অথবা সমাজবিরোধী কাজ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ অনেক সময় তাহাদের ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অধঃপতন অনিবার্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে বলিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরি-প্রেক্ষিতে তাহার নিজ স্বার্থকে বিচার করিতে হইবে। যদি সমাজের স্বার্থ এবং ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্যক্তিকে তাহার স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে নতুবা রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ নানাভাবে প্রকাশ পায়, যেমন ভোট বিক্রয়, উৎকোচ গ্রহণ, ভোট দানের বিনিময়ে লাইসেন্স এবং পারমিট পাওয়ার ব্যাপারে সুবিধালাভ, রাষ্ট্রীয় নেতাদের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনদের চাকুরীর ব্যাপারে সুযোগ দান প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার উদাহরণ।

সুনাগরিকতার পথে তৃতীয় বাধা হইল দলীয় মনোভাব। দলীয় মনোভাব ব্যক্তি-গত স্বার্থপরতার একটি রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। দলপ্রথা ব্যতীত গণতন্ত্র চলিতে পারে না। দলপ্রথা নাগরিককে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি বুঝিতে সহায়তা করে, রাষ্ট্রনৈতিক কাজ করিতে উৎসাহ দেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে। কিন্তু দল যখন তাহার সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য সমাজ কল্যাণের মহান

আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে তখন ইহার সকল গুণই নষ্ট হইয়া যায়। দলীয় সংকীর্ণতা নাগরিককে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া জাতীয়-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দল তখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অথবা শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্র হইয়া পড়ে। জাতীয় স্বার্থের উর্ধে দলীয় স্বার্থ স্থান লাভ করে। অতিরিক্ত এবং বিকৃত দলীয় মনোভাবের ফলে দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বড় করিয়া দেখা হয় এবং দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য জাতীয় স্বার্থকে পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া হয়, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রনৈতিক দল তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বিষ ছড়াইতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না।

পরিশেষে, অশিক্ষা সুনাগরিকতার পথে একটি বিশেষ অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। শিক্ষাই নাগরিককে তাহার কর্তব্য পালনে এবং সংস্কারমুক্ত হইতে সাহায্য করিবে। সিমন (E. Simon) শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হইল শিশুকে এই জগতে তাহার স্থান করিয়া লইতে এবং জীবিকার্জনে সহায়তা করা। শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সাংস্কৃতিক—ব্যক্তির মনে মূল্যবোধের সৃষ্টি করা আর শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল নাগরিকতার শিক্ষা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, শিক্ষা তাহাকে সমাজে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে এবং সমাজের শক্তি ও ঐক্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। সমাজ চেতনা সৃষ্টি করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

সুনাগরিকতার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহাদের দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহাদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান।

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নাগরিকের ঔদাসীন্য দূর করিবার জন্য অনেক লেখক বাধ্যতামূলক ভোটদানের সুপারিশ করেন। প্রত্যেক নাগরিককেই ভোট দান করিতে হইবে। যদি কেহ ভোটদান না করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিয়া নাগরিক চেতনা সৃষ্টি করা কঠিন বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে শুধু নির্বাচনের সময়ই নয়, অপর সকল সময়ই নাগরিকগণের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকিলে ব্যক্তি আর ঔদাসীন্য দেখাইবে না। গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall) এই সকল প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকিলে নাগরিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উৎসাহী হইয়া পড়িবে। অবশ্য ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকগণ এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

উপরিলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানসমূহ সুনাগরিকতার বাধাসমূহ দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুনাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিক্ষার অভাব সুনাগরিকতার পথে একটি বিরাট বাধা; সুতরাং শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকের আভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকশিত হইবে, শুভবুদ্ধি ও দেশপ্রেম জাগরিত হইবে এবং সে সামাজিক সমস্যায় উৎসাহ বোধ করিবে। মিল যথার্থই বলিয়াছিলেন ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দিবার পূর্বে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, সুনাগরিককে আত্মসংযমী হইতে হইবে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিতে হইলে নাগরিককে আত্মসংযমী এবং পরমতসহিষ্ণু হইতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মতের সহিত নিজ মতের বিরোধ বাধিলে নাগরিককে অহেতুক উত্তেজিত না হইয়া শান্তচিত্তে সংযমী হইয়া অপরের মতামত বিচার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে নাগরিককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, সুনাগরিককে বিবেকসম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে। বিবেকবান ব্যক্তিই তাহার পৌর কর্তব্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকে। নাগরিককে অতি নিষ্ঠার সহিত তাহার কর্তব্য পালন করিতে হইবে; নিয়মিতভাবে কর প্রদান করা এবং নিষ্ঠার সহিত ভোট দান করা তাহার কর্তব্য। সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে, এমনকি প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাহার অধিকারের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইলে সে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইবে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন প্রত্যেক নাগরিককে সত্যাসত্য উপলব্ধি করিবার মতো উপযুক্ত বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে।

নাগরিকের এই সকল মহৎ গুণ থাকিলে তবেই গণতন্ত্র আদর্শ শাসন ব্যবস্থারূপে পরিগণিত হইতে পারিবে, তবেই জনগণের বাণী ঈশ্বরের বাণীতে পরিণত হইবে।

ভারতীয় নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য (Features of Indian Citizenship) নাগরিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

(১) সংবিধানে নাগরিকতা অর্জন এবং উহার লোপ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত আলোচনা নাই। নাগরিকতা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লিয়ামেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। সংবিধান প্রবর্তনের সময়—অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে—কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে সংবিধানে তাহারই উল্লেখ আছে।

(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রেই দুইশ্রেণীর নাগরিক দেখা যায়—জন্মসূত্রে নাগরিক এবং

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক। জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের দুইটি নীতি আছে, জন্মনীতি এবং জন্মস্থানীতি। ভারতে এই উভয় নীতিই অনুসৃত হয়।

(৩) রাষ্ট্র জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের অধিকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করিলে উহাকে পূর্ণ নাগরিকতা বলা হয়। ভারতে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না।

(৪) অনেক যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতার (dual citizenship) ব্যবস্থা আছে। এরূপক্ষেত্রে ব্যক্তি একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এবং বসবাসকারী রাজ্যের নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা রহিয়াছে। যে ব্যক্তি টেকসাস রাজ্যে বাস করে সে টেকসাস রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই নাগরিক। ভারতে দ্বৈত নাগরিকতা নাই, সকলেই শুধু ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক।

(৫) কোন কোন রাষ্ট্রে শিক্ষা, সম্পত্তি, ধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিক অধিকারের পার্থক্য করা হয়। পূর্বে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ভিত্তি ছিল সম্পত্তি। এখনো পৃথিবীর বহু দেশে নারীর ভোটাধিকার নাই। শিক্ষা, সম্পত্তি, ধর্ম অথবা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভারতে নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের কোন পার্থক্য করা হয় না।

ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Methods of Acquisition of Indian Citizenship): পূর্বেই বলা হইয়াছে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্টকে এবিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয় এবং ১৯৫৪ সালে পার্লিয়ামেণ্টে একটি নাগরিকতা সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। সংবিধানে উল্লিখিত ভারতের নাগরিকতা সম্পর্কে নীতিগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) সাধারণ নিয়ম; (২) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম, (৩) ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সম্পর্কে নিয়ম, এবং (৪) অন্যান্য বিদেশীদের সম্পর্কে নিয়ম।

ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে, যদি (১) সেই ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথবা (২) তাহার পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বর্তমান সংবিধান চালু হইবার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে যাহারা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে বলিয়া স্থির করে তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

পাকিস্তান হইতে আগতদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) যাহারা

১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে (২) যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই এর পর কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং (৩) যাহারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে। যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে আসিয়াছে তাহারা নিজেরা যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা, পিতামহ পিতামহী, মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহারা ভারতে আসিবার পর যদি সাধারণভাবে এদেশে বসবাস করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই এর পর কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের পূর্বে ভারতে আসিয়াছে তাহারা দুটি সর্ত পূরণ করিলে ভারতের নাগরিকতা পাইবে ; (১) ব্যক্তি নিজে অথবা তাহাদের পিতামাতা, পিতামহ পিতামহী অথবা মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং (২) আবেদনকারী কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে অবশ্য আবেদন করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে অন্ততঃ ছয়মাস ভারতে বাস করিতে হইবে। যাহারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে তাহারা ভারতের নাগরিকতা লাভের পূর্বে তিনটি সর্ত পূরণ করিবেন :— (১) নিজে অথবা পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, (২) ব্যক্তিকে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং (৩) ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভারতের নাগরিক হইতে পারে যদি তাহারা অথবা তাহাদের পিতামাতা অথবা পিতামহ পিতামহী, মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যে দেশে বর্তমানে বাস করিতেছে সেই দেশে অবস্থিত ভারত সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অনুমোদিত হইয়া থাকে।

পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী কেহ ভারতের নাগরিক হইতে চাহিলে তাহাকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে :—(১) আবেদন করিবার পূর্বে ছয়মাস অন্ততঃ ভারতে বসবাস করিতে হইবে, (২) ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে (৩) নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ

করিতে হইবে এবং (৪) ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন (Indian Citizenship Act, 1955) : এই আইনানুসারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়, (১) জন্মসূত্রে (birth) (২) উত্তরাধিকার সূত্রে (descent) (৩) রেজেষ্ট্রিকরণ, (৪) অনুমোদনসিদ্ধ উপায় (naturalisation) এবং (৫) কোন অঞ্চলের ভারতের অন্তর্ভুক্তির দরুণ (incorporation of territory).

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত এবং শত্রুপক্ষীয় বিদেশীর সন্তান ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতের নাগরিক হইবে না।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর যে সকল ব্যক্তি ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পিতা ভারতের নাগরিক হইলে তাহারাও উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতের নাগরিক হইতে পারিবে।

কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি যাঁহারা অন্য উপায়ে নাগরিকতা অজন করিতে পারেন নাই তাঁহারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া রেজেষ্ট্রিকরণের দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবেন।

কোন বিদেশী কতকগুলি সর্ত পূরণ করিয়া ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়া অনুমোদনসিদ্ধ উপায়ে ভারতের নাগরিকতা লাভ করিতে পারে।

যদি কোন নূতন ভূখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে ভারত সরকার ওই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে নাগরিকতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তথাকার অধিবাসীরা ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে।

এই আইনে নাগরিকতা লোপের কারণগুলিও উল্লিখিত আছে।

কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে দুইটি দেশের নাগরিক হইলে তাহাকে একটি দেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি অপর দেশের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে ভারতের নাগরিকতা হারাইবে। ভারত সরকার যদি মনে করেন যে কেহ জালিয়াতি বা অন্য কোন অসদুপায়ে নাগরিকতা লাভ করিয়াছে অথবা যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে অথবা ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নাই তাহা হইলে ভারত সরকার তাহাকে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

নবম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

॥ Rights and Duties of Citizens ॥

Relevant portion of the Syllabus : Rights and Duties of Citizen—relation between Rights and Duties.

বিষয়বস্তু : অধিকারের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ—সামাজিক অধিকার—রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ—রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য—অধিকার ও কর্তব্য।

অধিকারের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (Rights : Definition and Classification) : মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সকল সুযোগসুবিধার প্রয়োজন এবং রাষ্ট্র যাহাদের স্বীকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকে অধিকার বলে। সুতরাং অধিকারের দুইটি দিক আছে, আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ ও সুবিধার দাবী এবং দ্বিতীয়তঃ ওই দাবীগুলির রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতি। আমার নিজের সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার আমার আছে আর রাষ্ট্রও এই দাবীকে স্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ অন্যের আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ল্যাস্কি অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিযা বলিয়াছেন "অধিকার হইল সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে মানুষ তাহার আত্মবিকাশ করিতে পারে না।" ("Rights are those conditions, of social life without which no man can seek in general, to be himself at his best") অধিকারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ এবং প্রকৃতি আলোচনা করিলে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, অধিকারের উদ্দেশ্য ব্যক্তির আত্মবিকাশ এবং আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা, দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে অধিকার দান করে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না ; তৃতীয়তঃ, অধিকার হইল রাষ্ট্র স্বীকৃত কতকগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ; চতুর্থতঃ, অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করিবে। রাষ্ট্র-অন্তর্গত কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়, রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। পঞ্চমতঃ, অধিকার পরিবর্তনশীল, সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সহিত অধিকারের স্বরূপও পরিবর্তিত হইতেছে। পূর্বে শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকার স্বীকৃত হইত না, বর্তমানে উহা একটি মূল্যবান নাগরিক অধিকার। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি চাকুরী দিবার অধিকার স্বীকার করে না কিন্তু সোভিয়েৎ রাশিয়ায় ইহা একটি মূল্যবান সামাজিক অধিকার।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

অধিকারগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং **আইনগত অধিকার** (Legal Rights)

সামাজিক ন্যায়বোধ এবং বিবেক হইল নৈতিক অধিকারের ভিত্তি। এই অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। কোন নাগরিকের নৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সে আদালত হইতে ইহার প্রতিকার পাইতে পারে না। একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারেঃ বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুত্রের। কিন্তু সে যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তাহা হইলে রাষ্ট্রের কিছুই করিবার নাই। আবার পিতার কর্তব্য হইল সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া কিন্তু সে যদি তাহার কর্তব্য পালন না করে তাহা হইলে আইনে ইহার কোনরূপ প্রতিকার পাওয়া যাইবে না।

নৈতিক অধিকার

অপরপক্ষে আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। কেহ আইনগত অধিকার ভংগ করিলে আদালত অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

আইনগত অধিকার

আইনগত অধিকারকে আবার সামাজিক (civil) এবং রাজনৈতিক (political) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

যে সকল অধিকার মানুষের সভ্য জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য তাহাদের সামাজিক অধিকার বলা হয়। এই অধিকারগুলি সভ্য জীবন যাপনের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য বলিয়া শুধু নাগরিকদিগকেই নয়, বিদেশীদেরও এই অধিকারগুলি প্রদান করা হয়। জীবন-ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা বুঝায়। এই অধিকারগুলি শুধুমাত্র নাগরিককেই দেওয়া হয়, বিদেশীরা এই অধিকার পাইতে পারে না। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচন প্রার্থী হইবার অধিকার, আবেদন করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রনৈতিক

সামাজিক অধিকার (Civil Rights):

[এক] **জীবনধারণের অধিকার (Right to Life):** জীবনধারণের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে বুঝান হয়। ইহা একেবারে গোড়ার বা মৌলিক অধিকার। বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠন করিয়াছিল।

নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা হবস বলিয়াছেন যে জীবনধারণের অধিকার রক্ষা করিবার জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। আবার এই কারণেই আত্মহত্যা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্র তাহার পুলিশ বাহিনী, সৈন্য বাহিনী এবং বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকের জীবনধারণের অধিকার সুরক্ষিত রাখে।

[**দুই**] **স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty) :** মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতেই চায় না, সে স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। ক্রীতদাসের জীবন তাহার কাম্য নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের অবাধে ইচ্ছামত চলাফেরা করার অধিকার থাকিবে। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায়—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিবে। কোন অপরাধ না করিলে নাগরিকের গতিবিধিকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না এবং বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিয়া রাখা চলিবে না। অবশ্য যুদ্ধ বা অন্য কোন সংকটকালে রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণ খর্ব করিতে পারে।

[**তিন**] **স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Speech) :** গণতন্ত্র হইল জনগণের বা জনমতের শাসন। জনমত গঠনের জন্য ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা চাই। জনসাধারণ যদি স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে তবে সরকারের দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারিবে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা দুই ধরনের হইতে পারে : (১) বাক স্বাধীনতা এবং (২) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। সভায় বক্তৃতা দিয়া মৌখিকভাবে এবং পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে লিখিতভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের থাকিবে। অবশ্য মত প্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া অশ্লীল, মানহানিকর বা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কোন কিছু বলিবার বা লিখিবার অধিকার নাগরিকের নাই ; যুদ্ধের সময় মত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করা হয়।

[**চার**] **সম্পত্তি ভোগের অধিকার (Right to Property) :** জীবনধারণের জন্য কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য। এ্যারিষ্টটলের মতে ইহা সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। ভোগের উদ্দেশ্যেই ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করে। অন্যায়ভাবে কেহ

তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে। ব্যক্তি যদি জানে যে অর্জিত সম্পত্তি সে ভোগ করিতে পারিবে না তাহা হইলে তাহার কর্মস্পৃহা নষ্ট হইয়া পড়িবে; সম্পত্তি মানুষকে সামাজিক মর্য্যাদা দেয়। বোসাংকের মতে সম্পত্তি চরিত্র বিকাশের জন্য প্রয়োজন কারণ কিছু পরিমাণ সম্পত্তি না থাকিলে স্বাধীনতা থাকিবে না; আর স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। হবহাউস সম্পত্তিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি (Property for use) এবং ক্ষমতার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি (Property for power). প্রথম ধরনের সম্পত্তির উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিমত নাই কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের সম্পত্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। সোভিয়েৎ রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করা হইয়াছে। ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হইয়াছে; অবশ্য জমিদারগণ তাহাদের সম্পত্তির বিনিময়ে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ পাইয়াছে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যাইতে পারে।

[**পাঁচ**] **চুক্তির অধিকার (Right to Contract):** চুক্তির অধিকার সমাজে স্বাধীনভাবে বাস করিবার এবং কাজ করিবার অধিকারেরই একটি দিক। নাগরিকগণের নিজেদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক সর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার রহিয়াছে। চুক্তির সর্ত লঙ্ঘিত হইলে রাষ্ট্র চুক্তিভংগকারীকে শাস্তি দিবে। ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট দিনে মাল সরবরাহ করিবে এই সর্তে ব্যবসায়ীকে আগাম টাকা দিলাম কিন্তু সে যদি মাল সরবরাহ না করে তাহা হইলে সে টাকা ফিরত দিতে আইনত বাধ্য থাকিবে; অবশ্য চুক্তি সমাজবিরোধী হইলে চলিবে না।

[**ছয়**] **ধর্মাচরণের ও বিবেকের অধিকার (Right to Freedom of Religion and Conscience):** প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই ধর্ম এবং বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে। রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না বা জোর করিয়া কাহারো উপর কোন বিশেষ ধর্মমত চাপাইতে চেষ্টা করিবে না। রুশো যথার্থই বলিয়াছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মের সহিত নাগরিকের কর্তব্যের দ্বন্দ্ব বাধিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে।

[**সাত**] **পরিবার গঠনের অধিকার (Right to Family):** পরিবার সমাজ জীবনের ভিত্তি। পরিবার গঠনের অধিকার ব্যাহত হইলে সমাজ বিনষ্ট হইবে। প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী পরিবার গঠনের অধিকার আছে। পরিবার গঠনের অধিকার বলিতে নিজের ইচ্ছানুসারে বিবাহ এবং সন্তানের

জন্ম দিবার অধিকার বুঝায়। কিন্তু এই অধিকারও নিরংকুশ বলা চলে না। উন্মাদ, বিকলাংগ, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকার করা যায় না। অভিভাবক নির্বাচনে সন্তানের কোন হাত থাকে না বলিয়া সন্তানকে সমাজ জীবনে উপযুক্ত স্থান পাইতে যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহা অভিভাবকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অধ্যাপক লরিমার যথার্থই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিবে না তাহার বিবাহ করিবার কোন অধিকারও থাকিতে পারে না।

[আট] **ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (Right to Education, Culture and Language):** বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই অবাধে তাহার মাতৃভাষা চর্চ্চার অধিকার পাইবে, রাষ্ট্র সকল ভাষার প্রতিই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে এবং ভাষার বিভিন্নতার জন্য নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাইবে না। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশ করিতে পারে না বলিয়া প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকার থাকিবে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হইয়াছে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

[নয়] **আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law):** সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ এবং সমান অধিকারের ব্যবস্থা করাই হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ, সরকারী কর্মচারী-বেসরকারী কর্মচারী সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights):

[এক] **ভোটাধিকার (Right to Vote):** নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। বর্তমান যুগে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের আদর্শ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য নাবালক, গুরুতর অপরাধী, দেউলিয়া, উন্মাদ এবং বিদেশীদের এই অধিকার দেওয়া হয় না।

[দুই] **নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকার (Right to be Elected):** নাগরিকের শুধু নির্বাচন করিবার অধিকারই নাই, তাহার নির্বাচন-প্রার্থী হইবার অধিকারও আছে। অবশ্য একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছিলে তবেই এই অধিকার পাওয়া যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তিকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

[তিন] **আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition):** রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে সে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে একক বা যৌথভাবে আবেদন জানাইতে পারে।

[চার] **সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার** (**Right to hold Public Office**): যোগ্যতা অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকুরী পাইবার সমান অধিকার আছে। এই নীতি অনুসরণ করিলে তবেই গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ সংরক্ষিত হয়। অবশ্য কোন কোন রাষ্ট্রে এই বিষয়ে নাগরিকদিগের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। পাকিস্তানে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভারতেও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

[পাঁচ] **বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় নিরাপত্তার অধিকার** (**Right to Protection while staying abroad**): বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় ব্যক্তির প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করা হইলে সে প্রথমে বিদেশী সরকারের নিকট প্রতিকার দাবী করিবে কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ হইতে কোনরূপ প্রতিকার না পাইলে নিজ রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানাইবে।

নাগরিক কর্তব্য (**Duties of a Citizen**): অধিকারের মত কর্তব্যও দুই ধরনের—নৈতিক কর্তব্য এবং আইনগত কর্তব্য। যে সকল দায়িত্ব মানুষের নীতি-জ্ঞান এবং সামাজিক ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের নৈতিক কর্তব্য (Moral Duty) বলে। এই সকল কর্তব্য পালন না করিলে নাগরিককে সমাজের চোখে হেয় হইতে হয় কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিককে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। অপরপক্ষে আইনের দ্বারা নাগরিকের যে সকল কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহাদের আইনগত কর্তব্য বলে। এই সকল কর্তব্য পালন না করিলে আইন শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। নির্বাচনের সময় ভোটদান করা নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য, অবশ্য বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডে ইহা আইনগত কর্তব্য। কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য।

কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ (**Classification of Duties**): নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং মানবজাতির প্রতি কর্তব্য।

পরিবারের প্রতি কর্তব্য (**Duties to the Family**): সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হইল পরিবার। ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক সংগঠন। মানুষ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, অভিভাবকগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় এবং পরিবারই ব্যক্তির আত্মবিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। পিতামাতা শুধু

শিশুকে লালনপালনই করে না, উহার শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং পরিবারের মধ্য দিয়াই শিশু সামাজিক নিয়মকানুন ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব হইল পরিবারের প্রতি। মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী-পুত্র সকলেই যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যক্তির কর্তব্য। পুত্র-কন্যার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিলে কর্তব্যের ত্রুটি হয়।

সমাজের প্রতি কর্তব্য (**Duties to the Society**): এ্যারিষ্টটল বলিয়াছিলেন যে মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। সমাজের নিকট হইতে এই সকল সুযোগ সুবিধার পরিবর্তে সমাজের উন্নতি বিধান করার দায়িত্ব ব্যক্তির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সমাজকে রক্ষা করা এবং উহার বিধিনিষেধ মানিয়া চলা আমাদের কর্তব্য। সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে ব্যক্তি তাহার সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য (**Duties to the State**): রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, আইন মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। পরে ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মানবজাতির প্রতি কর্তব্য (**Duties towards Mankind**): মনীষী রাস্কিন বলিয়াছিলেন মানুষ তিনটি কর্তব্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে-Duty towards Parents, duty towards God and duty towards mankind. মানুষ হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকেরই মানবজাতি তথা বিশ্বমানবতার প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কর্তব্যবোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; দেশ-কাল পাত্রের সীমান্ত বন্ধন ঘুঁচিয়া গিয়াছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিভেদ ভুলিয়া, যুদ্ধ হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-নাগরিকতার "একজাতি একপ্রাণ একতার" আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য (**Duties to the State**):

(ক) **আনুগত্য** (**Allegiance**): রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয় তাহা হইলে

রাষ্ট্র তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বলিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের বিপদের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিক প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দেশ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নাগরিক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিবে। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়তা করিয়া নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে।

(খ) **আইন মান্য করা** (**Obedience of Law**): নাগরিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হইল আইন মান্য করা। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার অর্থ নাগরিক রাষ্ট্রের আইনকানুন স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিবে। সমাজের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করিয়া আইন প্রণয়ন করা হয় সুতরাং নাগরিকগণ যদি আইন মান্য না করে তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল ব্যাহত হইবে। নাগরিক শুধু নিজেই আইন মান্য করিবে তাহা নয় অপরে যাহাতে আইন মান্য করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নাগরিকের কর্তব্য। এরূপ কোন ব্যক্তি আইন ভংগ করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। অবশ্য আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য হইলেও দমনমূলক আইনও বিনা প্রতিবাদে মান্য করিতে হইবে ইহা সমর্থনযোগ্য নয়। যদি কোন আইন অকল্যাণ-কর বলিয়া মনে হয় তাহা হইলেও সরাসরি সেই আইন ভংগ করা নাগরিকের কর্তব্য নহে। এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনের পরিবর্তন সাধন করা উচিত।

(গ) **কর প্রদান** (**Payment of Tax**): ব্যক্তিরও যেমন টাকার প্রয়োজন আছে রাষ্ট্রেরও সেইরূপ টাকার প্রয়োজন আছে। বর্তমানকালে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হওয়ায় রাষ্ট্রের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমানকালে শুধুমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ নয়। বর্তমানে রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারে, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে, কৃষি-শিল্প উন্নয়নে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাস্তাঘাট নির্মাণে, বেকার সমস্যা সমাধানে সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছে। এই সকল পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র এই অর্থের একটা মোটা অংশ জনসাধারণের নিকট হইতে করবাবদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং নিয়মিতভাবে কর প্রদান করিয়া রাষ্ট্রের কার্যে সহায়তা করা নাগরিকের একটা পবিত্র কর্তব্য।

(ঘ) **অন্যান্য কর্তব্য**: নাগরিকের আরও কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে। স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী ভোট প্রদান করা নাগরিকের অন্যতম

প্রধান কর্তব্য। প্রতিবেশীর স্বার্থরক্ষা করা সুনাগরিকের একটি কর্তব্য। রাষ্ট্র কখনো কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিলে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও নাগরিকের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। নিজের সন্তান সন্ততিগণের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা নাগরিকের কর্তব্য। পরিশেষে দেশসেবাও নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য; অবশ্য এইগুলি মূলতঃ নৈতিক কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ছাড়াও নাগরিকের আরও কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে :— পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য। এইগুলি প্রধানতঃ নৈতিক কর্তব্য বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য-বিষয় নয়।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties): অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; আসলে ইহা একটি মুদ্রার দুইটি দিক ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রচলিত উক্তি হইল "অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত রহিয়াছে" ("Rights imply duties"); অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত বিজড়িত। ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে উহারা অধিকার কিন্তু সমাজের বা অন্য সকলের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে উহারা কর্তব্য। অধিকার এবং কর্তব্য উভয়েই সামাজিক অর্থাৎ উহারা সমাজের বাহিরে থাকিতে পারে না। ব্যক্তি যদি শুধু তাহার অধিকারই দাবী করে কিন্তু অপরের প্রতি তাহার কর্তব্যের অবহেলা করে তাহা হইলে পরিণামে কাহারো কোন অধিকারই থাকিবে না।

অপর কেহ যাহাতে নাগরিকের সুযোগসুবিধায় হস্তক্ষেপ করিতে না পারে সেইজন্য তাহাকে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে; আবার নাগরিকও যাহাতে অপরের অনুরূপ অধিকারে অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশ ঘটাইতে না পারে তার জন্য তাহাকে কতকগুলি দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করিতে হয়।

রাষ্ট্রে বসবাস করিলে মানুষকে দুইটি সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। প্রথম হইল রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা, অপরটি হইল অন্যান্য নাগরিকের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা। যেহেতু আমি রাষ্ট্রে একাধিক নাগরিকের সহিত সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করি সেইজন্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমার যে অধিকার আছে অন্যের সেই অধিকার আছে। "ধাক্কা না খাইয়া রাস্তায় চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তাহা হইলে তোমার কর্তব্য হইল আমার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো"। সুতরাং আমার অধিকার ভোগ করিতে হইলেই অপরের উপর একটি দায়িত্ব বা কর্তব্য আসিয়া পড়িতেছে। আমি যে অধিকার ভোগ করিতেছি অন্যেও সেই অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করা আমার কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের বাহিরে কোনরূপ অধিকার থাকিতে পারে না; রাষ্ট্রই সকল অধিকারের উৎস। যে সকল সুযোগ সুবিধা না পাইলে নাগরিক পরিপূর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিতে পারে না সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকারগুলি আইনগতভাবে বলবৎ করিবার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার স্বীকার করে এবং উহা রক্ষার ব্যবস্থা করে বলিয়াই নাগরিকের নিকট হইতে আনুগত্য, আদেশ পালন, করপ্রদান প্রভৃতি কর্তব্য দাবী করিতে পারে। সুতরাং নাগরিকের অধিকার ভোগের পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অধিকার ভিত্তি

জীবনধারণের অধিকার নাগরিকের একটি মৌলিক সামাজিক অধিকার। জীবন ধারণের অধিকারের পিছনে বাঁচিয়া থাকার কর্তব্য নিহিত রহিয়াছে। এই কারণে সকল রাষ্ট্রেই আত্মহত্যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের সহিত অপরের জীবন রক্ষা করার দায়িত্বও আসিয়া পড়িয়াছে। পরিবার গঠনের অধিকার নাগরিকের একটি মূল্যবান সামাজিক অধিকার। পরিবার গঠনের অধিকারের পিছনে সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে। স্বাধীনতার অধিকার নাগরিকের অন্যতম প্রধান সামাজিক অধিকার। এই অধিকার ভোগ করিবার সময় নাগরিকের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে অন্যেরাও যেন ওই অধিকার ভোগ করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে চিন্তা করা যায় না। কর্তব্যবিহীন অধিকার নীতিহীন উপকথার মতই মূল্যহীন ("Rights without duties are fables without morals") কর্তব্যের জগতেই অধিকারের তাৎপর্য আছে।

দশম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

॥ Different Forms of Government ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Forms of Government. Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy — Types of Democracy — Strength and Weakness of Democracy — Comparison between Democracy and Dictatorship — conditions essential to the success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governments —their strength and Weakness.

Union of State and Forms of Government — Personal and Real Union — Confederation — Federal Union — Nature and types of Federation — chief features and conditions of Federation — Merits and Defects of Federation — Alliance— Distinction between Unitary and Federal Governments.

বিষয়বস্তু : সরকারের শ্রেণীবিভাগ : একনায়কত্ব—উহার দোষ ও গুণ : গণতন্ত্র : গণতন্ত্রের রূপ : গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ : গণতন্ত্রের সফলতার উপায় : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার—এককেন্দ্রিক সরকার—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Forms of Government) : গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল হইলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক। এ্যারিষ্টটল দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন—(১) শাসকের সংখ্যা এবং (২) শাসনের উদ্দেশ্য।

শাসন ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে থাকে এবং উহার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মঙ্গল হয় তাহা হইলে উহাকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলে। শাসন ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে থাকে কিন্তু উহার উদ্দেশ্য নিজের উদ্দেশ্য সাধন হয় তাহা হইলে উহাকে স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny) বলে। শাসনক্ষমতা যদি কতিপয় ব্যক্তির হস্তে থাকে এবং উহার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মঙ্গল হয় তাহা হইলে উহাকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) বলে; কতিপয় ব্যক্তির শাসন নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হইলে উহাকে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলে। শাসনক্ষমতা যদি বহুব্যক্তির হাতে থাকে এবং উহা সাধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহা হইলে উহাকে গণতন্ত্র (Polity) বলে; কিন্তু বহুব্যক্তির শাসন নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হইলে উহাকে জনতাতন্ত্র (Democracy) বলে।

এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ

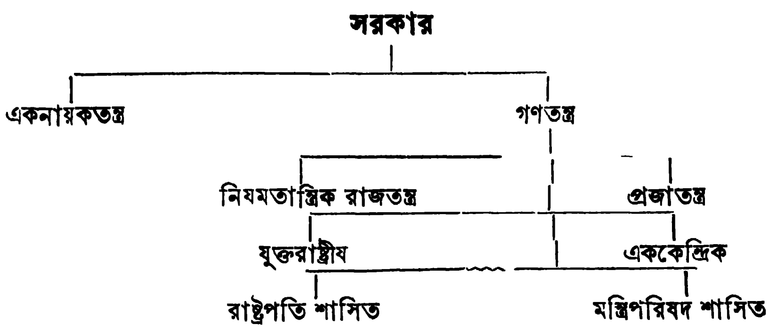
এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখানো যায় :

শাসনক্ষমতা	স্বাভাবিকরূপ	.বিকৃতরূপ
একব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
কতিপয়ব্যক্তি	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুব্যক্তি	গণতন্ত্র	. জনতাতন্ত্র

বর্তমানকালে এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ অচল। বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও উহা এ্যারিষ্টটল প্রদত্ত রাজতন্ত্রের উদাহরণ নয় কারণ উহা গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের এক সংমিশ্রণ। ইংলণ্ডে রাজা বা রাণীর নামে রাজকার্য পরিচালিত হয়, সুতরাং উহাতে রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; আবার প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে থাকায় উহাতে অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; পরিশেষে জনসাধারণের উপর সরকার নির্ভরশীল বলিয়া উহাতে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। বর্তমানকালের সরকারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ পর্যাপ্ত নয় বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ম্যারিয়ট, ষ্টিফেন লীকক প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বর্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিককালে সরকারকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের মতো নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র থাকিতে পারে অথবা ভারতের মতো প্রজাতন্ত্র থাকিতে পারে। আবার শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক হইতে পারে। পরিশেষে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন অনুসারে গণতন্ত্রকে পার্লিয়ামেণ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সুতরাং আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ হইবে।



রাজতন্ত্র (Monarchy) : যে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান চরম কর্তৃত্বের অধিকারী তাহাকে রাজতন্ত্র বলে। আদিম সমাজে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে রোমে জনসাধারণ কর্তৃক রাজাকে নির্বাচন করার প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে উত্তরাধিকার প্রথাই রাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হয়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্র হইতে পৃথক করা যায়।

রাজতন্ত্র দুই ধরনের হইতে পারে—চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or Constitutional Monarchy) চরম রাজতন্ত্রে রাজা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে রাজকার্য পরিচালনা করেন এবং তাঁহার কাজের জন্য তিনি কাহারও নিকট দায়ী থাকেন না। এই শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার কারণ ইহাতে শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই ; চরম রাজতন্ত্র বর্তমানে কোন সুসভ্য দেশে প্রচলিত নাই।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই নামান্তর, রাজা নামমাত্র শাসক। রাজার (বা রাণীর) নামে শাসনকার্য পরিচালিত হইলেও তিনি শাসন করেন না—জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ; বর্তমানে গ্রেটবৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

রাষ্ট্র বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। যে যুগে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিশেষ অভাব ছিল তখন ইহা আদর্শ হইলেও বর্তমানযুগে আর ইহাকে সমর্থন করা যায় না। যে শাসনব্যবস্থায় রাজাই সর্বেসর্বা এবং শাসিতের মতামতের কোন মূল্য নাই তাহা কাম্য হইতে পারে না। বাকল যথার্থই (Buckle) বলিয়াছেন যে জনগণ উদ্যোগী না হইলে এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী না হইলে কোন সংস্কারই সত্যকার মঙ্গলসাধন করিতে পারে না (No reform can produce real good unless it is the work of public opinion and unless the people themselves take the initiative).

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) : এ্যারিষ্টটলের মতে অভিজাততন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। ইংরেজী Aristcoracy শব্দটি Aristo (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) এবং Kratia (শাসন) এই দুইটি শব্দ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং অভিজাততন্ত্র বলিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসন বুঝায়। প্রত্যেক সমাজেই জ্ঞানী, গুণী, সম্পদশালী এবং কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অল্প বলিয়া ইহাকে মুষ্টীমেয় জনগণের শাসনও (Goverment

of the few) বলা হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের স্বার্থেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন—ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু শাসনযন্ত্র শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে ব্যবহৃত হইলে উহা বিকৃত হইয়া ধনিকতন্ত্রে (Oligarchy) রূপান্তরিত হয়।

রাজতন্ত্রের মতো অভিজাততন্ত্রও বর্তমানযুগে কোথাও প্রচলিত নাই কারণ বর্তমানের গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত উহার কোন সঙ্গতি নাই। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অভিজাততন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও কার্যতঃ জনসংখ্যার এক অতি সামান্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। গণতন্ত্র দলীয়শাসন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দলীয়-শাসন ব্যবস্থায় শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিগণই শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

গণতন্ত্রে গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু অভিজাততন্ত্রে সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক জোর দেওয়ায় ইহা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের দোষমুক্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের শাসন বলিয়া শাসনকার্য দক্ষ হইবে। কিন্তু ইহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া কাম্য হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইল, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে নির্বাচন করিবে কাহারা? জনসাধারণকে যদি মূর্খ বলা হয়, তাহাদের পক্ষে শাসকনির্বাচন করা সম্ভব হইবে না, আবার যদি তাহাদের শাসকনির্বচনের যোগ্যতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় তাহাদের অংশগ্রহণের দাবীও স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্রের সর্বদাই বিকৃত হইবার আশংকা থাকে। অভিজনগণ যদি জনসাধারণের স্বার্থচিন্তা না করিয়া নিজেদের স্বার্থচিন্তা করে তাহা হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্লুণ্টস্লি বলিয়াছেন অভিজাততন্ত্র সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। সময় বিশেষ রক্ষণশীলতা কাম্য হইলেও প্রায়শই ইহা প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে বলিয়া আদর্শ শাসনব্যবহা হইতে পারে না।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): একনায়কতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে চরম ক্ষমতা একটি ব্যক্তি অথবা দলের হাতে থাকে। একনায়কতান্ত্রিক

ধারণা

রাষ্ট্রে ব্যক্তির সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহাকে সামগ্রিক রাষ্ট্র (Totalitarian State) বলা হয়। জার্মান ভাষায় একনায়ককে "ফুরার" এবং ইতালীয় ভাষায় "ডুচে" বলে।

একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পরিবর্তে দলগত বা শ্রেণীগত কর্তৃত্বের

ভিত্তিতে গঠিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না, ব্যক্তির দেহ ও মনের উপর পরিপূর্ণ সামরিকিকরণ (regimentation) চলে; ব্যক্তি জন্ম হইতেই রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত; ("Every individual's life belongs not to him but to the State and to the State alone.") তৃতীয়তঃ, একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান হেগেলীয় রাষ্ট্র; মুসোলিনীর ভাষায়, সকলেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কেহই রাষ্ট্রের বাহিরে বা বিরুদ্ধে নয়। "(All within the State, none outside the State, none against the State)", চতুর্থতঃ, মুসোলিনীর মতে ফ্যাসিবাদ (ইতালীতে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের একনায়কতন্ত্র) শান্তিনীতি, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে। পঞ্চমতঃ, একনায়কতন্ত্র খোলাখুলিভাবে যুদ্ধবাদ প্রচার করে। জার্মানীর নাৎসীদল যুদ্ধের গুণকীর্তন করিয়া বলিত "যুদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজন" (War is a biological necessity)। মুসোলিনী বলিতেন 'আন্তর্জাতিক শান্তি কাপুরুষের স্বপ্ন—সাম্রাজ্যবাদ হইল জীবনের চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় বিধি'; 'নারীর নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও সেইরূপ কাম্য' ("War is to man what maternity is to woman"), ষষ্ঠতঃ, একনায়কতন্ত্র "বীরপূজার" (hero worship) আদর্শে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রনায়ককে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করা এবং তাহাকে অন্ধভাবে পূজা করার নীতি একনায়কতন্ত্রের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সপ্তমতঃ, একনায়কতন্ত্রে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিতে পারে না। হিটলার এবং মুসোলিনী বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া দিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিই একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল।

বৈশিষ্ট্য

পরিশেষে, সামগ্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের কোন স্থান নাই। সাম্যবাদ প্রথমে ধর্মকে নিষিদ্ধ করিয়াছিল, ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদ ধর্মকে রাষ্ট্রের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সামগ্রিক রাষ্ট্র সামগ্রিক ধর্মের শত্রু। স্পেঙ্গার বলেন, রাশিয়া ধর্মকে উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছে, মুসোলিনী উহাকে হত্যা করিয়াছে, হিটলার উহাকে করায়ত্ত করিয়া আপন স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত করিয়াছে এবং ফ্রাংকো উহাকে শোষণ করিয়াছে।

একনায়কতন্ত্রে এবং অবাধ রাজতন্ত্রে এক ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিলেও এই দুই ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, রাজতন্ত্রে রাজাই হইলেন চূড়ান্ত শাসনক্ষমতার অধিকারী অপরপক্ষে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকিলেও তাঁহার ক্ষমতার প্রকৃত ভিত্তি হইল সংশ্লিষ্ট দল। দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্র উত্তরাধিকার প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত

অর্থাৎ রাজপদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্র উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত নয়। যে ব্যক্তি দলের নায়ক হইবার যোগ্যতা অর্জন করেন তিনিই চরম ক্ষমতার অধিকারী হন।

প্রকার

একনায়কতন্ত্র তিন ধরনের হইতে পারে—সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র (ন্যাৎসী একনায়কতন্ত্রসমেত) এবং সামরিক একনায়কতন্ত্র।

সোভিয়েৎ রাশিয়ায় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র বা সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। হিটলারের অধীনস্থ জার্মানীতে এবং মুসোলিনীর অধীনস্থ ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা শান্তিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে। হিটলারের ন্যাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদের একটি বিশেষ রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হিটলারের ন্যাৎসীবাদ জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিত কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার করিত। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সমর-নায়ক চরম ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সামরিক একনাযকতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়। পাকিস্তানে আয়ুবখাঁন, মিশরের কর্ণেল নাসের প্রভৃতি সামরিক একনায়কতন্ত্রের দৃষ্টান্ত।

গণতন্ত্রের দুর্বলতাকে ভিত্তি করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে। বেকারত্ব, বাণিজ্যচক্র, ক্রয়শক্তির অভাব, উৎকট ধনবৈষম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব, মানুষের মনে সীমাহীন হতাশা, দেশব্যাপী-নৈরাশ্য এবং পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে যখন এইরূপ মনস্তত্ত্ব গড়িয়া ওঠে তখনই একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

গুণ (Merits) : একনায়কতন্ত্র যত দ্রুত সমস্যা সমাধান করিতে পারে গণতন্ত্রে তাহা সম্ভবপর নয়। সকল ক্ষমতা একটি ব্যক্তির উপর কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া অতি দ্রুত জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন করা যায়। এই ব্যবস্থায় জরুরী অবস্থায় অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে অবিলম্বে কার্যকরী করা যায়, কিন্তু প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে একনায়কতন্ত্রের এই দক্ষতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গণতন্ত্র ব্যয়বহুল কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যয়বাহুল্য সহজেই বর্জন করা যায়।

নিজদেশের উন্নতির জন্য মুসোলিনীর অবদান খুব কম নয়। দেশের বিপর্যস্ত মুদ্রাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কৃষির উন্নতি হয়, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া নগরীর পত্তন করা হয়, শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় করা হয়, পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়

এবং সমাজ জীবনের জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়। অবশ্য এগুলি মুসোলিনী শাসনের প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় জার্মানীতে ন্যাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ঘটায়। "নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ অর্থনীতি" (Perpetual war economy) অনুসরণ করিয়া হিটলার বেকার-সমস্যা সমাধান করিয়াছিলেন।

সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র রাশিয়ায় এক "নবীন সভ্যতার" জন্ম দিয়াছে। মানুষে মানুষে শোষণ, মুনাফাবাজীর জন্য উৎপাদন এবং বেকার সমস্যা আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় অতীতের বিভীষিকা।

দোষ (Defects) : একনায়কতন্ত্রের যত গুণই থাকুক ইহাকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে বা গণতন্ত্রের পরিবর্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে জরুরী অবস্থার সমস্যার দ্রুত সমাধানকল্পে একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও উহাকে চিরস্থায়ী আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস এবং নূতন সমাজব্যবস্থার জন্ম, এই দুই-এর মধ্যবর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা হইল একনায়কতন্ত্র।

এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। বিরোধী দল থাকিতে দেওয়া হয় না, ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না, সকল মানুষকে ছাঁচে ঢালিয়া একরূপ আকার দিবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির নিজস্ব মত, চিন্তা অথবা ধ্যানধারণা প্রকাশ করিবার কোন অধিকার থাকে না। এইরূপ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের চরম আত্মবিকাশ ঘটিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস ব্যালট, অপরপক্ষে একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস হইল বুলেট বা পশুশক্তি। একনায়কতন্ত্র সাম্যের পরিপন্থী; ইহা বিশ্বাস করে কতকগুলি মানুষ শাসন করিবার জন্য আর বাকী জনগণ শাসিত হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। কামানের মুহুর্মুহু গর্জন, রণহুংকার, পাশবশক্তির বিস্ফোরণ এবং অমানুষিক নৃশংসতা এই শাসনব্যবস্থার নিত্য সহচর। বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ বেকার সমস্যা একনায়কতন্ত্রী দেশে নাই সত্য তথাপি উহা কাম্য নয় কারণ কারাগারেও কোন বেকার নাই।

গণতন্ত্র (Democracy) : ইংরেজী ডিমোক্রাসি শব্দটি Demos এবং Kratia এই দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত। Demos শব্দের অর্থ 'জনগণ' এবং Kratia শব্দের অর্থ 'শাসন'; সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ডিমোক্র্যাসী বা গণতন্ত্র বলিতে জনগণের শাসন বুঝায়। এ্যারিষ্টটলের মতে গণতন্ত্র হইল বহুজনের শাসন

ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা ছিল বর্তমানকালে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এ্যারিষ্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত এবং সর্বাপেক্ষা খারাপ শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট গণতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা।

প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে গণতন্ত্র হইল এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যৌথভাবে সমাজের সকল সদস্যদিগের উপর ন্যস্ত থাকে।

সিলীর (Seeley) মতে গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাহাতে প্রত্যেকেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

ডাইসির (Dicey) মতে গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাহাতে জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করে।

লর্ড ব্রাইসের (Bryce) মতে গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতা সকলের হাতে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যতঃ উহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

রুশোর (Rousseau) মতে গণতন্ত্র হইল "জনসাধারণের ইচ্ছা" (General Will) বা শাসিতের সম্মতির প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রে জনমতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইন রচিত হয় বলিয়া ইহাকে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা (Government based on public opinion) বলা হয়।

গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়া বার্কার (Barker) গণতন্ত্রকে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সরকার (a system of government by discussion) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দিয়াছেন আব্রাহাম লিংকন (Lincoln) ; তাঁহার মতে

শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা

গণতন্ত্র হইল, "জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন" (Government of the People, by the People and for the People)।

গণতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, এই শাসনবব্যস্থায় নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে জনগণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার গঠন করিতে পারিবে; তৃতীয়তঃ, ধনী ও

বৈশিষ্ট্য

দরিদ্র ব্যক্তি, এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইবে না। চতুর্থতঃ, একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবে এবং ক্ষমতায় আসীন দলের সমালোচনা করিবার অধিকার বিরোধী-দলগুলির থাকিবে। পঞ্চমতঃ, জনসাধারণ গোয়েন্দা ও পুলিশকে ভয় না করিয়া শংকাহীনচিত্তে রাষ্ট্রে বসবাস করিতে পারিবে।

গণতন্ত্র সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক হইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক ল্যাস্কির (Laski) মতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র না থাকিলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। আমরা এখানে কেবলমাত্র গণতণের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়া আলোচনা করিতেছি।

গণতন্ত্রের রূপ (Forms of Democracy): গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ (Direct Democracy) অথবা পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক (Indirect or Representative Democracy) হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ সংখ্যায় অল্প থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা এবং বিচার কার্য সম্পাদন করিত। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা বিশাল বলিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র বহাল রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় জনগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে। প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় এবং জনমতের আস্থাভাজন থাকিলে তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি জনমত বিরোধী কাজ করিলেও পুনর্নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া নির্বাচকদিগের গত্যন্তর থাকে না। তাই রুশো বলিয়াছিলেন যে নির্বাচনের সময় ছাড়া ইংরেজেরা অন্য কোন সময়ে স্বাধীন নয়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের এই অসুবিধা দূর করিবার কয়েকটি পন্থা আছে, ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলে; ইহারা হইল গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall).

গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

সকল আইন পাশ করিবার পূর্বে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা উহা অনুমোদন করিয়া লওয়াকে গণভোট বলে। গণউদ্যোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক প্রয়োজনীয় আইন পাশ করাইবার জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দিতে পারে। জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে কোন প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই নির্বাচকগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে তাহাকে পদচ্যুতি বলে।

গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ (Merits and Defects of Democracy):

ণতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহাতে প্রত্যেকের স্বার্থ চিন্তা করা হয়। প্রত্যেককে মান মর্যাদা এবং সুযোগ দেওয়া হয়, কাহাকেও উপেক্ষা করা হয় না। অবশ্য হার অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্র প্রত্যেকের ইচ্ছাকেই বাস্তবে রূপ দিবে—কোন াজব্যবস্থাতেই তাহা সম্ভব নয়। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, ধনীব্যক্তির মত কাশের যতখানি স্বাধীনতা থাকিবে সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও মত প্রকাশের ঠিক তখানি স্বাধীনতাই থাকিবে। গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা কারণ ইহা শ্রেষ্ঠ নাগরিক ৃষ্টি করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী তাহাদের কাজের জন্য জনগণের কট দায়ী থাকেন। ইহা সতত জনগণের নিয়ন্ত্রণ এবং সমালোচনার অধীন থাকে লিয়া ইহাকে জনমত অনুসারে চলিতে হয়, তাই সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার হয়, গণতন্ত্রে জনগণ াসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতি হয়। র্ড ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিলাভের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব ম্মানিত হয়। সি. ডি. বার্নসও (Burns) বলিয়াছেন, সকল সরকারই এক শিক্ষাপদ্ধতি কিন্তু আত্মশিক্ষাই শ্রেষ্ঠশিক্ষা, সুতরাং গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ সরকার কারণ হা স্বয়ংশাসিত সরকার।

চতুর্থতঃ, মিলের মতে সকল ব্যক্তির অধিকার এবং স্বার্থ অন্যান্য সরকার অপেক্ষা গণতন্ত্রেই অধিকতর সুরক্ষিত হইতে পারে কারণ সে উহা রক্ষা করিবার জন্য ংগ্রাম করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্র সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের ধ্যে যে সম্পর্ক তাহা প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। শাসিতও যোগ্যতা অর্জন করিয়া াসকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না যে কতকগুলি লোক চিরকাল শাসন করিবার জন্য আর কতকগুলি লোক চিরকাল শাসিত হইবার জন্য ন্মগ্রহণ করে।

ষষ্ঠতঃ, নীতিগত দিক হইতে বিচারেও গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র, াম্য, স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা মানুষকে মহান রিয়া তোলে। ইহা স্বয়ংনির্ভরশীলতা, সততা, উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ৃষ্টির বিশেষ সহায়ক। মিল বলিয়াছেন যে ইহা এক উন্নত এবং সুমহান জাতীয় রিত্রের বিকাশসাধন করে। ব্যক্তির আশা ও আকাংখা গণতন্ত্রে মূর্ত হইয়া ওঠে। ত সহজে গণতন্ত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর অন্য কোন সরকারে তত হজে তাহা সম্ভব নয়।

সপ্তমতঃ, গণতন্ত্র দেশপ্রেম জাগাইয়া তোলে। যে লোকের ভোটাধিকার না[ই] সে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িবে। কিন্তু যখনই ব্যক্তি উপল[ব্ধি] করিতে পারে যে, জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে সরকারকে পরিবর্তন কর[া] যাইবে তখনই সে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী হইবে। বলা হয় যে, ফরাসীদেশে[র] জনগণ বিপ্লবের পূর্বে দেশকে ভালবাসিত না ; বিপ্লবের পর জনগণ যখন শাসনকা[র্যে] অংশগ্রহণের অধিকার পাইল তখনই তাহারা দেশকে প্রথম গভীরভাবে ভালবাসি[তে] শিখিল।

পরিশেষে. গণতন্ত্রে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকায় বিপ্লবের আশংকা খুব ক[ম] থাকে। জনগণ জানে যে প্রয়োজন হইলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বর্তমান সরকারে[র] পরিবর্তন করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারিবে তাই রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাই[য়া] পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

গণতন্ত্রের উদ্যোক্তারা উহার সম্পর্কে যে উচ্চ আশা পোষণ করিতেন কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র তাহা পূরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি

অনেক সমালোচকের মতে গণতন্ত্র হইল অশিক্ষিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন জনতার শাসন। এ্যারিষ্টটলের মতে ইহা বিকৃত শাসনব্যবস্থা ; মিল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার আশংকা করিয়াছিলেন ; লেকীর (Lecky) মতে গণতন্ত্র হই[ল] স্বাধীনতার বিরোধী ; বহু সমালোচকের মতে গণতন্ত্র যোগ্যত[া] অপেক্ষা সংখ্যার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বিশে[ষ] দক্ষতা, সুচিন্তিত অভিমত, এবং বিশেষজ্ঞের জ্ঞান, গণতন্ত্রে ইহাদের কোনই ম[ূল্য] নাই। গণতন্ত্র এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে একজন লোক ও অপর যে কোন আ[র] একজন লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহার ফলে, লেকী বলেন, কার্যত[ঃ] গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, অশিক্ষিত, অযোগ্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির শাস[নে] পরিণত হয় কারণ উহারাই সংখ্যায় অধিক। গণতন্ত্র সংখ্যার মহিমা কীর্ত[ন] করে। মানুষের যোগ্যতার বিচার না করিয়া গণতন্ত্র শুধুমাত্র মাথা গণনা করে[;] এই শাসন ব্যবস্থা কখনোই দক্ষ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র দল প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দলপ্রথার কুফলগুলি ইহাতে দেখা দেয়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ অনেক সময় প্রাধান্য লাভ করে ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও অলীক বলি[য়া] সমালোচকেরা মনে করেন। রুশো যথার্থই বলিয়াছিলেন যে একমাত্র নির্বাচনে[র] সময় ছাড়া ইংরেজরা আর কখনো স্বাধীন নয় অর্থাৎ একবার প্রতিনিধি নির্বাচি[ত]

হয় গেলে পুনর্নির্বাচন না আসা পর্যন্ত জনগণের কিছুই করিবার থাকে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করিবে বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। প্রতিনিধিরাও দলগত নিয়মশৃঙ্খলার অধীন এবং অনেক সময় তাহারা নির্বাচকমণ্ডলী অপেক্ষা সংবাদপত্র এবং কায়েমী স্বার্থকেই অধিক গুরুত্ব দেয়।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে "বন্য, সাধারণ এবং স্থূল" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। গণতন্ত্রে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না বলিয়া সাহিত্য-বিজ্ঞান ও কলার কোন উন্নতি হয় না, সভ্যতার মান অধঃগামী হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে।

পঞ্চমতঃ, কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দিয়া আসলে ধনিকতন্ত্র গড়িয়া তোলে। ট্যালিরাণ্ড (Talleyrand) এইজন্য গণতন্ত্রকে "দুরাত্মাদের অভিজাততন্ত্র" (Aristocracy of blackguards) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ল্যাস্কি (Laski) যথার্থ ই বলিয়াছেন অর্থ নৈতিক সাম্য ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অর্থহীন।

ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক নীতিতে স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনগণের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন ঘটিলেই সরকারের নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিবে। হেনরী মেনের (Henry Maine) মতে স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের একটি প্রধান দুর্বলতা।

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার অতি মন্থরগতি বলিয়া জরুরী অবস্থায় বা বিপদের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়। একনায়কতন্ত্রে যত দ্রুত অর্থ নৈতিক প্রগতি হইতে পারে গণতন্ত্রে তাহা সম্ভব হয় না। অনেকের মতে অর্ধোন্নত দেশ গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল নয়।

পরিশেষে, গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসন বলিয়া অভিযোগ করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত সংগঠন, প্রচার এবং ঘন ঘন নির্বাচনের জন্য প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। অর্থ ব্যতীত সময় ও সুযোগেরও যথেষ্ট অপচয় হয়। যে কাজ একজন লোকে একদিনে করিতে পারে গণতন্ত্রে তাহা সাতজন লোক সাতদিনে করে।

গণতন্ত্রের সফলতার উপায় (Conditions for the Success of Democracy): গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সততা, শিক্ষা, চরিত্রগুণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার উপর।

মিলের সর্ত — মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে তিনটি সর্তের উপর: প্রথমতঃ, জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত মনোভাব এবং ক্ষমতা থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র ইহাকে গ্রহণ করিলেই

চলিবে না,ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতে হই... তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে বজায় রাখিতে হইলে নাগরিকগণকে যথাযথভাবে নিজ ... কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

অধ্যাপক হার্ন্‌শ (Hearnshaw) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত স... গুলির উল্লেখ করিয়াছেন: (১) সততা এবং সম্মানের উচ্চ মান প্রয়োজন; উ... মানের বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের ... অপরিহার্য। (২) জনগণের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধিবিবেচ... অভাব দেখা দিলে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রে পরিণত হইবে। (৩) জনমত, সংবেদনশীল সমাজ চেতনা, এবং সক্রিয় সাধারণ ইচ্ছা—গণতন্ত্রকে স... করিতে ইহারা অপরিহার্য। গণতন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার ব... উহা প্রচলিত জনমত অপেক্ষা ভালো বা খারাপ হইতে পারে না; সতর্ক ... বিচক্ষণ জনমত গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় সর্ত।

হার্ন্‌শব সর্ত

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল করি... হইলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজ...

ল্যাস্কি

লর্ড ব্রাইসের মতে গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে সুনাগরিকের সংখ্যা ... করিতে হইবে, এবং সুনাগরিকতার পথে যে সকল প্রতিব... আছে তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে।

ব্রাইস

অধ্যাপক গার্ণার গণতান্ত্রিক সাফল্যের কারণ হিস... নিম্নলিখিত সর্তগুলির উল্লেখ করিয়াছেন:

গার্ণার

(১) প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা; (২) উচ্চ নৈতিক মান; (৩) রাষ্ট্রনৈ... ব্যাপারে শিক্ষাদান, (৮) দেশের কাজে আগ্রহ, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, যৌথ দা... সম্পর্কে সচেতনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করিবার মতো মনোভাব ... সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারকে যোগ্য মর্যাদা দান।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (The Future of Democracy): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ... সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাশিয়া, ইতালী, জার্মা... স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে একের পর এক একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটি... লাগিল। গণতন্ত্র নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হইল। সকলের মনে একটাই ... বারবার উচ্চারিত হইল, একটাই আশংকা বারবার উঁকি দিল—গণতন্ত্র কি টিকি... গণতন্ত্রকে এখন আর শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়া সকলে মানিতে চায় না। দক্ষ... মানদণ্ডে বিচার করিলে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র শ্রেয় কিন্তু তবুও একনায়ক...

কখনোই গণতন্ত্রের বিকল্প হইতে পারে না—ইহা সাময়িক শাসন ব্যবস্থামাত্র. চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিবে কারণ একমাত্র গণতন্ত্রেই ব্যক্তির আশাআকাংখা মূর্ত হইয়া উঠে। সি. ডি. বার্ণসের ভাষায় বলা যায় যে, "প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র যে ত্রুটিপূর্ণ ইহা অনস্বীকায; কিন্তু মোটরগাড়ী যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তাহা হইলে গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাওয়া মূর্খতামাত্র।"

লয়েড জর্জ (Lloyd George) যথার্থই বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র যদি সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না করিতে পারে এবং মানুষকে শোষণের হাত হইতে মুক্ত না করিতে পারে তাহা হইলে উহা টিঁকিবে না। গণতন্ত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা থাকিতে পারে কিন্তু মানুষ এখনো উহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। টি ভি. স্মিথের (Smith) ভাষায় বলা যায়, "মানুষ যদি স্বর্গলাভ করিতে না পারে, কিন্তু নরক এড়াইবার উপায় তাহার জানা থাকে তাহা হইলে হতাশ হইবার কারণ নাই।" মানুষের ভবিষ্যতই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government): পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা দায়িত্বশীল সরকার বলে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় একজন রাষ্ট্রপ্রধান (যেমন ভারতে রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডে রাজা অথবা রাণী) থাকে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই আইনসভার সদস্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন; মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্য আইনসভা তথা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী থাকে বলিয়া ইহাকে দায়িত্বশীল শাসন বলে। আইনসভা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে: প্রথমতঃ এই ধরনের সরকারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয় কিন্তু তিনি শাসনকায পরিচালনা করেন না। গ্রেট বৃটেন এবং ভারতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন যথাক্রমে রাজা (বা রাণী) এবং রাষ্ট্রপতি কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রীর অধিনায়কত্বের মন্ত্রিপরিষদ। নিয়মতান্ত্রিক শাসক রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।

বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রিসভাকে তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। সাধারণতঃ যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের

মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক উত্থাপিত আইনের প্রস্তাবগুলি সহজেই আইনসভায় পাশ হইয়া যায়। আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতার জন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্য আইনসভা বা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট যৌথভাবে দায়ী (Collective responsibility) থাকে। বর্তমানে দ্বিপরিষদ আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা বলিতে নিম্নকক্ষের নিকট দায়িত্বশীলতা বুঝায়। কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে শুধু সেই মন্ত্রীই পদত্যাগ করিবেন না, অপর সকল মন্ত্রীও (অর্থাৎ মন্ত্রিসভাই) পদত্যাগ করিবে।

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইনবিভাগও বিচারবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ ক্ষমতা বিভাজন নীতি আদৌ প্রয়োগ করা হয় না। আইনসভাই মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে না, মন্ত্রিপরিষদও আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়া আইনসভাকে প্রভাবিত করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসভা গঠনে প্রধানমন্ত্রীই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। নির্বাচনে যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধান সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের কোনই কর্তৃত্ব নাই, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানাইতে রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, ইহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই আইনসভায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাগুলি করেন।

ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষে অবস্থান করিয়া উহাদের পরিচালনা করেন। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ নিজ নিজ বিভাগের নীতি নির্ধারণ করেন এবং বিভাগীয় কর্মচারীরা উহাকে কার্যে রূপায়িত করেন।

সপ্তমতঃ, যদি নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে বিভিন্ন দলের নেতা মিলিয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে।

গুণাগুণ (Merits and Defects) ঃ মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থার প্রধান

গুণ

গুণ হইল যে ইহাতে আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে বলিয়া অতি সহজেই প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা যায়। শাসনবিভাগীয় কার্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় অতি সহজেই আইনসভার নিকট

হইতে অর্থ মঞ্জুরীর অনুমোদন পাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক না থাকায় ওই ধরনের সুবিধা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে বলিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। আইনসভার প্রতিনিধিবর্গ জনমত বুঝিয়া মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনমতের বিরোধিতা করিলেও তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে তাঁহাকে অপসারিত করা যায় না। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার অপেক্ষা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার অধিকতর গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক বলিয়া ইহা সময়ের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে পারে। জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনমত প্রধানমন্ত্রীরও পরিবর্তন করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকেই চেম্বারলিনের স্থলে চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হইলেন। রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থায় এইরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রসারের সুযোগ রহিয়াছে। বিরোধীদল এবং নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রচার, এই শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার ফলে জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে।

পরিশেষে, যদি কোন দেশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্বীকার করিয়া গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় (যেমন গ্রেটবৃটেন) তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার তাহার বিশেষ উপযোগী হইবে।

মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কতকগুলি দোষও রহিয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহাতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের

দোষ।

অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আইন প্রণয়ন এবং শাসন ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অভিযোগ আনা হয় যে এই ব্যবস্থার ফলে আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। মন্ত্রীরা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়া তাহারা যাহা চান তাহাই পার্লিয়ামেণ্ট অনুমোদন করে।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দলীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইতে পারে। বর্তমান দলীয় নিয়মশৃঙ্খলা এরূপ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় যে সদস্যের

দলীয় নীতির সমর্থন করা ছাড়া উপায় থাকে না ; এই শাসনব্যবস্থা "নয়া স্বৈরাচারের জন্ম দিয়াছে।

চতুর্থতঃ, সমালোচকদের মতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে স্থায়িত্বের অভা রহিয়াছে। বারবার সরকারের পরিবর্তন ঘটিলে কোন দীর্ঘকালীন নীতি অনুসর করা সম্ভব হয় না। বহুদলের নেতাদের লইয়া যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (Coalitio Cabinet) গঠিত হয় তাহার স্থায়িত্ব আরও কম ; এইরূপ মন্ত্রিসভার ঘন ঘন পত ঘটিতে দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ, এই অভিযোগও আনা হয় যে জরুরী অবস্থায় এই শাসন ব্যবস্থ বিশেষ উপযোগী নয় ; ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু এই অভিযো যে ভিত্তিহীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেটবৃটেন তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

পরিশেষে, ইহাও বলা হয় যে এই শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসনভা সাধারণ লোকের হাতে ন্যস্ত হয়। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে দক্ষতা এব বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা তাহাদের নাও থাকিতে পারে। এই কারণে ইঃ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার অপেক্ষা অদক্ষ।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (**Presidential Form of Government**) রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমত স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই চরম ক্ষমতার অধিকারী এখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ বলিয়া কিছুই নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবা জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে. কিন্তু মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। মন্ত্রিগ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজ ইচ্ছানুসারে এই পরামর্শ গ্রহ করিতে পারেন আবার নাও পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থ প্রচলিত আছে।

বৈশিষ্ট্য

এই শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছেঃ প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় কো নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে রাষ্ট্রের পতি এবং শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা।

দ্বিতীয়তঃ, এই সরকার ক্ষমতা বিভাজনের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভা সদস্য নন এবং তিনি আইনসভার অধিবেশন ডাকিতে, স্থগিত রাখিতে অথব উহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। শাসনবিভাগ আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহ

:রিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ অনুসারে আইনসভা আইন পাশ করিতে াারে, আবার নাও পারে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। াষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (আমেরিকায় ৪ বছরের জন্য) ির্বাচিত হন এবং ওই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না। অবশ্য ংবিধানভংগ এবং দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগ আনিয়া রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত রা যায়; তাঁহার পুনর্নির্বাচনে কোন বাধা নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে িয়ম আছে যে, কোন ব্যক্তি দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে ারিবে না। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে। মন্ত্রিগণ াষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারীমাত্র; রাষ্ট্রপতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের ম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নহেন।

গুণাগুণ (Merits and Defects): রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার মন্ত্রিপরিষদ াসিত সরকারের ঠিক বিপরীত শাসন ব্যবস্থা বলিয়া মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারের ্রুটিগুলি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দেখা যায় না।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইল স্থায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি যে নির্দিষ্ট ়েক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না বলিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে একটি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন। সেই জন্য আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির কার্যসূচীর ়ে একটা নিরবচ্ছিন্নতা থাকে। এই স্থায়িত্বের অভাব মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের কটি বড় ত্রুটি। ফ্রান্সে যখন মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ইল তখন ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন নীতি অনুসরণ রা যাইত না।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ এবং জরুরী অবস্থায় এই শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। াসনবিভাগের সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় এবং তিনি মন্ত্রীদের হিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নন বলিয়া যত দ্রুত তিনি কাজ করিতে পারেন ন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, এই শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভাজন থাকায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের কোন স্ভাবনা থাকে না।

চতুর্থতঃ, যে দেশে বহুদল আছে সেখানে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা

লাভ করিতে পারে না, এইরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সরকার অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার সুবিধাজনক। বহু দল লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিলে উহা স্থায়িত্ব অর্জন করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন দলের সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের যেগুলি গুণ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সেইগুলিই ত্রুটি বা দুর্বলতা।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় স্বৈরাচারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। সংবিধানভংগ বা দুর্নীতিমূলক কাজ না করিলে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে পদচ্যুত করা যায় না বলিয়া তিনি স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন পাশ নাও হইতে পারে। দুইটি বিভাগের মধ্যে অনেক সময় রেশারেশি এবং সংঘর্ষ দেখা যায়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা বিভাজনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শাসন বিভাগ ও আইন-বিভাগের ক্ষমতার সীমা কি তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। বিচারবিভাগ তাহার ক্ষমতার প্রযোগ করিয়া অপর দুই বিভাগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে।

এককেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা (Unitary Government): আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু সংবিধান দ্বারা ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে বলিয়া সংবিধান অলিখিত এবং পরিবর্তনশীল হইলে কোন অসুবিধা হয় না। গ্রেট বৃটেনের সংবিধান অলিখিত। কাজের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করিতে পারে, উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে উহাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিয়াও দিতে পারে। বৃহৎ দেশের পক্ষে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী, সেইরূপ ছোট দেশের পক্ষে এককেন্দ্রি

শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, সিংহল প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

গুণাগুণ (**Merits and Defects**): এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে সারাদেশে এক ধরনের আইন এবং শাসন প্রচলিত থাকে। দেশব্যাপী একই নীতি অনুসৃত হয়। এইরূপ অবস্থায় এক আইন দুইবার পাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় একাধিক আইনসভা থাকার জন্য যে অসুবিধা তাহা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যয়সংক্ষেপ হয়। যুক্তরাষ্ট্রয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং আঞ্চলিক আইনসভা, কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক বিচার ব্যবস্থার পৃথক অস্তিত্ব থাকে বলিয়া অধিক ব্যয় হয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার, একটি আইনসভা এবং এক ধরনের বিচার ব্যবস্থা থাকে বলিয়া শাসনকার্যে ব্যয়সংক্ষেপ হয়।

তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার থাকে এবং উহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন নমনীয় সংবিধান। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইলে অনেক সময় কাম্য পরিবর্তন সাধন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

চতুর্থতঃ, জরুরী অবস্থার সময় এই ধরনের শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া এককেন্দ্রিক সরকার জরুরী অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি অনুসরণে এককেন্দ্রিক সরকারের দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ প্রায়।

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি যে ইহা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে অস্বীকার করে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার থাকিতে পারে কিন্তু উহা

দোষ

কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে কাজ করে এবং সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে সকলকেই কাজ করিতে হয় বলিয়া অধিবাসীদের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে উৎসাহ কমিয়া যায়। গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে বিচার করিলে এককেন্দ্রিক সরকারকে আদর্শ বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সমস্যাগুলির স্বরূপ দূর হইতে অনুধাবন করা কঠিন। ফলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলির দ্রুত বা উপযুক্ত সমাধান হয় না।

তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা

কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রমবিভাগের নীতিকে অস্বীকার করে বলিয়া ইহাতে দক্ষতার অভাব দেখা যায়।

পরিশেষে, বলা যায় যে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে কোন উৎসাহ থাকে না, ইহা ছাড়া শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Government)ঃ আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান দ্বারা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলি গঠিত হয় এবং উহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকে। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। বর্তমান কালে যে সব রাষ্ট্রের আয়তন অতি বিশাল (যেমন ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা) সেই সব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ, সংবিধান দ্বারা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র, ইহারা কোন মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধান দ্বারা ক্ষমতার বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের প্রাধান্য থাকে, অপর-পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভা বা অংগরাজ্যগুলির আইনসভা সংবিধানকে মানিতে বাধ্য থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রাধান্য বলিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বুঝায়ঃ (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হইবে; প্রত্যেক সরকারের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং সংবিধান লিখিত হইলে এই সুনির্দিষ্টতা থাকিবে; (খ) সংবিধান অনমনীয় হইবে। ইহার অর্থ হইল, যেভাবে সাধারণ আইন পাশ হয় ঠিক সেই পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন করা যাইবে না; উহা পরিবর্তনের জন্য এক জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; (গ) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অথবা অংগরাজ্যগুলির আইনসভা প্রত্যেকেই অ-সার্বভৌম (non-sovereign) কারণ ইহাতে সংবিধানকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের অপরিহার্য অংগ হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া কাজ করিতেছে কিনা তাহা

দেখিবার জন্য এবং কোনরূপ বিরোধের উৎপত্তি হইলে অথবা সংবিধানের কোন ব্যাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধ দেখা দিলে তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের। এই আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সংবিধানের "ব্যাখ্যাকর্তা এবং অভিভাবক" বলা হয়।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পার্থক্য অধিক হইলে বৃহৎ সদস্য রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। ভূতপূর্ব জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে প্রাশিয়ার ক্ষমতা, প্রভাব এবং আয়তনে প্রভূত পার্থক্য থাকায় জার্মান রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র বলা চলিত না।

দুইটি সর্ত

যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ হিসাবে ডাইসি দুইটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এক, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে একজাতীয় ঐক্যের ভাব বিরাজ করিবে; দুই, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের আকাংখা থাকিবে কিন্তু মিলিয়া এক হইয়া যাইবে না।

অধ্যাপক হোয়েরের (Wheare) মতেও কয়েকটি রাষ্ট্র যদি কতকগুলি বিষয়ের জন্য স্বাধীন সরকারের অধীনে মিলিত হইতে চায় আর কতকগুলি বিষয়ের জন্য স্বাধীন আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে চায় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুইটি পদ্ধতি আছে; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। এইক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিসমূহ (Centripetal force) কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানেডীয় যুক্তরাষ্ট্রের এইভাবে উৎপত্তি ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশাল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা কঠিন হইয়া পড়িলে উহাকে ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ (Centrifugal force) কাজ করে। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় সংবিধানে এই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল।

ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে বিচার করিলে যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—মার্কিণ ধরনের যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানেডীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান মারফৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রকে দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি অংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়; অপরপক্ষে ক্যানাডায় কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলিকে দিয়া বাকী ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

মার্কিন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল অপরপক্ষে ক্যানেডীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃ শক্তিশালী।

গুণাগুণ (**Merits and Defects**)**:** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষ বড় গুণ হইল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়াই পরস্পরে সহিত মিলিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে

গুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্যের সহিত আঞ্চলি স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয় সাধন করা যায়। যে সকল দেশে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন (যেমন ভারত বা সোভিয়েট রাশিয়া) সেখানে এই ব্যবস্থাতেই আঞ্চলি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে কেন্দ্র হইতে আঞ্চলিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান করা সহজ নয়। স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধানই কাম্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যার আঞ্চলিক সমাধানের সুযোগ রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি শাসনযন্ত্র থাকায় অধিকসংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুবিধা পায়। ইহা জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রসার করে।

চতুর্থতঃ, কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কাহারে উপর কাজের অত্যধিক চাপ পড়ে না। ক্ষমতা বিভাজনের ফলে যে বিশেষিকরণ (Specialisation) হয় তাহার দরুন শাসনকার্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকার ফলে কোন সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আইন এবং শাসনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো যায় কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকার থাকায় সারা দেশব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো খুবই বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মর্যাদাই শুধু বাড়ে না, নাগরিকের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ভার্জিনিয়া বা টেক্সাসের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অনেক বেশী সম্মানীয় এবং মর্যাদাব্যঞ্জক।

সপ্তমতঃ, এককেন্দ্রিক সরকারে জাতীয় সরকার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করায় উহার স্বৈরাচারী হইবার আশংকা থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকার থাকায় সরকারের স্বৈরাচারী হইবার আশংকা থাকে না।

পরিশেষে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠন করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন শেষ হইয়াছে বলিয়াই অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ মনে করেন।

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার যাহা গুণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের তাহা ত্রুটি। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল হইতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রত্যেক সরকারের ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ থাকায় ইহা দুর্বল হইতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দুর্বলতা বৈদেশিক ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকার থাকায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেক সমালোচকের মতে ইহা অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। একাধিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন থাকার জন্য শাসনযন্ত্র জটিল এবং মন্থরগতি হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। গতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজন সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইলে উহা প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং শাসনতন্ত্রের কাম্য পরিবর্তন অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় গৃহবিবাদের ভয় থাকে। কোন অঞ্চল একজোট হইয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী জানাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের পক্ষে ইহা বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া যে গৃহবিবাদ সুরু হইয়াছিল তাহার ফলে উহা দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; অবশ্য লিংকনের নেতৃত্বে পুনর্মিলন সম্ভব হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অর্ধোন্নত দেশের উপযোগী নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্ধোন্নত দেশগুলি দ্রুত উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইলে পরিকল্পনাকে কার্যকর করা বিশেষ অসুবিধা-জনক হইয়া পড়ে।

পরিশেষে, একাধিক আইনসভা থাকার দরুন একই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরস্পরবিরোধী আইন পাশ হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অংগ রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং নাগরিকদের নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

সরকারের বিভাগসমূহ

॥ Organs of the Government ॥

Relevant Portion of the Syllabus :—Structure of Government—Organisation and Functions of Legislature, Executive and Judiciary—Bicameralism—its merits and defects—Separation of Powers.

বিষয়বস্তু :—ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি—সরকারের আইনবিভাগ—শাসনবিভাগ—বিচার বিভাগ—দ্বিপরিষদ কক্ষ।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers): স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গ্রীক দার্শনিকদের লেখায় আলোচিত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের আকার ধারণ করে।

এই মতবাদের মূল বক্তব্যকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ (১) সরকারের তিনটি বিভাগ—বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ—পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবে, (২) সরকারের এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজ করিবে না; (৩) এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না এবং (৪) সরকারের এক বিভাগের অপর বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে না।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিষ্টটলের লেখায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্রের (অর্থাৎ সরকারের) কাজগুলিকে সিদ্ধান্তসংক্রান্ত (deliberative), শাসনসংক্রান্ত (magisterial) এবং বিচারসংক্রান্ত (judicial)—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন। সুশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এ্যারিষ্টটল শ্রমবিভাগের নীতি অনুযায়ী সরকারের কর্মবিভাগ করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ্যারিষ্টটলের পর রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসেরো (Cicero) এই মতবাদের আলোচনা করিয়া "ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির" উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মধ্যযুগে কোন লেখক ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোঁদার (Bodin) The Republic গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি এক নূতন রূপ লাভ করিল। বোঁদা বলিলেন রাজা স্বয়ং বিচার করিবেন না, এই দায়িত্ব তিনি স্বাধীন বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত করিবেন, নতুবা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হইবে। বোঁদার পর ইংরাজ দার্শনিক লকের (Locke) Civil Government গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্তা হইলেন ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু (Montesquieu) (১৭৮৯-১৭৫৫) ; তাঁহার নামের সহিত ইহা অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার লেখা "L'esprit-des Lois" (The Spirit of Law) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদ বিশদভাবে আলোচনা করেন। মন্তেস্কু বলিলেন, আইনসংক্রান্ত এবং শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকিতে পারে না কারণ তাহা হইলে একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ পীড়নমূলক আইন প্রণয়ণ করিয়া উহাকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিবে ; আবার বিচারবিভাগ আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ হইতে পৃথক না হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে কারণ বিচার ও আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে সে স্বৈরাচারী হইয়া উঠিবে। যখন আইনসংক্রান্ত, শাসনসংক্রান্ত এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের উপর ন্যস্ত থাকে অর্থাৎ যখন রাজা আইন প্রণযন করে, আইনকে বলবৎ করে এবং আইনের ব্যাখ্যা করে তখন ব্যক্তির বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে মন্তেস্কু ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকবণ নীতির সমর্থন করেন। মন্তেস্কু যে সময় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন (১৭৪৮ সালে) তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন স্বৈরাচারী চতুর্দশ লুই। সেই যুগে ফ্রান্সে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না বলিলেই চলে। ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া ওই দেশে স্বাধীনতাব স্বরূপ দেখিযা মন্তেস্কু বিস্মিত হইযা পড়েন। তাঁহার ধারণা হইল ক্ষমতা স্বতন্ত্রকিরণ নীতিই ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি আর উহার অভাবেই ফ্রান্সে জনগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মন্তেস্কুর পর ইংরেজ আইনজ্ঞ ব্ল্যাকস্টোনও (Blackstone) ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমর্থন করেন।

সমালোচনা (Criticism) : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি তদানীন্তন ফ্রান্স এবং মার্কিন শাসনতন্ত্রে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের গণপরিষদ ঘোষণা করে, যে দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ গ্রহণ করা হয় নাই, সে দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়। মার্কিন লেখক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (Alexander Hamilton) ঘোষণা করেন যে আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার-বিভাগের ক্ষমতাসমূহকে একত্র করিয়া রাখাকে স্বৈরাচারের সংজ্ঞা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মেক্সিকো, আর্জেন্টাইনা, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রেও এই মতবাদ গৃহীত হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়।

প্রথমতঃ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। সরকারের বিভাগগুলি পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত যে ক্ষমতা বিভাজনের সূক্ষ্ম নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সংবিধান রচয়িতাগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সেখানেও সরকারের এক বিভাগের কাজ অপর এক বিভাগ করিয়া থাকে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন (যেমন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে দলের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানাইবার সময় উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেন), সেনেট (অর্থাৎ আইনসভার উচ্চ পরিষদ) রাষ্ট্রপতির কয়েকটি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে আবার সুপ্রীম কোর্টও মতপ্রকাশের দ্বারা আইন প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রি-পরিষদ শাসনব্যবস্থা ক্ষমতা-স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পরিপূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্ভবপর, তথাপি উহাকে কাম্য বলিয়া মনে করা হয় না। বিভিন্ন বিভাগকে স্বতন্ত্র করিলে সহযোগিতার অভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে। হাত যেমন মুখের সহিত সহযোগিতা না করিলে মুখে গ্রাস তোলা সম্ভব নয়, সেইরূপ সরকারের তিনটি বিভাগের পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করিবে। এক বিভাগ অপর বিভাগের সহিত প্রতিযোগিতা করিলে, এক বিভাগ অপর বিভাগকে ঈর্ষা করিলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব দেখা দিবে।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সরকারের তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু ইহা সত্য নয়। আইনবিভাগ আইন প্রণয়ন না করিলে শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের কিছুই করণীয় থাকে না। আইন বিভাগই অপর দুইটি বিভাগ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী।

চতুর্থতঃ, মন্তেস্কু ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হিসাবে দেখিয়াছিলেন। মন্তেস্কুর ধারণা হইয়াছিল যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্যই ইংলণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে, আর উহার অভাবেই ফ্রান্সে ব্যক্তি স্বাধীনতা নাই। কিন্তু মন্তেস্কু ভুল করিয়াছিলেন; কোনদিনই ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতিকে সমর্থন করা হয় নাই বরং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের অভাবই

খানকার শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি স্বাধীনতার ;ত্তি হইতে পারে না—স্বাধীনতা নির্ভর করে জাতীয় চরিত্রের উপর।

পঞ্চমতঃ, অনেক লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকারের কাজ ;নটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। কাহারো কাহারো মতে সরকারের কাজ-লিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, (১) আইন বিভাগ, (১) বিচার বিভাগ,) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীগণ এবং) নির্বাচক মণ্ডলী।

সমালোচনা তত্ত্বেও এই মতবাদকে একেবারে মূল্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া য় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার য়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নাই। অবশ্য অন্য পদ্ধতিতেও এই উদ্দেশ্য সফল করা য়, যেমন বিচারকের চাকুরীর নিরপত্তা, উপযুক্ত বেতন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

একদা রাজার এবং পরবর্তীকালে পার্লমেণ্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই মতবাদের ল্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে এরূপ কোন বিপদের আশংকা নাই। গণতান্ত্রিক দেশে াষ্ট্রনৈতিক দলের ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং আমলাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ প্রয়োজন। যে দেশে একনায়কতন্ত্রী সরকার রহিয়াছে সেখানে দল এবং নেতার স্বৈরাচার হইতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানকালের এই ুই ধরনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and gainst a Second Chamber): আইনসভা দুই ধরনের হইতে পারে। একটি কক্ষ লইয়া আইনসভা গঠিত হইলে উহাকে এক পরিষদ আইনসভা (Unicameral Legislature) বলে। আর আইন সভার দুইটি কক্ষ থাকিলে তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা (Bicameral Legislature) বলে। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় যে কক্ষ বা পরিষদটি জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় তাহাকে নিম্নকক্ষ (Lower House), প্রথমকক্ষ (First Chamber) অথবা জনপ্রিয়কক্ষ (Popular Chamber) বলে। অপর কক্ষটিকে উচ্চকক্ষ (Upper House) বা দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) বলা হয়।

দ্বিতীয় কক্ষের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করা হয়: প্রথমতঃ, আইনসভায় দুইটি কক্ষ থাকিলে তবেই সুচিন্তিতভাবে দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা রিয়া আইন প্রণয়ন করা যায়। নিম্নকক্ষ জনমতের চাপে বা সাময়িক উত্তেজনার বর্তী হইয়া আইন পাশ করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে সেখানেও বিলটি ালোচিত হয় এবং ইহার ফলে যে কালক্ষেপ হয় তাহাতে অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী াবেগের আতিশয্য বা সাময়িক ভাবপ্রবণতা অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনা-

প্রসূত আইন প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি করিয়া উন্নত আইন প্রণয়নে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা নাগরিকগণকে একপরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। জনস্টুয়ার্ট মিল এবং লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি লেখকগণের মতে একপরিষদ বিশিষ্ট আইনসভার স্বৈরাচারী হইবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। আইনসভা যাহাতে ক্ষমতাগর্বিত, স্বৈরাচারী এবং নীতিভ্রষ্ট না হইতে পারে তাহার জন্য সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন। সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পরিষদ পরস্পর পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বিশেষভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় আইনসভার কাজের পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভায় একটি মাত্র কক্ষ থাকিলে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, এই জন্য দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে কাজের সুবিধা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি দ্বিতীয় কক্ষে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যায় বলিয়া নিম্নপরিষদ উচ্চ পরিষদের বিশ্লেষণ ও আলোচনা জানিয়া অযথা কালক্ষেপ না করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্তে আসিতে পারে।

চতুর্থতঃ, দ্বি-পরিষদ আইনসভায় সকল শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব সহজেই করা যায়। এরূপ বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে চাহেন কিন্তু নির্বাচনে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হীন বলিয়া মনে করেন। মনোনয়নের মাধ্যমে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় ইহাদের দেশের আইনসভায় স্থান করিয়া দেওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চপরিষদ বা রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত কয়েকজন সদস্য থাকিবেন। ইহারা শিল্পকলা, সাহিত্য, সমাজসেবা, বিজ্ঞান প্রভৃতি কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন।

পঞ্চমতঃ, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হয়। দ্বিতীয় পরিষদে সকল বিলের আলোচনা ও তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্র মারফৎ ইহা জনগণের কর্ণগোচর হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের সকল দিক জনগণ বুঝিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী ব্যক্তিগণ লইয়া দ্বিতীয় পরিষদ গঠিত হয়। অপরপক্ষে প্রথম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ, অল্প-বয়স্ক এবং আবেগপ্রবণ। যদিও প্রথম পরিষদের তুলনায় দ্বিতীয় পরিষদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই তথাপি ইহার সদস্যগণ তাহাদের বিদ্যাবত্তা এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠতার জন্য অপর পরিষদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

সপ্তমতঃ, দ্বি-পরিষদের অস্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই কক্ষের সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষের

দস্যগণ অংগরাজ্যগুলির অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় াসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্যের সহিত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধন করা হয় লিয়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ইহার বিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয় কক্ষের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমতঃ লা হয় ইহা অনাবশ্যক এবং অর্থহীন। ফরাসী লেখক আবে সিয়ের (Abbe Sieyes) ক্তিটি এইরূপ: যদি দ্বিতীয় পরিষদ প্রথম পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক, আর যদি একমত না হয় তবে উহা অনিষ্টকর।" ("If the second hamber agrees with the first, it is superfluous, if it disagrees it is pernicious.") গণতন্ত্রকে যদি জনগণের শাসন বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নিম্ন পরিষদই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পরিষদ দ্বারা ইহার কাজে বাধার সৃষ্টি করা অগণতান্ত্রিক বলিয়া অকাম্য)। এস. এস. আয়েংগারের (Iyengar) মতে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা একটি অতি প্রাচীন এবং যুগ-জীর্ণ মতবাদ। তাঁহার মতে গণতন্ত্রের উপর অবিচল আস্থার অভাব এবং সংখ্যালঘিষ্ঠকে সন্তুষ্ট করার আকাংখাই দ্বি-পরিষদের অস্তিত্বের কারণ। (জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের দুইটি পথের প্রয়োজন আছে এ যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। গণতন্ত্র দুই মুখে কথা বলিতে পারে না—একই বিষয়ে দুইটি মত প্রকাশ করিতে পারে না। ফ্রাংকলিন (Franklin) বলিয়াছেন যে, দ্বি-পরিষদ আইনসভা পরস্পর বিপরীতগামী অশ্ব ও অশ্বযানের মত এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিপরিষদব্যবস্থায় আইনসভায় দায়িত্ব দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এক কক্ষ অপর কক্ষের উপর দোষারোপ করিয়া দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে। অনেক লেখকের মতে এই ব্যবস্থায় দায়িত্বের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা অযথা ব্যয়বহুল। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদের বেতন ও ভাতা বাবদ যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়া থাকে। কার্যতঃ দ্বিতীয় পরিষদের কোন ক্ষমতা নাই, অথচ ইহা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয়।

চতুর্থতঃ, উচ্চ পরিষদ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ইহার দরুন বৃহত্তর জনস্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ইহা গণতন্ত্রের দিক হইতে আদর্শ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ বিত্তশালী এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হন; উদাহরণস্বরূপ গ্রেটবৃটেনের লর্ড সভার কথা বলা যায়। ইহা যুগোপযোগী এবং প্রগতিমূলক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন

আছে এ যুক্তিরও বিরোধিতা করা হয়। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পরিবর্তে অনেক সহজ উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায়; যেমন শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনরূপ সংরক্ষণ না দেওয়াই উচিত কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বলিতে স্বার্থান্বেষী এবং সুযোগসন্ধানী দলকে বুঝায়।

ষষ্ঠতঃ, দুইটি পরিষদ না থাকিলে অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণীত হইবে বলিয়া যে আশংকা করা হয় সে যুক্তিরও বিরোধিতা করা হয়। বর্তমানে কোন আকস্মিক আইন পাশ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। বিল পাশের কয়েকটি পর্যায় আছে—এই সকল পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসিবার সময় বিলটি পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হয়। ইহা ছাড়া বিলটি যখন আইনসভায় আলোচিত হইতে থাকে তখন সংবাদপত্রে উহার আলোচনা চলিতে থাকে। বিলের কোন বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ থাকিলে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সুতরাং উচ্চকক্ষ অপরিহার্য বলা চলে না।

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভা অপরিহার্য বলিয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন না। তাঁহার মতে অংগরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই যথেষ্ট, দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা চলে না। ফ্রান্স একপরিষদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষায় নিরাশ হইয়া পুনরায় দ্বি-পরিষদ আইনসভার প্রবর্তন করে। সাম্প্রতিক কালে গ্রীসও একপরিষদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা চালাইয়া বিশেষ সুফল লাভ করে নাই। ম্যারিয়ট দুইপরিষদ আইনসভার সমর্থনকারী। অপরপক্ষে অধ্যাপক ল্যাস্কি ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন একপরিষদ আইনসভার পক্ষপাতী।

আইনসভা (**Legislature: Its composition and functions**): আইনসভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লইয়া গঠিত আইনসভাকে একপরিষদ ব্যবস্থা (Unicameralism) বলে আর দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত আইনসভাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা বলে। দ্বি-পরিষদ আইনসভার যে পরিষদটি জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত তাহাকে নিম্নপরিষদ বা জনপ্রিয় পরিষদ বলা হয় আর অপর পরিষদটিকে উচ্চপরিষদ বা দ্বিতীয় পরিষদ বলে।

আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু আইন প্রণয়ন ছাড়াও ইহা আরও কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। আইনসভার কার্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

[এক] **আইন প্রণয়ন:** আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। প্রাচীনযুগে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন রাজার আদেশই আইনের মর্যাদা পাইত; ধর্মের অনুশাসন, প্রচলিত যুগ-প্রাচীন প্রথা এবং রাজাদেশই আইন হিসাবে চলিত। বর্তমানকালে আইনসভাই নূতন আইনের প্রবর্তন করে। আইনসভার সদস্যগণ জনমতের চাহিদার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়া আইনের খসড়া তৈয়ারী করে এবং বিল পাশের নিয়মানুসারে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভা শুধু মাত্র নূতন আইনই প্রণয়ন করে না, পুরাতন আইনের সংশোধন বা বিলোপ সাধনও করিতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে আইন প্রণয়নই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইনসভা আইন পাশ করিলে তবেই শাসনবিভাগ কর্তৃক আইনকে বলবৎ করা এবং বিচারবিভাগ কর্তৃক আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে।

[দুই] **শাসনবিষয়ক কাজ:** মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিদিগের কার্যাবলীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা আইনসভার দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইয়া পড়ে সেইজন্য তাঁহার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও আইনসভার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে আইনসভার অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। সন্ধি অনুমোদন, কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা প্রভৃতি আইনসভার শাসনসংক্রান্ত কাজ।

[তিন] **অর্থসংক্রান্ত কাজ:** সরকারী অর্থের উপরও আইনসভার প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিয়াছে। আইনসভার অনুমোদন ব্যতীত করধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাই সরকারী অর্থ নিয়ন্ত্রণ এবং তদারক করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট আইনসভায় আলোচনা এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

[চার] **বিচারসংক্রান্ত কাজ:** আইনসভার বিচারসংক্রান্তও কিছু কিছু ক্ষমতা রহিয়াছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করিতে পারে। গ্রেট বৃটেনে লর্ডসভা অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টের উচ্চকক্ষ দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

[পাঁচ] **শাসনসংক্রান্ত কাজ:** শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন, সংশোধন এবং ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আইনসভার রহিয়াছে। যে মৌলিক বিধি অনুসারে সরকার শাসন কার্য পরিচালনা করে তাহাকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলে। সুইজারল্যাণ্ডের

জাতীয় আইনসভা ওই দেশের শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

[ছয়] **আলোচনা সংক্রান্ত কাজ :** জনসাধারণের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যার প্রতি সরকারের দৃটি আকৃষ্ট করাও আইনসভার কাজ।

শাসনবিভাগের গঠন ও কার্যাবলী (The Executive : Organisation and Functions) : আইনসভার নিয়মানুযায়ী যাঁহারা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন তাহাদের সকলকে লইয়া সরকারের শাসনবিভাগ গঠিত। শাসনবিভাগের কর্মকর্তাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—শাসকগোষ্ঠী (Executive) এবং প্রশাসন কৃত্যক (Administrative); শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশানুসারে প্রশাসন কৃত্যকগণ কাজ করিয়া থাকেন।

শাসনবিভাগ বিভিন্ন নীতি অনুসারে গঠিত হইতে পারে। সকল রাষ্ট্রেই শাসন-ব্যবস্থা একজন প্রধান কর্মকর্তার (Chief Executive) নামে পরিচালিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকায় রাজপদ উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করা হয় এবং রাজাই প্রধান কর্মকতা কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতে সাধারণতন্ত্রী (Republic) দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছেন, তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে মন্ত্রিপরিষদের উপর। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্যদিগের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসনকর্তা। তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী থাকেন বটে কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রহিয়াছে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপারষদশাসিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ মূল নীতি নির্ধারণ করে আর উহাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্র কৃত্যকদিগের (Civil servants)। শাসকবর্গের সহিত রাষ্ট্রকৃত্যকদিগের পার্থক্য হইল যে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ স্থায়ী কর্মচারী, অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন অর্থাৎ অস্থায়ী। নির্বাচনের মাধ্যমে এক দলের শাসন পরিবর্তিত হইয়া অপর এক দলের শাসন প্রবর্তিত হইতে পারে। সরকারের এই পরিবর্তনের মধ্যেও শাসনবিভাগের কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন রাষ্ট্রকৃত্যকগণ। শাসকবর্গ দলীয় রাজনীতির সহিত জড়িত কিন্তু রাষ্ট্রকৃত্যকগণ দলগত রাজনীতির উর্ধে

থাকিয়া কার্য পরিচালনা করিয়া যান ; নিরপেক্ষতা ইহাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফৎ রাষ্ট্রকৃত্যকদিগকে নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রকৃত্যকদিগের নিয়োগের দায়িত্ব একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইহা শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবে। শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রকৃত্যকগণ পরিচালনা করেন বলিয়া ইহাকে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) বলে। শাসনবিভাগ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে।

শাসনবিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive) ঃ

[এক] **আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা ঃ** দেশাভ্যন্তরে আইন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী রাখিতে হয়, আইন ভংগকারীকে বিচার বিভাগের সম্মুখে উপস্থাপিত করা এবং বিচার বিভাগের রায় অনুযায়ী শাস্তি দানের ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের কাজ। ইহা ব্যতীত, নিম্নতন কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদল, রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিযমাবলী প্রণয়ন, তাহাদের পদোন্নতি এবং পদচ্যুতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরী অবস্থায় সাময়িক আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি প্রভৃতি শাসন বিভাগের কার্য। শাসন বিভাগের যে দপ্তরের উপর এই সকল কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলে।

[দুই] **পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কাজ ঃ** পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কাজকে শাসন বিভাগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা উহা ছিন্ন করা, অন্য রাষ্ট্রে দূত নিয়োগ করা, অন্য রাষ্ট্র হইতে দূত গ্রহণ করা, অন্য রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা ইত্যাদি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলী। শাসনবিভাগের যে দপ্তরের উপর এই সকল কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তাহাকে পররাষ্ট্র দপ্তর (Department of External Affairs) বলে।

[তিন] **যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত কাজ ঃ** সাধারণতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধ পরিচালনার ভার শাসনবিভাগের হাতেই ন্যস্ত থাকে। বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিবার ভারও এই বিভাগের। ভারতের রাষ্ট্রপতি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসনবিভাগের যে দপ্তরের উপর যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বলে। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা দপ্তরের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

[চার] **বিচারসংক্রান্ত কাজঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করিয়া থাকেন। বিচারালয়ে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া শাসনবিভাগ বিচারসংক্রান্ত কাজ করিয়া থাকে। অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে সেই পদচ্যুত ব্যক্তি প্রতিকারের জন্য শাসনবিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারে। এই ধরনের আবেদনের বিচার শাসনবিভাগ করিয়া থাকে। এই ধরনের বিচারকাজকে শাসন-বিভাগীয় বিচার (Administrative justice) বলা হয়। ইহা ছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর অন্যায়ভাবে কর ধার্য করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে শাসনবিভাগের নিকট আবেদন দাখিল করা যায়।

[পাঁচ] **অর্থসংক্রান্ত কাজঃ** কর ধার্য এবং অর্থব্যয় করিতে হইলে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থসংগ্রহ এবং অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে শাসনবিভাগ। মন্ত্রিপরিষদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সদস্যগণই আইনসভায় অর্থ বিল উত্থাপন করিতে পারে। বাজেট পাশ করাইবার কঠিন দায়িত্ব শাসন বিভাগই পরিচালনা করিয়া থাকে। করধার্য বা অর্থব্যয় করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় অর্থের হিসাব পরীক্ষার দায়িত্বও এই বিভাগকে বহন করিতে হয়। শাসন বিভাগের যে দপ্তর এই সকল কার্য সম্পাদন করে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department or Treasury) বা ট্রেজারী বলে।

[ছয়] **আইনসংক্রান্ত কাজঃ** শাসনবিভাগ কিছু কিছু আইন সংক্রান্ত কাজও করিয়া থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণই অধিকাংশ বিল উত্থাপন করেন। প্রধান শাসনকর্তার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা; এমন কি প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি ভিটো (Veto) ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনকে প্রভাবিত করিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে শাসনবিভাগ সাময়িক আইন বা অডিন্যান্স জারি করিতে পারে। ইহা ছাড়া বর্তমানে আইন বিভাগের কার্যভার বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা শাসনবিভাগের উপর উপআইন (bye laws) প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। আইন রচনার অর্পিত ক্ষমতা বলে (delegated legislation) উপআইন প্রণয়নের ক্ষমতাও শাসনবিভাগের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

[সাত] আধুনিকযুগে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের **অর্থনৈতিক**,

।।মাজিক এবং জনকল্যাণমূলক কাজের পরিধি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি ।।ইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ, শিক্ষাও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ, নসংরক্ষণ বিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, খাদ্য ও সরবরাহ ়িভাগ, প্রভৃতি বিভাগসমূহ পরিচালনার ভার শাসন বিভাগেব। বর্তমানে সকল ঃর্ধোন্নত দেশ পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী। ওই সকল ়ন্নয়নমূলক কাজের পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি ।বিচালনার দায়িত্বও শাসনবিভাগের।

বিচারবিভাগ (The Judiciary : Organisation and Functions) : ববকারের তৃতীয় বিভাগটি হইল বিচার বিভাগ। কোন দেশে উত্তম আইনবিভাগ এবং সুদক্ষ শাসন বিভাগ থাকিতে পারে কিন্তু যদি তাহার বিচারবিভাগ স্বাধীন, নির্ভীক এবং পক্ষপাতশূন্য না হয তাহা হইলে ওই শাসনতন্ত্রেব কোন মূল্য নাই। সুগঠিত এবং কর্মকুশল বিচারব্যবস্থা স্বৈরাচারী শাসকের হাত হইতে নাগরিকগণকে ক্ষা করিবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই কারণে লর্ড ব্রাইস বলিয়াছিলেন যে বিচাব বিভাগের কর্মদক্ষতাই সরকারের গুণাগুণ বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। নিম্নলিখিত কাগগুলি বিচারবিভাগ সম্পাদন করিয়া থাকে :

[এক] **আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ :** বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হইল আইনসভা যে সকল আইন পাশ করে তাহাদের যথাযথভাবে প্রযোগ এবং ব্যাখ্যা করা। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয শাসনব্যবস্থার দুই বা ততোধিক অংগরাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচার-বিভাগ তাহার বিচার করিয়া থাকে। অনেক সময় প্রচলিত আইন দ্বারা জটিল বিবাদের মীমাংসা করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপক্ষেত্রে বিচারকগণ ন্যায়বোধের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচারকের রায়কে বিচারক প্রণীত আইন (Judge made law) বলে। এইরূপ বিচারক প্রণীত আইন পববর্তীকালে বিচারকার্যে আইনরূপে গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আইনের প্রযোগ এবং ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিচারকগণ নূতন আইনও সৃষ্টি করিযা থাকেন।

[দুই] **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ শাসনতন্ত্রের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংগরাজ্যসমূহের সরকারগণ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব বিচার বিভাগের।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই বা ততোধিক সরকারের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে উহা নিষ্পত্তি করিয়া প্রধান ধর্মাধিকরণ সংবিধানের স্বরূপ এবং পবিত্রতা বজায় রাখে। বিচার বিভাগ আইনের বৈধতাও বিচার করিতে পারে।

[তিন] **মৌলিক অধিকার রক্ষা ও পরামর্শ দান :** যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে সেখানে উহা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্বও বিচার বিভাগের। এই উদ্দেশ্যে ইহা নির্দেশ বা লেখ (writ) জারি করিতে পারে। বিচারবিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান করিতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দানের ব্যবস্থা আছে। গ্রেট বৃটেনে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি রাজা বা রাণীকে এই ধরনের পরামর্শ দিয়া থাকে।

[চার] **অন্যান্য কাজ :** বিচারবিভাগ আরও কতকগুলি কাজ করে যেগুলি ঠিক বিচারসংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনামা জারি করে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর কাজ করে, রিসিভার নিয়োগ করে এবং লাইসেন্স প্রদান করে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary) বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় যে উহা আইন বিভাগ অথবা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

[এক] **বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি :** সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে বিচারকদিগকে নিয়োগ করা যাইতে পারে—(১) আইনসভার নির্বাচন দ্বারা (২) নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচন দ্বারা এবং (৩) শাসন বিভাগ দ্বারা। সুইজারল্যান্ডে বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন; কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে আইনসভার নির্বাচন দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। জনগণ কর্তৃক বিচারকদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ১৭৯০ সালে ফ্রান্সে প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে অবশ্য ইহাকে অসুবিধাজনক বুঝিয়া নেপোলিয়ন প্রত্যাহার করেন। বর্তমানে এই পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি অংগরাজ্যে এবং সুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল যে, বিচারকের যোগ্যতা বুঝিতে যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা জনসাধারণের নাই। অধ্যাপক ল্যাস্কি এবং গার্ণার এই পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। শাসনবিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া মনে করা হয়। শাসনবিভাগই উপযুক্ত লোক বাছিয়া

ইতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের চারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়া ন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ করিতে হয়। নিম্নতম চারকদিগকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফৎ নিয়োগ করা হয়।

[দুই] **বিচারকগণের কার্যকাল :** বিচারকগণের কার্যকাল সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকিলে তাহারা স্বাধীনভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে বিচার করিতে পারিবেন না। াধুনিক যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিচারকগণ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। যতদিন তাঁহারা ক্ষতার সহিত কর্তব্য পালন করিয়া চলিবেন ততদিন তাঁহারা স্বপদে অধিষ্ঠিত াকিবেন। অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তবেই চারককে পদচ্যুত করা চলিবে।

[তিন] **বিচারকগণের পদচ্যুতি :** একমাত্র অসদাচরণ এবং অক্ষমতার ভিযোগ প্রমাণিত হইলে তবেই নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে বিচারকদিগকে দচ্যুত করা যায়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পার্লিয়ামেণ্টের উভয়কক্ষের পস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগ সমর্থন করিলে বেই কোন বিচারককে পদচ্যুত করা যাইবে।

[চার] **বিচারকগণের বেতন ও ভাতা :** সাধারণতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহার-ীবিগণের মধ্য হইতে বিচারকদিগকে নিযুক্ত করা হয়। বিচারপতির বেতন এবং াতা যদি উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। ইহা ্যতীত বেতন উপযুক্ত না হইলে বিচারক পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং যোগ পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অসদাচরণে প্রবৃত্ত ইবেন। কার্যকালের মধ্যে বিচারকগণের বেতন অথবা ভাতা হ্রাস করা অনুচিত।

[পাঁচ] **বিচারকগণের যোগ্যতা :** সকল দেশেই বিচারব্যবস্থার সহিত স্বর্গীয় বিত্রতা যুক্ত করা হয়। ন্যায়বিচারের ক্ষমতাকে ঐশ্বরিক গুণ বলিয়া গণ্য করা হয়। াধ বিচারের সুমহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিচারক হিসাবে সুদক্ষ, আইনজ্ঞ, াহসী এবং সাধুচরিত্রের ব্যক্তি প্রয়োজন।

[ছয়] **বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য :** বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ এবং াইনবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিলে তবেই উহার স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। ক্ষমতা াতন্ত্রিকরণ মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার মূলমন্ত্র হিসাবে বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য াবী করা হয়। বিচার বিভাগের উপর অন্য কোন বিভাগের হস্তক্ষেপ থাকিলে বিচার ্যবস্থার স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের কার্যাবলী

॥ Functions of the Government ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Functions of Government—Individualism and Socialism—their comparative merits and defects—Types of Socialism.

বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ—বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ—আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (The Purpose of the State) : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রনীতিবিদগণ একমত হইতে পারেন নাই। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের মতে ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর, সুখী, মহৎ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। পরিবার বা গ্রাম সমাজ ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করিতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির চরম আত্মবিকাশ সম্ভব হয় বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের অধীনে জীবনযাপন না করিলে ব্যক্তি কখনও পরিপূর্ণরূপে আত্মোপলব্ধি করিতে পারে না, সেই কারণে রাষ্ট্রের সদস্য হওয়াই ব্যক্তি জীবনের চরম সার্থকতা।

এ্যারিষ্টটলের মত

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্র অকল্যাণকর কিন্তু অপরিহার্য (evil necessary)। রাষ্ট্র যদি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হয় তবে উহা প্রয়োজনীয় কেন? মানুষ হীন প্রবৃত্তির দাস বলিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বপ্রয়োজন। মানুষের মধ্যে হিংসাদ্বেষ, হত্যা, মারামারি প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি যতদিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই উহাদের দমন করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ এই সকল লেখকদের মতে এই সকল নীচ মানবিক প্রবৃত্তিগুলিকে দমিত রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

অপরিহার্য কিন্তু অকল্যাণকর

আর একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চরম মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কোন উদ্দেশ্যই কল্যাণকর নয়, ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। এই মতানুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনকে অযথা নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিজীবনে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কল্যাণকর নয় বলিয়া ইহারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপের পক্ষপাতী।

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন যে রাষ্ট্র জনকল্যাণের লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়মাত্র। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র নাগরিকগণের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী নয়—সকল ব্যক্তির জীবনই সুন্দর এবং সমৃদ্ধ করিয়া তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তাহার জনকল্যাণের মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে উহাকে বিকৃত ও আদর্শভ্রষ্ট রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জনকল্যাণ

রাষ্ট্র কোন্ কোন্ কাজ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে—(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং (২) সমাজতন্ত্রবাদ। নিম্নে ইহাদের আলোচনা করা হইল:

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism): এই মতবাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) এবং হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) রচনায় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে। এই মতবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি দুষ্টগ্রহ বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত।

ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিস্বাধীনতা। ব্যক্তিকে তাহার জীবন স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ দিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিনিষেধ ব্যক্তির উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তাহার স্বাধীনতা হরণ করে।

এই মতানুসারে রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করা হইলেও ইহাকে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয়। রাষ্ট্র অকল্যাণকর কিন্তু অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান (The State is a necessary evil). ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যতদূর সম্ভব সংকুচিত হওয়া প্রয়োজন। এই নীতিকে ইংরেজী ভাষায় Let alone policy এবং ফরাসী ভাষায় Laissez faire (অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও) বলা হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র মাত্র দুই ধরনের কাজ করিবে: (১) আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া নাগরিকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবে এবং (২) বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবে। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সমর্থিত রাষ্ট্রকে পুলিশী রাষ্ট্র (Police State) বলা হয়।

নৈতিক দিক হইতে বিচার করিয়া বলা হয় যে ব্যক্তির ভালো মন্দ রাষ্ট্র অপেক্ষা সে নিজেই উহা ভালো বোঝে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা, দায়িত্ব জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নৈতিক চরিত্র গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

নৈতিক যুক্তি

জীববিজ্ঞানের নিয়মানুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। জীবন সংগ্রামে দুর্বলেরা নিশ্চিহ্ন হইবে এবং যোগ্যতমেরাই বাঁচিয়া থাকিবে। স্বাধীনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা চালু থাকিলে তবেই কে যোগ্যতম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের মাধ্যমে দুর্বলকে রক্ষা করা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী বলিয়া উহা অন্যায়।

জীববিজ্ঞানের যুক্তি

ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন ও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হইলে অবাধ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে। আর প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দাম হ্রাস পায়, ফলে সমাজ উপকৃত হইবে।

অর্থ নৈতিক যুক্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অভিজ্ঞতা হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে রাষ্ট্র যখন শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা ছাড়া সমাজ জীবনের অন্য কোন অংশে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বলিতে কার্যক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বুঝায়। বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় সরকার হইল দলীয় সরকার। সরকার দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত বলিয়া সকল শ্রেণীর নাগরিকের প্রতি সুবিচার করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

অভিজ্ঞতার যুক্তি

সমালোচনা (Criticism): উনবিংশ শতকে এই মতবাদ যথেষ্ট আলোড়ন আনিয়াছিল। এই মতবাদ ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কিন্তু অচিরেই এই মতবাদের প্রতি রাষ্ট্রগুলির আনুগত্যের দিন ফুরাইয়া যায় এবং ইহার অসারতা প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে সকল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সকল ধারণাই ভ্রান্ত। প্রথমতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারে; কিন্তু ইহা সত্য নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমানভাবে নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারে না। সকলেই সমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদীগণ রাষ্ট্রকে একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এই ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক ও সহজ সংগঠন, মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুখী এবং মহৎ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ব্যক্তির কল্যাণ রাষ্ট্রের কাম্য সুতরাং উহার

ভ্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

়তিকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ ানে করেন যে :আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী কিন্তু ইহাও ভ্রান্ত। আইন স্বাধীনতা র্ব না করিয়া উহাকে রক্ষা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধির অর্থ ব্যক্তি াধীনতা হ্রাস, যাহা ঠিক নয়। চতুর্থতঃ, এই মতবাদে বলা হইয়াছে প্রত্যেকে নিজ নিজ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিলে সমাজ কল্যাণ আপনা আপনিই সাধিত হইবে। কিন্তু সর্বদা ইহা সত্য নাও হইতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থ যদি সমাজ স্বার্থের অনুকূল হয় তবেই ব্যক্তির কল্যাণের ফলে সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের সহিত বে্ সমাজ স্বার্থের সামঞ্জস্য থাকিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। পঞ্চমতঃ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোগ্যবস্তুর দাম হ্রাস পাওয়ার দরুন সমাজ লাভবান হয় বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয় তাহাও সর্বদা ঠিক নয়। সামাজিক প্রয়োজনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করিয়া ব্যবসায়ী উৎপাদন পরিচালনা করে। যে দ্রব্য উৎপাদন করিলে অধিক মুনাফা অর্জন করা যাইবে ব্যবসায়ীগণ তাহাই উৎপাদন করিবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দোষত্রুটি সত্বেও ইহার যে কোন গুণ নাই তাহা বলা লে না। এই মতবাদের মূল শিক্ষা হইল আত্মনির্ভরশীলতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা; মানবজীবনে চিরদিনই ইহারা কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূর্তিমান প্রতিবাদ হইল সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদ একটি আদর্শও বটে আবার ইহা একটি সংগ্রামও বটে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কুফলগুলি দূর করিবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন কারণ সমাজতন্ত্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে এখনো আলোচনার শেষ হয় নাই। অধ্যাপক জোয়াড (Joad) যথার্থই বলিয়াছেন যে সমাজতন্ত্র যেন একটা বহু ব্যবহৃত টুপী; প্রত্যেকে বারবার মাথায় পরার ফলে ইহার আকার নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ("Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it")। সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা বর্ণনা করিতে পারি: প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে ধনবৈষম্য নাই। তৃতীয়তঃ, এই সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন (classless) সমাজের উদ্ভব হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে রহিয়াছে দুইটি শ্রেণী—মালিক এবং শ্রমিক, শোষক এবং শোষিত। কিন্তু সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কোন স্থান নাই বলিয়া উহাতে শোষকশ্রেণীও নাই। চতুর্থতঃ,

সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। ষষ্ঠতঃ, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী নয়। তবে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে শোষণ করিয়া ধনী হইবে, অথবা অবাধ স্বাধীনতার সুযোগের অপব্যবহার করিবে সমাজতন্ত্রবাদ ইহার তীব্র বিরোধিতা করে। মূলধন, শিল্প এবং জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিলে শোষণের আর কোন অবকাশ থাকিবে না। পরিশেষে এই মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলীর অবাধ প্রসার সমর্থন করে কারণ ইহার সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ব্যক্তির চরম আত্মবিকাশ সম্ভব হইতে পারে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষাই করিবে না, ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাহাকে সহায়তা করিবে। রাষ্ট্রই হইবে ব্যক্তির বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। সমাজতন্ত্রবাদীরা এমন এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, ধনবৈষম্য নাই, ব্যক্তিগত মুনাফা নাই, শোষণ নাই—যেখানে সকলেই তাহার সামর্থ্য অনুসারে শ্রম প্রদান করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যসামগ্রী পাইবে ("From each according to his ability, to each according to his needs.")

সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সম্পর্কে সকলে একমত হইলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। ইহার প্রধান প্রধান রূপগুলি বর্ণনা করা হইল।

[এক] **রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ** (State Socialism or Collectivism.) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকেরা বিপ্লব বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন না। এই মতবাদীগণ ধীরে ধীরে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তন করিতে চান। ভারত এ সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

[দুই] সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism): সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করিতে চায়। শ্রমিক ও ক্রেতা অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই পুনর্গঠিত রাষ্ট্র কর ধার্য, দেশরক্ষা প্রভৃতি সাধারণ কাজগুলি পরিচালনা করিবে কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে শ্রমিক সংঘগুলি (Trade Unions or Trade Guilds)। অবশ্য দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করিবা

সময় উহারা ভোগকারীর সংঘগুলির (Consumer's Guilds) সহিতও পরামর্শ করিবে। এই ধরনের সমাজতন্ত্রে সংঘগুলির প্রাধান্য থাকিবে বলিয়া ইহাকে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। হবসন (Hobson) এবং জি, ডি, এইচ, কোল (G.D.H. Cole) এই মতবাদের প্রখ্যাত প্রচারক।

[তিন] **যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ** (Syndicalism): এই মতবাদের সমর্থকগণ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। ইহারা অর্থ নৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রসার করিতে চান। এই মতবাদে রাষ্ট্রের কোন স্থান নাই, রাষ্ট্রবিহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনই ইহার লক্ষ্য। ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত (Sabotage), বয়কট প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া উহার অবসান ঘটাইতে হইবে। রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে শ্রমিকসংঘগুলি মিলিত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সমবায় গঠন করিবে এবং ডাক ও তার, রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবে। উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রমিক সংঘগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইবে। সোরল (Soral) এই মতবাদের প্রখ্যাত প্রচারক।

[চার] **সাম্যবাদ** (Communism): সাম্যবাদের স্রষ্টা হইলেন কার্ল মার্কস (Karl Marx)। এই মতবাদ রাষ্ট্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। সাম্যবাদী-গণের মতে রাষ্ট্র হইল শোষণের যন্ত্র। সাম্যবাদ বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাইতে চায়। সর্বহারাশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লব করিয়া নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে। এই সমাজে প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিবে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু পাইবে। এই সমাজ শোষণবিহীন বলিয়া শোষণের যন্ত্র রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (The State will wither away).

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা (Criticism of Socialism): সমাজ-তন্ত্রবাদ যে একটি মহান আদর্শ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি দেখাইয়া জনগণের মঙ্গলসাধন করিয়াছে। ইহা শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে জনগণকে মুক্ত করিয়া সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদও সমালোচনার উর্ধে নয়। ইহার কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করা হয়।

প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্র নাগরিক জীবনের সকল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। কিন্তু রাষ্ট্র সকল কাজের ভার লইলে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি এতো বাড়িয়া যাইবে যে কোন কাজই ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরিচালনা অধিকতর দক্ষ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সকলপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের কথা ঘোষণা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ মানব সত্য অস্বীকার করিয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ মানুষের কাজে প্রেরণা যোগায়।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্র মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে। রাষ্ট্রই সব কিছু করে বলিয় ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা বিনষ্ট হইয়া যায়, মানুষ স্বয়ং-নির্ভরশীলতা হারায়।

চতুর্থতঃ, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই ধরনের সমাজে রা অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয় বলিয়া কাহারো কোন স্বাধীনতা থাকে না। এইজন্য অনে চিন্তাবিদ ইহাকে "দাসত্বের পথ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the Modern State): উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা নির্ধারিত হইত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ—কার্যক্ষেত্রে এই দুই চরম মতবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।

আজ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলি (Welfare State) যে সকল কাজ করে তাহাদের প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) মুখ্য বা অপরিহার্য কাজ এবং (২) গৌণ বা ঐচ্ছিক কাজ।

যে সকল কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অপরিহার্য অর্থাৎ ওই সকল কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না তাহাদের মুখ্য বা অপরিহার্য কাজ বলে। আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী পোষণ করিতে হয়। বর্তমানযুগে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে হয়।

মুখ্য কাজ

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ বাহিনী পোষণ করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীই যথেষ্ট নয়; আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্ধারণ করা, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির অধিকার বজায় রাখা, অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ

করা, অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা, দেওয়ানী মামলার বিচার করা প্রভৃতি রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলিকে উইলসন কল্যাণমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র এই সকল কাজ করিয়া থাকে। ঐচ্ছিক কাজের কোন সীমারেখা নাই। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ইহাদের পরিধি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্নলিখিত ঐচ্ছিক কাজগুলি প্রায় সকল কল্যাণমূলক রাষ্ট্রই করিয়া থাকে।

ঐচ্ছিক কাজ

(১) শিক্ষা বিস্তার: উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষা অপরিহায। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী ব্যয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়. গ্রন্থাগার, বৃত্তি, মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে; (২) জনস্বাস্থ্য: জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী ব্যযে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, পশুচিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়; (৩) মুদ্রা ও ঋণ পরিচালনা (currency and credit): রাষ্ট্র জনস্বার্থে মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালিত করিয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রাসংকোচ উভয়ই সমাজজীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। মুদ্রাব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাসংকোচ পরিহার করা যায়। (৪) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা: রাষ্ট্র কৃষি ও শিল্প উন্নতির জন্য অনুকূল নীতি নির্ধারণ করে; সমবায়, উন্নত বীজ প্রদান, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া সরকার কৃষিকে সহায়তা করিয়া থাকেন। অনুকূল শিল্প নীতি এবং সাহায্য দানের (Subsidies) মাধ্যমে সরকার শিল্প প্রসারে সহায়তা করিয়া থাকেন। (৫) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: পরিবহন এবং যোগাযোগের উন্নতি ব্যতিরেকে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব নয় বলিয়া সরকার পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। সরকার রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এবং আভ্যন্তরীণ জলপথ, স্থলপথ, এবং বিমানপথ পরিচালনার ব্যবস্থা করেন; (৬) শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা: রাষ্ট্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কারখানা আইন, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন করিতেছে; (৭) বৃদ্ধ, নিঃস্ব এবং পংগুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা: বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের; (৮) আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ: দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া সরকার আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে; (৯) বেকার সমস্যা সমাধান: বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchange) স্থাপন করে এবং মন্দার

সময় জনস্বার্থমূলক কাজের (Public Works) ব্যবস্থা করে, (১০) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** : আধুনিককালে প্রায় সকল রাষ্ট্রই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য নানা প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic functions of the Government) : আধুনিক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক কাজগুলি করিয়া থাকে।

[এক] জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : প্রজাগণের জীবনযাত্রার উন্নত মান সকল রাষ্ট্রেরই কাম্য। রাষ্ট্রের নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অর্থ শুধুমাত্র টাকার অংকে আয় বাড়ানো নয়—প্রকৃত আয় বাড়ানো। রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করিয়া থাকে, যেমন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এবং এই সকল সেবামূলক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে।

[দুই] শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ : শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। শিল্পের প্রতিকূল একদেশীকরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া, বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া, শিল্পসমূহকে মূলধন প্রদান করিয়া, প্রয়োজনবোধে এবং জাতীয় স্বার্থে মূলশিল্পকে জাতীয়করণ করিয়া, দেশ বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্র দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করিয়া থাকে।

[তিন] শ্রমিক ও রাষ্ট্র : শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য সরকার অনেক কাজ করিয়া থাকেন। কারখানা আইন প্রণয়ন করিয়া কারখানায় কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেওয়া হয়; শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতনের হার নির্দিষ্ট করিয়া মালিকের শোষণের হাত হইতে তাহাকে রাষ্ট্র রক্ষা করে। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ মিটাইবার জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয় এবং শ্রমিকদের অসহায় অবস্থায় নিরাপত্তার জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

[চার] বেকারসমস্যা সমাধান : বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সমস্যা বেকার সমস্যা আর এই বেকার সমস্যা সমাধানই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অর্থনৈতিক কাজ। মানুষ বেকার হইলে সে কখনও অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে

না এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশে বিক্ষোভ দেখা দিবে, ইহার ফলে বিপ্লবও ঘটিতে পারে। বর্তমানে সকল রাষ্ট্রই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবসা-চক্রবিরোধী নীতি (Counter-Cyclical Public Policy) অবলম্বন করে—অর্থাৎ তেজীবাজারে সরকার ব্যয় হ্রাস ও করবৃদ্ধি করে এবং মন্দার সময় ব্যয়বৃদ্ধি ও কর হ্রাস করে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম লক্ষ্যই হইল বেকার সমস্যা হ্রাস করা।

[**পাঁচ**] **রাষ্ট্র ও কৃষি:** অনুন্নত দেশসমূহে কৃষি এখনও প্রধান শিল্প। ভারতে এখনো পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষিনির্ভরশীল। কৃষির উন্নতি ব্যতীত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে—জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে, কৃষককে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অল্প সুদে টাকা ধার দেয়, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করে, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, কৃষিবিদ্যালয় ও কৃষিগবেষণাগার স্থাপন করিযা কৃষকদের অল্প মূল্যে সার বিক্রয় করে।

[**ছয়**] **আয়বৈষম্য হ্রাসকরণ:** ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনী এবং দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকের দক্ষতার তারতম্যে যে আয়বৈষম্য তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই কিন্তু উত্তরাধিকার প্রথার দরুন ধনতান্ত্রিক দেশে যে বিরাট আয়বৈষম্য আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্র ধনীদের উপর অধিক করভার স্থাপন করিয়া ধনী দরিদ্রের এই আয়বৈষম্য হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। ধনীদের উপর আয়কর, ব্যয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর প্রভৃতি উচ্চহারে বসাইয়া তাহাদের আয় হ্রাস করা হয় এবং সেই অর্থে রাষ্ট্র দরিদ্র জনসাধারণের উপকারের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজ করিয়া থাকে।

[**সাত**] **অর্থমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা:** দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে যাহাদের বাঁধা আয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের লোকের শুধুমাত্র আর্থিক আয় বাড়ানোই রাষ্ট্রের কাজ নয়—সেই সঙ্গে মূল্যস্তর যাহাতে বাড়িয়া না যায় সেদিকে রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অর্থের মূল্য হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের মূল্য হ্রাস পায় এবং যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অল্পদামে সরবরাহ করিবার জন্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথা

চালু করে আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বাজার হইতে অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে।

[আট] রাষ্ট্র ও পরিকল্পনা : দেশের সর্বাঙ্গীন এবং সুষম উন্নয়নের জন্য বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ তাহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধনে যত্নবান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের সংবিধান

॥ Constitution of the State ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Constitution different Kinds of constitutions—their strength and weakness.

বিষয়বস্তু : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট—সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ—লিখিত ও অলিখিত সংবিধান—নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধান—উহাদের গুণাগুণ।

যে কোন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান, ইহাকে পরিচালিত করিবার জন্যও নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়; এই সকল নিয়মকানুনগুলিকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সংবিধান বলে। রাষ্ট্রের সংবিধান হইতে রাষ্ট্রের সংগঠন, সরকারের রূপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের প্রতিটি বিভাগের গঠন ও কার্যকলাপ, শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং শাসকের সহিত শাসিতের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়।

অধ্যাপক গিলক্রিস্ট (Gilchrist) সংবিধানের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন : "সুনির্দিষ্টভাবে একটি স্থানে লিপিবদ্ধ বা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, লিখিত

সংজ্ঞা

অথবা অলিখিত যে সকল নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার কোন দেশের সরকারের গঠন, ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে তাহাদের সমষ্টিকে সেই দেশের সংবিধান বলে"।

সংবিধানের সংজ্ঞা হইতে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় : প্রথমতঃ, সংবিধান

বৈশিষ্ট্য

লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে, ভারতের সংবিধান লিখিত কিন্তু বৃটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান হইতে সরকারের গঠন জানিতে পারা যায়; সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত না রাষ্ট্রপতি শাসিত হইবে তাহা সংবিধান হইতে জানা যায়। আবার সরকার এককেন্দ্রিক হইবে না যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে তাহাও সংবিধান হইতে জানা যাইবে। তৃতীয়তঃ, সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হইবে সংবিধানে তাহার নির্দেশ থাকে। চতুর্থতঃ, সংবিধানে ক্ষমতার উৎসের ব্যাখ্যা থাকে; ভারতের জনগণই হইল ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস।

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions) :

সংবিধানকে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ সংবিধানকে (১) লিখিত ও অলিখিত এবং (২) নমনীয় ও অনমনীয় এই দুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (**Written and Unwritten**): সংবিধানের মূল নীতি ও আদর্শগুলি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিলে তাহাকে লিখিত সংবিধান বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রথম লিখিত সংবিধান। ভারতের সংবিধানই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। শাসনতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শগুলি একটি দলিল লিপিবদ্ধ না থাকিলে তাহাকে অলিখিত সংবিধান বলে। গ্রেটবৃটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত। ওই দেশের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ প্রথা ও রীতিনীতি, পার্লিয়ামেণ্টের আইন এবং ঐতিহাসিক ঘোষণার ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

লিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল উহার সুস্পষ্টতা এবং সুনির্দিষ্টতা। লিখিত সংবিধানে নাগরিকগণের অধিকারগুলি স্পষ্টভাষায় লিখিত থাকায় নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকে এবং সরকারেরও স্বৈরাচারী হইবার আশংকা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের কোন নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে অথবা বিরোধের সৃষ্টি হইলে সহজেই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া লওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া উহা স্থায়ী এবং দৃঢ় হয়। চতুর্থতঃ, বৃহৎ দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার জন্য লিখিত সংবিধান অপরিহার্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে লিখিতভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন না থাকিলে ক্ষমতার এলাকা লইয়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইবে।

গুণ

লিখিত সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল ইহা যুগের পরিবর্তনের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। যুগের পরিবর্তনের সহিত জনগণের ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তার পরিবর্তন হয়। লিখিত সংবিধান পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয় বলিয়া যুগোপযোগী পরিবর্তনসমূহ সংবিধানে প্রতিফলিত হয় না। সংবিধানের কাম্য পরিবর্তন সাধন করা দুরূহ হইলে বিপ্লব পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

ত্রুটি

অলিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল ইহার নমনীয়তা; সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য বলিয়া যুগের পরিবর্তনগুলি সংবিধানে প্রতিফলিত করা যায়। এই ধরনের সংবিধানে কাম্য পরিবর্তন অতি সহজেই করা যায়; এই কারণে ইহাতে বিপ্লবের আশংকা খুব কম থাকে।

গুণ

অলিখিত সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল যে সংবিধান সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে না। ইহা ছাড়া সংবিধানের নির্দিষ্টতা নির্ধারণের জন্য ইহাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান অলিখিত হইলে শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না, ইহাতে শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অলিখিত সংবিধান একেবারেই অচল। চতুর্থতঃ, সংবিধান অলিখিত হইলে সাধারণ লোক, বিশেষ করিয়া অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত লোক সংবিধানের মর্ম এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

ত্রুটি

সংবিধানগুলিকে লিখিত এবং অলিখিত এই দুইভাবে ভাগ করা যুক্তিপূর্ণ বা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ কোনদেশের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা সম্পূর্ণরূপে অলিখিত হইতে পারে না। লিখিত সংবিধানে বহু অলিখিত অংশ এবং অলিখিত সংবিধানে বহু লিখিত অংশ থাকিতে পারে। গ্রেটবৃটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান, বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু উহার সংবিধানের অনেক লিখিত বিষয় রহিয়াছে, যেমন ম্যাগনাকার্টা, পিটিসন অফ রাইটস, বিল অফ রাইটস্, এক্ট অফ সেটেলমেণ্ট, ১৯১১ এবং ১৯৪৮ সালের পার্লিয়ামেণ্টারী আইন ইত্যাদি। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হইলেও উহাতে অনেক অলিখিত বিষয়ের অস্তিত্ব আছে; যেমন দল ব্যবস্থার দ্বারা সরকার পরিচালনা, ক্যাবিনেট ইত্যাদি। এইজন্য সংবিধান শ্রেণীবিভাগের এই পদ্ধতিকে বর্তমানে গ্রহণ করা হয় না।

নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধান (Flexible and Rigid Constitutions) : সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া সংবিধানকে নমনীয় এবং অনমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লর্ড ব্রাইসই প্রথম এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেন।

যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাশ হয় সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সংবিধানের সংশোধন করা যাইলে তাহাকে নমনীয় সংবিধান বলে। সাধারণ আইন পাশের নিয়ম বলিতে বুঝায় আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অন্যভাবে বলা যায় যে এইক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না; গ্রেটবৃটেনের সংবিধান নমনীয়।

যে সংবিধানের পরিবর্তন সাধারণ আইনপাশের নিয়মে করা যায় না—সংবিধান পরিবর্তনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহাকে অনমনীয় সংবিধান বলে। শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যদের ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা এই সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায় যে অনমনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে

শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য থাকে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনমনীয়।

গুণ

নমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হইল যে ইহা সময়ের সহিত তাল মিলাইয়া সহজেই চলিতে পারে। ইহা যুগোপযোগী এবং গতিশীল সমাজের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে; ইহা সংকটকালীন অবস্থার বিশেষ উপযোগী। সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য বলিয়া ইহাতে বিপ্লবের আশংকা থাকে না। উন্নতিকামী দেশগুলিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে বলিয়া নমনীয় শাসনতন্ত্র ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ত্রুটি

নমনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল স্থিতিশীলতার অভাব। পরিবর্তন সহজসাধ্য হইলে জনমতের চাপে পড়িয়া সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্তিত হয় আর ইহার দরুন সংবিধানের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের স্বার্থে বা জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বারংবার সংবিধান রচনা করিতে পারে; ইহাতে পরিণামে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

গুণ

অনমনীয় সংবিধানের দোষত্রুটি ঠিক নমনীয় সংবিধানের দোষত্রুটির বিপরীত। অনমনীয় সংবিধান সবসময়ই লিখিত হয়। এইরূপ সংবিধান সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং স্থায়ী হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের খেয়াল-খুসীমত যখন তখন সংবিধান পরিবর্তন করিতে পারে না। ইহাতে সংবিধানের বিশেষ মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বিশেষভাবে রক্ষিত হয়।

ত্রুটি

অনমনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা সময়ের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। কাম্য সংস্কার সাধন সহজসাধ্য নয় বলিয়া সংস্কারকামীরা বিপ্লব পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। মেকলে যথার্থ বলিয়াছেন যে জাতির অগ্রগতির সময় সংবিধান অচল হইয়া থাকিলে বিপ্লব দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনমনীয় সংবিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া সংবিধান বিচারবিভাগের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, অনমনীয় সংবিধান রক্ষণশীলতার বাহন হইয়া দাঁড়ায়। সংবিধান অনমনীয় হইলে নূতন এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা সংবিধানে প্রতিফলিত হইবার অবকাশ থাকে না। সংবিধানের পূর্ণ নমনীয়তা অথবা পূর্ণ অনমনীয়তা কোনটাই কাম্য নয়। এই দুই চরম নীতির মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

॥ Political Parties ॥

Relevant portion of the Syllabus : Party System—its advantages and disadvantages—Two party System Vs. Multiparty System—one party rule.

বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ—গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব—রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী—দলব্যবস্থার দোষ ও গুণ—একদলীয় ব্যবস্থা—দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ (Nature of Political Parties) : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক দল অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গণতন্ত্র জনগণের শাসন ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে রাষ্ট্রনৈতিক দল।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বার্ক (Burke) বলিয়াছেন

সংজ্ঞা

একদল ব্যক্তি যখন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি নীতি সম্পর্কে একমত পোষণ করে এবং ওই নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে তখন তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করিয়াছে বলা চলে।

অধ্যাপক গেটেলের (Gettel) মতে রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল একদল মোটামুটি সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী যাহারা রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং তাহাদের নির্বাচনী ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ, দল হইল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সমমতাবলম্বী কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ; দ্বিতীয়তঃ, ইহা একটি সংগঠিত সম্প্রদায় ; তৃতীয়তঃ, শাসনক্ষমতা লাভ করিলে দল তাহার নীতিগুলিকে কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে আর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকিলে ইহা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সকল রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা থাকে। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মত পৃথক হইলেও মানুষের মধ্যে সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। মত পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি

একমতাবলম্বী হইতে পারে এবং উহাদের কার্যকর করার নির্দিষ্ট কর্মপন্থাও স্থির করিতে পারে। একমতাবলম্বী এবং একই কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জোটকে রাষ্ট্রনৈতিক দল বলা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলের কর্মপন্থা জাতীয় কল্যাণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই কারণে দলীয় নীতি জাতীয় স্বার্থরক্ষার আদর্শে রচিত হয়। সকল দলেরই লক্ষ্য জাতীয় কল্যাণসাধন করা, কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, প্রজা সোসালিষ্ট এই তিনটি রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই লক্ষ্য দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু ইহাদের অনুসৃত কর্মপন্থা বিভিন্ন।

কুচক্রীদল

রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ বুঝিবার জন্য ইহাকে কুচক্রীদল (Faction or Clique) হইতে পার্থক্য করা প্রয়োজন। কুচক্রীদলও রাষ্ট্রনৈতিক দলের মত সমমতাবলম্বী একদল লোক লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাণসাধন করা, অপরপক্ষে কুচক্রীদলের লক্ষ্য হইল দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করা। নীতিজ্ঞান বিবর্জিত, আদর্শহীন, স্বার্থসর্বস্ব রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের চক্রান্তেই এরূপ কুচক্রীদলের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দল সমাজকল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে কুচক্রী দলে পরিণত হয়।

বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়: (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদস্যগণ একমতাবলম্বী এবং একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ সাধন করা, অপরপক্ষে কুচক্রীদলের লক্ষ্য হইল দলীয় অথবা বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের উন্নতি বিধান করা; (৩) প্রত্যেক দলেরই একটি কার্যসূচী থাকে; নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহার কার্যসূচীকে বাস্তব রূপদান করিতে সকল দলই সচেষ্ট থাকে।

গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনায় দলপ্রথা অপরিহার্য। ম্যাকাইভার বলিয়াছেন দল ব্যতিরেকে গণতন্ত্রে কোন সুসংহত নীতির উদ্ভব হইতে পারে না। লাওয়েলের (Lowell) মতেও নির্বাচকের সংখ্যা অধিক হইলে দলের অস্তিত্ব থাকিতে বাধ্য। গ্রেট বৃটেনে দলব্যবস্থা আইনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এখানে বিরোধীদলের নেতা মাহিনা পাইয়া থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় নিয়ম হইল, যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে উহাই সরকার গঠন করিবে।

গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of Political Parties in Democracies): চক্রবিহীন যানের ন্যায় দলবিহীন গণতন্ত্রও অবাস্তব।

সংবিধানগত স্বীকৃতি না থাকিলেও বৃহদায়তন গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দলব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়। দল না থাকিলে গণতন্ত্রে শাসননীতি সুগঠিত হইতে পারে না, কর্মসূচী সুসংহত হইতে পারে না এবং নির্বাচন সংবিধানগত ভিত্তিতে পরিচালিত হইতে পারে না। বর্তমানে পৃথিবীতে পরোক্ষ'গণতন্ত্র প্রচলিত আছে অর্থাৎ জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে অধিকাংশ প্রতিনিধি একমতাবলম্বী না হইলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। দলব্যবস্থা প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি করিয়া শাসন কার্যকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। এইজন্য লাওয়েল (Lowell) বলিয়াছেন বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনসাধারণ কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। যেখানে ব্যাপক ভোটাধিকার আছে সেখানে দলের উদ্ভব অনিবার্য, আর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে সেই দলই শাসনকার্য পরিচালনা করিবে।

লাওয়েলের মন্তব্য

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি ভোটদাতাকে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ভোট প্রার্থী হয় তাহাকে সমর্থন করিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ, ধ্যানধারণা এবং গুণাগুণের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোন নাগরিকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সকল প্রার্থীর গুণাগুণের সহিত পরিচয় থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত গুণাগুণ জানিবার প্রয়োজন হয় না, তাহার দলের আদর্শ জানিলেই চলে। রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া নির্বাচন সমস্যা ভোটদাতাদের নিকট সহজ হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, একক বিচ্ছিন্ন মানুষ সমাজজীবনে শক্তিহীন; যে একা সেই দুর্বল। দলের মধ্যে আসিয়া ব্যক্তি তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপদান করিতে পারে। দলব্যবস্থার সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক দিনদিন নিবিড়তর এবং সে ইহার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। দলীয় শাসন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়াছে, পরিবর্তে দল বনাম রাষ্ট্র এই নূতনভাবে মানুষ চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছে। অনেকে অবশ্য দলবিহীন গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করিয়া থাকেন কিন্তু বাস্তব জগতের সহিত তাঁহাদের চিন্তাধারার কোন সংগতি নাই।

চতুর্থতঃ, বর্তমানযুগে নির্বাচন একটি ব্যয়-বহুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংগঠিত এবং সম্পদশালী দল পিছনে না থাকিলে দরিদ্র কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হইত।

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কারণ দলের মাধ্যমেই আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল হইতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়;

দলপ্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতেই রাষ্ট্রনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে।

স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় ভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিকে দমন করা হয়। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। কিন্তু একটি মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে সেই দেশে গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। গণতন্ত্রের অন্যতম সর্ত হইল বিকল্প সরকার গঠনের অধিকার আর একাধিক দল থাকিলে তবেই বিকল্প সরকার গঠনের প্রশ্ন উঠে।

দলব্যবস্থা জনগণের স্বার্থে সুপরিচালিত হইলে উহা মানুষের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিতে পারে। কিন্তু আদর্শবিচ্যুত দল কুচক্রীদলে পরিণত হইয়া দেশের প্রভূত ক্ষতি-সাধন করিয়া থাকে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ধর্মের ভিত্তিতে দলগঠনের অবসান, দল-কর্তৃক নিজস্ব সামরিক বাহিনী পোষণ নিষিদ্ধ এবং সদা-সতর্ক জনমত গঠন করিয়া দলীয় ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties):

[এক] **সমস্যা নির্বাচন:** আধুনিক সমাজে মানুষের সম্মুখে অসংখ্য রাষ্ট্র-নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়া লইয়া নীতি নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রনৈতিক দল জনসাধারণের সম্মুখে সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করিলে জনসাধারণ উহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে।

[দুই] **নীতি নির্ধারণ:** সমস্যাগুলি নির্বাচনের পর উহাদের সমাধানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির দ্বিতীয় কাজ। প্রত্যেক দলই এই বিশ্বাস রাখে যে তাহাদের নির্ধারিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে সমস্যাগুলির সুষ্ঠু এবং আশু সমাধান করা যাইবে।

[তিন] **সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা:** রাষ্ট্রনৈতিক দলের তৃতীয় কাজ হইল

জনসমর্থন লাভের জন্য দলের মতবাদ এবং কর্মপন্থা প্রচার করা। দলের নেতাগণ বক্তৃতার মাধ্যমে বা দলীয় পত্রিকার মারফতে দলের নীতি এবং কর্মসূচীকে ফলাও করিযা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া অনুকূল জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পায। লাওয়েলের ভাষায় দলগুলি "ভাবের দালাল" (broker of ideas) হিসাবে কাজ করে।

[চার] **প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রচার:** প্রত্যেক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সময় মনোনীত প্রার্থীকে জনসাধারণের সম্মুখে খাড়া করে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়া যায়। ইহার দরুন নির্বাচকগণ সহজেই বুঝিতে পারে কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের প্রতিনিধি। দল ব্যবস্থা না থাকিলে ভোটদাতাদিগের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন হইত। যে ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ভোটপ্রার্থী হয়, তাহাকে ভোট দিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং গুণাগুণের সহিত পরিচয় থাকা প্রযোজন। কিন্তু দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত গুণাগুণ জানিবার প্রয়োজন হয় না, তাহার দলের আদর্শ জানিলেই কাজ হইযা যায়। দলব্যবস্থার ফলে ভোটদাতাদিগের নিকট নির্বাচন সমস্যা সহজ হইয়া গিয়াছে।

[পাঁচ] **আইনসভার কার্য:** রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল সরকার গঠন করা। যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকাব গঠন করিয়া পূর্বঘোষিত নীতিকে কার্যকর করিবার চেষ্টা করে। যে সকল দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না তাহারা বিরোধী দল হিসাবে ক্ষমতায় আসীন দলেব কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়া থাকে।

দলব্যবস্থার গুণ ও দোষ (Merits and Demerits of Party Systems): দলপ্রথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য। দলপ্রথার গুণগুলি আসলে উহার কাজের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই প্রথার গুণগুলিকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহায়তা ছাড়া সমস্যা নির্বাচন করা নির্বাচকদিগের পক্ষে কঠিন হইত। দেশে যে অসংখ্য সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলি অধিক প্রয়োজনীয় এবং যাহাদের আশু সমাধান প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সেগুলিকে নির্বাচিত করিয়া বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করে। রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহায়তা ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে

দলপ্রথার গুণ

সমস্যাগুলি বাছিয়া লওয়া এবং তাহাদের সমাধানের পন্থা আবিষ্কার করা সহজ হইত না।

পরস্পরবিচ্ছিন্ন নাগরিকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং সংহতি আনিতে ও কতকগুলি নীতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে দলপ্রথার কার্যকারিতা অসাধারণ।

দ্বিতীয়তঃ, দলব্যবস্থা থাকার ফলে কোন ব্যক্তি বা দল স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও অন্যান্য দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে বিরোধী দলগুলি সরকারকে সমালোচনা করে বলিয়া সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস করে না। সরকার স্বৈরাচারী হইলে বিরোধী দলগুলি উহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবে এবং ইহার দরুন পরবর্তী নির্বাচনে ওই দল ক্ষমতা হারাইবে। দলপ্রথা থাকায় সরকার সব সময়ই জনমত অনুসারে চলিতে চেষ্টা করে। সুতরাং দলপ্রথাকে স্বাধীনতার একটি রক্ষাকবচ বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, দলপ্রথা জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান এবং চেতনার সৃষ্টি করে। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলের তরফ হইতে যে প্রচারকার্য চালানো হয় তথবা আইনসভা ও বক্তৃতামঞ্চে যে সকল দলীয় সমালোচনা হয় তাহার দরুন জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিই ব্যক্তিকে তাহার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। দলপ্রথা থাকার দরুন সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রনৈতিক কাজকারবারে অংশ গ্রহণ করিতে আগ্রহী হয়। দলপ্রথা না থাকিলে বহু ব্যক্তিই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিত এবং ভোটদানের সময় নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইত না।

চতুর্থতঃ, দলপ্রথা থাকার ফলে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাম্য পরিবর্তন সাধন করা যায়। দলপ্রথা না থাকিলে স্বৈরাচারী সরকার উচ্ছেদ করিতে হইলে বিদ্রোহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দলপ্রথা থাকার দরুন গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনমত অনুযায়ী সরকার পরিবর্তন করা যায়।

পঞ্চমতঃ, দলপ্রথা শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হয় বলিয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন আর সেইজন্য নির্ভয়ে তাঁহারা শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারেন। সুশাসনের জন্য এই দুই বিভাগের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেও দলপ্রথার জন্যই শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সহযোগিতা

বজায় থাকে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন কিন্তু আইনসভায় রাষ্ট্রপতিব যে দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতির বাণী অনুযায়ী আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে।

দলপ্রথার দোষ

দলপ্রথার গুণ এবং দোষ উভয়ই রহিয়াছে ; ইহার দোষগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

প্রথমতঃ, জনগণের মতামত এতো বিভিন্ন ধরনেব হইতে পাবে যে মাত্র দুই চারিটি দলের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করা যায় না। বহু লোক সর্ববিষয়ে তাহার মনের মত দল না পাইয়া কোন একটি দলের সদস্য হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, দলপ্রথার ফলে জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তে দলীয় মনোভাব গড়িয়া ওঠে। দলের নেতাদিগের নিকট দলের স্বার্থ রক্ষাই প্রধান বিবেচ্য হইয়া দাড়ায়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্যকে বিকৃত করা হয় এবং মিথ্যা ও অর্ধসত্য প্রচাব করিযা দলগুলি জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

তৃতীয়তঃ, নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলাদলি এবং রেষারেশি দেখা যায়, যে উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তাহা সমাজজীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অযথা নিন্দা চারিদিকে ছড়াইয়া আবহাওয়া কলুষিত হইয়া ওঠে।

চতুর্থতঃ, দলপ্রথার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। একবাব কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদস্য হইলে ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য থাকে না, স্বাধীন চিন্তার স্থান থাকে না, দলের নির্দেশ অনুসারে তাহাকে চলিতে হয়। কোন সদস্য দলীয় নীতির বিরোধিতা করিলে তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত কবা হয়। এইজন্য স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ দলভুক্ত হইতে চান না।

পঞ্চমতঃ, দলপ্রথার জন্য সুযোগ্য ব্যক্তিগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহাদেব মধ্য হইতেই সকল মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়। বিরোধী দলে কোন যোগ্য ব্যক্তি থাকিলেও তাহাকে শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। ভারতে কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়াছে বলিয়া কংগ্রেস দল হইতেই সকল মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট বা জনসংঘ দলে শাসন বিভাগের কোন একটি দপ্তর পরিচালনা করিবার বিশেষ যোগ্যতা কোন নেতার থাকিলেও তাহাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হইবে না।

ষষ্ঠতঃ, দলপ্রথার ফলে দেশের নৈতিক পরিবেশ এরূপ কলুষিত হয় যে অনেক শান্তিপ্রিয়, অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি দলগত রাষ্ট্রনীতি হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়

বলিয়া মনে করেন। এই সকল লোকের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে শাসনব্যবস্থার মান নিম্নগামী হওয়াই স্বাভাবিক।

সপ্তমতঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে দলপ্রথার দরুন আত্মীয় পোষণ, উৎকোচ প্রদান প্রভৃতি দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের নেতারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগকে চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর দলের সদস্যগণ পারমিট গ্রহণ, লাইসেন্স প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা আদায় করিয়া থাকে।

দলপ্রথার এই সকল দোষত্রুটির জন্য ইংরেজ লেখক জোসেফ এ্যাডিসন (Addison) দলপ্রথার অবসান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে দলপ্রথা না থাকিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং দল ব্যবস্থাকে উঠানো যায় না, উহাকে যতদূর সম্ভব ত্রুটিবিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জনগণের নৈতিক মান উন্নত হইলে, দলীয় স্বার্থের পূর্বে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে এবং ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটিলে দলপ্রথা বহুলাংশে ত্রুটিবিমুক্ত হইতে পারিবে।

দলীয় শাসন (Party System of Government):

এক দলীয় ব্যবস্থা (One Party System): যে রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যগণ সকলেই একটি মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদস্য তাহাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিষ্ট ইতালী এবং সোবিয়েৎ রাশিয়ায় একদলীয় সরকার গড়িয়া ওঠে। অধ্যাপক বার্কার (Barker) যথার্থই বলিয়াছেন যে একটিমাত্র দল থাকিলে সেই দেশে গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। গণতন্ত্রের অন্যতম সর্তই হইল একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব।

এই ধরনের শাসনব্যবস্থার সুবিধা হইল যে কোনরূপ বিরোধী দল না থাকায় সরকার অতি দ্রুতগতিতে কাজ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় বা সংকটকালে ইহা বিশেষ উপযোগী। যেখানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী রহিয়াছে সেখানে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একাধিক দল থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে শোষণের অবসান হইয়াছে সেখানে একটি মাত্রই শ্রেণী রহিয়াছে বলিয়া উহার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি মাত্র দলই থাকিবে।

বার্কার এই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অস্বীকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেশে একটি শ্রেণীস্বার্থ থাকিলেও সকল বিষয়ে মতৈক্য নাও থাকিতে পারে।

একদলীয় শাসনব্যবস্থায় কোন বিরোধীদল না থাকায় সরকারকে সমালোচনা বা বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সামগ্রিক রাষ্ট্রে (Totalitarian State) একদলীয় শাসন চলিতে পারে কিন্তু গণতন্ত্রে ইহা চলিতে পারে না।

দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party Vs. Multiparty System): রাষ্ট্রে দুইটি দলের অস্তিত্ব থাকিলে তাহাকে দ্বিদল ব্যবস্থা বলে। ইংলণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল এবং শ্রমিকদল দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকন এবং ডেমোক্রাটিক এই দুইটি দল রহিয়াছে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে সরকার এখানে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। অপরপক্ষে বহুদল ব্যবস্থায় কোন দলই আইনসভায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না বলিয়া সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের পক্ষে দলের নীতি এবং কার্যসূচী বুঝিয়া ওঠা সহজ হয়। দুইটি নীতি এবং দলের মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য ইহা সহজেই স্থির করা যায়। অপরপক্ষে বহু দলীয় ব্যবস্থায় বহু দল এবং নীতি থাকার ফলে উহার মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য তাহা সহজে বুঝিয়া ওঠা নাগরিকের পক্ষে বেশ দুরূহ।

তৃতীয়তঃ, দুইটি দল থাকিলে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠিতে পারে। সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং প্রয়োজন মত সরকারের পতন ঘটাইয়া বিকল্প সরকার গঠন করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। বহুদল ব্যবস্থায় বিরোধীদল দুর্বল হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার সরকার গঠনের ক্ষমতা থাকে না।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি যে, দেশে এতো অসংখ্য সমস্যা এবং বিভিন্ন মতামত থাকে যে দুইটি দলের মধ্য দিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। সমগ্র জাতিকে দুইটি মতে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এমন বহু ব্যক্তি থাকিতে পারে যাহারা দুইটি মতের কোনটিকেই পছন্দ করে না, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের মত প্রকাশের পথ পায় না।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিদল ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব থাকায় সরকার স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। অবশ্য জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত থাকিলে সরকার জনমত অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইবে না। দ্বিদল ব্যবস্থার যাহা ত্রুটি বহুদল ব্যবস্থার তাহাই গুণ আর দ্বিদল ব্যবস্থার যাহা গুণ তাহা বহুদল ব্যবস্থার ত্রুটি।

রাষ্ট্রে দুইটির অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে তাহাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। ভারত, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে ;

বহুদলব্যবস্থার প্রধান গুণ যে প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অধিকারকে এই ব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বহুদল প্রথার মধ্য দিয়া বিভিন্ন লোকের মতামত প্রকাশের সুযোগ হয়। এই ব্যবস্থায় নির্বাচকগণ নিজেদের ইচ্ছামত প্রার্থীকে ভোট দিয়া নিজস্ব মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে সরকারের স্থায়িত্বের অভাব। আইনসভায় বহুদল থাকিলে কোনদলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না বলিয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। যে সকল দলের নেতাদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই সকল দলের প্রত্যেকটির নীতির কিছু কিছু অংশ লইয়া মন্ত্রিসভার সামগ্রিক নীতি গঠিত হয়। বিভিন্ন দলের নেতাদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সরকার কোন নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। বারংবার সরকারের পতন ঘটিলে দেশে সুশাসন ব্যাহত হয়। ফ্রান্সে বহুদল প্রথা দেশের মন্ত্রিসভার ঘন ঘন পতনের কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

দ্বিদল এবং বহুদল ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি ভালো সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে বহুদল প্রথাই গণতন্ত্রসম্মত বলিয়া উহা কাম্য। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহা স্মরণ রাখাও প্রয়োজন যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্বও অবাঞ্ছনীয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জনমত

॥ Public Opinion ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Public Opinion—its nature and importance in Popular Government—Agencies for formation of Public Opinion.

বিষয়বস্তু :—জনমতের সংজ্ঞা—জনমতের গুরুত্ব—জনমত প্রকাশের বাহন।

জনমতের সংজ্ঞা (**Definition of Public Opinion**) : 'জনমত' শব্দটি আমরা ঢিলে অর্থে সাধারণ কথাবার্তায় সব সময় ব্যবহার করিলেও জনমতের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। এইজন্য অনেকে বলিয়াছেন জনমত বলিয়া কিছু নাই, আবার কেউ কেউ জনমতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান না হইলেও উহার বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড ব্রাইসের মতে জনসাধারণের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে নাগরিকগণ যত প্রকার মত পোষণ করে তাহাদের সমষ্টিকে জনমত বলে। কিম্ব্যাল ইয়ং-এর (Kimball Young) মতে বিশেষ সময় জনগণ যে মত পোষণ করে তাহাকে জনমত বলে (Public opinion consists of the opinions held by a public at a certain time). লাওয়েলের (Lowell) মতে জনমত হিসাবে গণ্য হইবার জন্য সমগ্র সমাজের একমত হইবার প্রযোজন নাই আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও স্বয়ং যথেষ্ট নয় (a majority is not enough and unanimity is not required). কোন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে কতকগুলি মত অন্যান্য মত অপেক্ষা প্রবল হইয়া ওঠে ; এইগুলিকে তখন জনমত বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যে সব সময় জনমত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত স্বেচ্ছায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মানিয়া লইলে তবেই উহাকে জনমত আখ্যা দেওয়া যায়। রুশো যাঁহাকে সাধারণের ইচ্ছা (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা আসলে জনমত ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈশিষ্ট্য

জনমতের মোটামুটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ জনমত বলিতে কোন ব্যক্তিগত মত না বুঝাইয়া জনগণের সমষ্টিগত মত বুঝাইবে। দ্বিতীয়তঃ, জনমত সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির

বা প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মত ; তৃতীয়তঃ, জনমতে আস্থার দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন; সংখ্যার আধিক্য অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

গেটেলের মতে জনমত "জনগণেরও" নয় আবার "মতও" নয় (Public opinion is neither public nor opinion)। প্রথমে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির যাহা মত তাহাই জনমতে পরিণত হয়।

জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public Opinion): গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসনব্যবস্থা। জনগণের শাসন বলিতে জনমতের শাসন বুঝায়। সকল প্রকার শাসন কর্তৃত্বের উৎস জনমত। শাসকের ক্ষমতার উৎস যে শাসিতের সম্মতি এ সম্পর্কে দ্বিমত নাই। গণদেবতাকে অস্বীকার করিবে কে? জনমতের ভয়েই শাসকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহস পায় না। এই পৃথিবীতে কোন শাসকই জনমতকে উপেক্ষা করিয়া শাসনকার্য চালাইতে পারে না। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন করেন। আইন প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণের সময় তাঁহারা অতি সতর্কতার সহিত জনমত লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হন। কোন প্রতিনিধি জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাহার পুনর্নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে আইনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল তাহাকে বলবৎ বা কার্যকরী করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। অনেক সময় মন্ত্রিমণ্ডলীকে জনমতের চাপে নিজস্ব নীতি এবং পরিকল্পনার রদবদল করিতে হয়। জনমত অগ্রাহ্য করিয়া সরকার যদি কেবলমাত্র ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কিছু করিতে চায় তাহা হইলে উহা নিজের সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিবে। বিক্ষুব্ধ জনতা বিপ্লব করিয়া সরকারকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। জনমত অগ্রাহ্য করিয়া কর স্থাপন করার দরুন আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। শুধু গণতন্ত্রই জনমতকে ভয় করে না, একনায়কতন্ত্রেও কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে যখন নির্দিষ্টভাবে জনমত গড়িয়া ওঠে তখন সরকারের কাজের উপর উহার প্রভাব অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে। জমিদারী প্রথা অবসানের স্বপক্ষে জনমত প্রবল হইয়া উঠিলে পশ্চিমবংগ সরকার আইন করিয়া এই ব্যবস্থা বিলোপ সাধন করেন। গণতন্ত্রকে জনমত-শাসিত সরকার বলা যায় ; জনমত যদি সুচিন্তিত এবং কল্যাণকর হয় তাহা হইলে গণতন্ত্রের আদর্শও সফল হইবে. আবার জনমত যদি বিকৃত হয় তাহা হইলে গণতন্ত্রও বিকৃত হইবে। গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা করিতে হইলে সুস্থ, সবল এবং সুচিন্তিত জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন সদা সতর্ক জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। জনমত সদা জাগ্রত হইলে শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কোন শাসনব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তাহা পরিমাপের মানদণ্ড হইল উহার উপর

জনমতের প্রভাব। যে শাসনব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই শাসনব্যবস্থা তত বেশী গণতান্ত্রিক।

জনমত প্রকাশের বাহন (Organs of Public Opinion)ঃ জনমত গঠনের বাহনগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান ঃ

মুদ্রাযন্ত্র (The Press)ঃ জনমত প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হইল সংবাদপত্র; শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সংবাদই পরিবেশন করে না, ইহা সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়া মতামতও প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের মতামত জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আসলে সংবাদপত্রগুলিই সংবাদ সরবরাহ এবং মন্তব্য ও সমালোচনার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে। সরকারও সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার ভয়ে স্বৈরাচারী হইতে পারে না।

সংবাদপত্র যাহাতে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। সংবাদপত্রকে শুধু সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইলেই চলিবে না, উহাকে ধনী সম্প্রদায় অথবা দল বিশেষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতে হইবে। সরকার যদি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য আইন পাশ করে তাহা হইলে গণতন্ত্রের জীবনাবসান ঘটিবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে সংবাদপত্রগুলি সর্বদা সঠিক সংবাদ সরবরাহ করে না। অধিকাংশ সংবাদপত্রই কোন না কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল ও মতবাদকে সমর্থন করে। অনেক সময় সত্যকে বিকৃত করিয়া অথবা অর্ধসত্য প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। সংবাদপত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদের স্বার্থবিরোধী কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্র যাহাতে সমাজের মুখপত্র হিসাবে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতশূন্য সংবাদিক।

বেতার ও চলচিত্র (The Cinema and the Radio)ঃ বেতার ও চলচ্চিত্র সংবাদপত্রের পরিপূরক। সংবাদপত্রের প্রভাব সাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু বেতার ও চলচ্চিত্রের প্রভাব শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। বেতারের মাধ্যমে দেশবিদেশের সংবাদ সরবরাহ করা হয়। বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বেতারভাষণ দেন। এইভাবে বেতার জনমত গঠনে সহায়তা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশে জনমত গঠনে টেলিভিসনের অবদানও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন বেতারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সংবাদ এবং তথ্য পরিবেশন করা যায়। ইহা অতি সহজে এবং আনন্দের মধ্য দিয়া সংবাদ পরিবেশন করিতে পারে। অবশ্য চলচ্চিত্রের উপরও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক। কোন ছবি দেখানো হইবে এবং কোন ছবি দেখানো হইবে না তাহা সরকার নির্ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেতার এবং চলচ্চিত্রের প্রভাব ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতের মতো দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোকের অক্ষর জ্ঞান নাই সেখানে জনমত গঠন এবং লোকশিক্ষা বিস্তারে চলচ্চিত্রের এক বিশেষ ভূমিকা থাকিবে।

সভাসমিতি (The Platform): বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল সভাসমিতি করিয়া যে সকল বক্তৃতা দিয়া থাকে তাহাও জনমত গঠন করিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন দলের নেতারা যে সকল আলোচনা ও সমালোচনা করে তাহা শুনিয়া জনসাধারণ সকল রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে এবং তদনুসারে নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। সভাসমিতির একটি সুবিধা হইল জনসাধারণ বক্তাকে সম্মুখে দেখিতে পায় কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে বক্তৃতা শুনিতে সারা দেশের লোক এক জায়গায় সমবেত হইতে পারে না—স্থানীয় জনগণই উহা শুনিতে পারে।

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন সদা সতর্ক জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। জনমত সদা জাগ্রত হইলে শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কোন শাসনব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তাহা পরিমাপের মানদণ্ড হইল উহার উপর জনমতের প্রভাব। যে শাসনব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই শাসনব্যবস্থা তত বেশী গণতান্ত্রিক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions): জনমত গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। এখানেই তরুণ শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের শিক্ষালাভ করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যে ধ্যানধারণা এবং রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের পরবর্তী জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রিগণ শিক্ষকদের নিকট হইতে রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও মন্তব্য শুনিয়া নিজ নিজ মতামত গঠন করিতে প্রয়াস পায়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার উপর যথেষ্ট দলগত রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে, অপরপক্ষে একনায়কতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন করা হইয়াছে।

স্থ জনমত গঠন করিতে হইলে—শিক্ষার যে ভূমিকা তাহা সার্থকভাবে পালন করিতে হইবে—শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবমুক্ত হইতে হইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) ঃ প্রতিটি রাষ্ট্রনৈতিক দল জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবার জন্য জনমতের অনুকূলে নিজেদের কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া থাকে। ইহার দরুন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে। প্রত্যেক দল অপর দলের দোষত্রুটি জনসাধারণের সম্মুখে ফলাও করিয়া প্রচার করে। ইহাতে জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলির সহিত পরিচিত হয় এবং জনমত গঠন করিতে পারে।

আইনসভা (Legislature) ঃ বর্তমানকালে জনমত গঠনে আইনসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনসভায় সর্বদলের নেতারা বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আইনসভায় যে তর্কবিতর্ক হয় তাহা বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ জানিতে পারে। আইনসভায় বক্তাদের সুচিন্তিত আলোচনা জানিবার পর জনমত গঠিত হয়। আইনসভা শুধু জনমত সৃষ্টি করে না, উহাতে জনমতের প্রতিফলনও হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী

॥ Electorate ॥

Relevant Portion of the Syllabus : Electorate—Universa Suffrage—Methods of Minority Representation—Direct an Indirect Election—Relation between the Representative an his Constituency.

বিষয়বস্তু : সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—নারীর ভোটাধিকার-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি—নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ—সংখ্যালঘিষ্টের প্রতিনিধিত্ব-সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—সীমবিদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি—স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি—পৃথ নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি—দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি—ভারতে নির্বাচক নির্বাচনী এলাকা—নির্বাচনী এলাকা—ভারতে নির্বাচকেব যোগ্যতা।

আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিমূলক শাসন বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রতিনি নির্বাচনের অধিকারকে ভোটাধিকার (Right to Franchise or Right to Vote বলা হয়। যে ব্যক্তি ভোটদান করে তাহাকে ভোটদাতা বা নির্বাচক (Voter বলে। রাষ্ট্রে সকল ভোটদাতাগণকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate বলে। নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্যাগুলি মূলতঃ দুইটি: (১) ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of Franchise) এবং (২) ভোটদানের পদ্ধতি (Modes o Election)।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments fo and against Universal Suffrage) : সার্বজনীন ভোটাধিকার বলিতে রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং নরনারী নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার বুঝায়। অবশ্য উন্মাদ, বিদেশী, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষকে সমান অধিকার দিয়া পাঠাইয়াছে। ব্যক্তির এই অধিকার না থাকিলে গণতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না, কারণ গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ও সুযোগের নীতিতে বিশ্বাস করে। রাষ্ট্র জনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহার পরিচালনার ক্ষমতা

স্বপক্ষে যুক্তি

জনগণের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের মৌল আদর্শকে কার্যকর করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের কার্যকলাপ এবং নীতি সকল নাগরিকের জীবনকেই প্রভাবিত করে বলিয়া সরকারের নীতি নির্ধারণ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকা উচিত। যাহা সকলকে স্পর্শ করে সকলের দ্বারাই উহার নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন ("What toucheth all should be decided by all")।

তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে তাহার স্বার্থ রক্ষায় সরকার উদাসীন হইয়া পড়িবে। যাহাদের ভোটাধিকার আছে সরকারের স্থায়িত্ব তাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করে বলিয়া সরকার সর্বাগ্রে তাহাদের স্বার্থ পূরণ করিবে।

চতুর্থতঃ, সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে নৈতিক যুক্তিও উপস্থাপিত করা হয়। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োজন। ভোটাধিকার না থাকিলে ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িবে। ব্যক্তিজীবনের রাষ্ট্রনৈতিক দিকের বিকাশের জন্য ভোটাধিকারের প্রয়োজন।

জনষ্টুয়ার্ট মিল, স্যার হেনরি মেন, লেকী প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেন। ইঁহাদের মতে ভোটাধিকারকে কখনো সহজাত বা জন্মগত অধিকার বলিয়া গণ্য করা যায় না। পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কেহই ভোটাধিকার দাবী করিতে পারে না। ভোটাধিকার উপযুক্তভাবে ব্যবহারকরিয়া ইহার যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে তবেই এই অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। ভোটদানের ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি হইতে পারে শিক্ষা এবং সম্পত্তি।

বিপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, মিলের মতে শিক্ষাই ভোটাধিকারের উপযুক্ত মানদণ্ড। তাই তিনি বলিয়াছেন সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করিবার পূর্বে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (Universal education should precede universal enfranchisement) সার্বজনীন শিক্ষা বলিতে মিল সামান্য লেখাপড়া এবং সাধারণ অঙ্কের জ্ঞানের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা হইল এক বস্তু আর ভোটাধিকারের সঠিক ব্যবহার হইল আর এক বস্তু। ভারতের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা ভোটাধিকারের অযোগ্য একথা বলা যায় না। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। উপরন্তু সার্বজনীন শিক্ষাকে যদি সার্বজনীন ভোটাধিকারের মানদণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকের মতে সম্পত্তির মালিকানা ভোটদানের যোগ্যতার মানদণ্ড হইতে পারে। এই মতানুসারে যাহাদের কোন সম্পত্তি নাই, যাহারা রাষ্ট্রকে কোনরূপ কর দান করে না, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উপর তাহাদের কোন দরদ থাকে না। সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিবর্গ অমিতব্যয়ী হইবে কারণ পরের ধনে পোদ্দারী করার স্বাভাবিক প্রবণতা সকল ব্যক্তির আছে। কিন্তু এই যুক্তি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফল বলিয়া ইহাকে আধুনিক যুগে বর্জন করা হইয়াছে। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি সুযোগ পাইলেই অর্থের অপচয় করিবে এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই উপরন্তু বর্তমানকালে দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যক্ষ-কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে পরোক্ষ-করের ভার ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বহন করিতে হয়। পরিশেষে বলা যায় যে দারিদ্র্য কোন পাপ নয় এবং দারিদ্র্যের জন্য কাহাকেও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা গণতান্ত্রিক নীতিবিরুদ্ধ। বর্তমানযুগে সুস্থ মানবিকতাই ভোট-দানের সত্যকার ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

নারীর ভোটাধিকার (Women Suffrage): নারীর ভোটাধিকারের সমস্যা সার্বজনীন ভোটাধিকার সমস্যারই একটি বিশেষ দিক মাত্র। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভোটাধিকার পুরুষদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম সীমাবদ্ধ আকারে নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স ও ইতালীতে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে, ১৯৪৭ সালে জাপানে নারীরা ভোটাধিকার পায়। ভারতীয় সংবিধানের সুরু হইতেই নরনারীর মধ্যে ভোটাধিকারের ব্যাপারে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডে এখনো পর্যন্ত নারীরা ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে নাই নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়।

প্রথমতঃ, বলা হয় যে নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহ। সন্তানসন্ততি প্রতিপালন এবং গার্হস্থ্যজীবনের তদারকই তাহাদের আসল কাজ। নারী স্বভাবত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহী নয়, প্রকৃতিই নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অনুপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছে। নারীকে রাষ্ট্রনীতির বিষাক্ত আবর্তে টানিয়া আনা অনুচিত।

দ্বিতীয়তঃ, নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে গৃহশান্তি নষ্ট হইবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। আর বলা হয় নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে টানিয়া আনিলে সে তাহার আসল কর্তব্যে প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবে ফলে সমাজজীবনে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

তৃতীয়তঃ, বলা হয় যে নারীর ভোটাধিকার হইতে কোন সুফল পাওয়া যায় না। ধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারী রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং ভিভাবকের কথামত ভোটদান করে। নারী যদি তাহার অভিভাবকের মতের রুদ্ধে ভোটদান করে তাহা হইলে উহা গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করিবে আর যদি ভিভাবকের মতানুযায়ী ভোট দেয় তাহা হইলে উহা বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত ইবে।

চতুর্থতঃ, নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনে নারী কখনোই পুরুষের সমকক্ষতা দাবী রিতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারে কিন্তু ারীরা যুদ্ধ করিতে পারে না।

এই সকল যুক্তি বর্তমানযুগে আর গ্রহণযোগ্য নয়। নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়।

প্রথমতঃ, ভোটাধিকার যদি মানুষের জন্মগত অধিকার হয় তাহা হইলে উহা ইতে নারীকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নাই। নরনারী নির্বিশেষে সকল মানুষের ধিকার এবং সমান সুযোগই হইল গণতন্ত্রের ভিত্তি। নারীকে ভোটদান হইতে বঞ্চিত রিলে গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের নীতি এবং কার্যের ফলাফল শুধু পুরুষকেই নয়, নারীকেও মানভাবে ভোগ করিতে হয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে লিয়া সরকার গঠনে নারীরও মতামত প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ, নারীকে ভোটাধিকার দিলে পারিবারিক জীবনে শান্তি নষ্ট হইবে বলিয়া য আশংকা করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার াধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সুবিধা হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের মতবাদকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে; ইহাতে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নারী অংশ গ্রহণ করিলে তাহার কল্যাণকর স্পর্শে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ উন্নত হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার লাভের পর ওই দেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য আইন পাশ হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, বর্তমানে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয় একথা আর বলা চলে না। সকল কাজে নারী পুরুষের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী স্বীয় যোগ্যতা এবং দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। এমনকি বর্তমানে মেয়েরাও সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতেছে। সুতরাং নারী পুরুষের মতো সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না, এ যুক্তি অচল।

ষষ্ঠতঃ, যুক্তির খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে নারী দৈহিক দিক হইতে

দুর্বল তাহা হইলে ভোটাধিকার তাহার পক্ষ সমর্থনের অন্যতম যুক্তি হইতে পারে। নারী দুর্বল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আইনের অধিকতর প্রয়োজন ; সুতরাং আইন রচনায় তথা রাষ্ট্রশাসনে তাহার মতামত বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুরুষ-প্রধান সমাজে আইন সাধারণতঃ পুরুষদের স্বার্থ রক্ষায়ই বিশেষ আগ্রহী, ফলে নারীর স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। নারীর ভোটাধিকার থাকিলে নারীর স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

সপ্তমতঃ, নারী যদি তাহার পুরুষ অভিভাবকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটদান করে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। মিল বলিয়াছেন নারী যদি নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাহা হইলে প্রভূত মঙ্গল হইবে ; আর যদি না করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। যদি তাহারা চলিতে নাও চায় তথাপি তাহাদের শৃঙ্খল মোচন করিলে মানবসমাজ লাভবান হইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দোষগুণ (Merits and Defects of Direct and Indirect Methods of Election): পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি আছে—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচকগণ সরাসরি ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ; ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যবিধানসভাগুলি এইরূপ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

অপরপক্ষে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ প্রথমে একটি নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) গঠন করে আর এই নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ পরে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এইরূপক্ষেত্রে দুইবার নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান গুণ হইল যে ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত অধিকতর সংগতিপূর্ণ। এরূপ নির্বাচনে ভোটদাতা জানে যে তাহার ভোটেই প্রতিনিধি নির্বাচনে চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হইলে প্রতিনিধি এবং ভোটদাতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়িয়া উঠিবে। ইহা নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ উপযোগী। ভোটদাতারা সংখ্যায় বিপুল বলিয়া নির্বাচন প্রার্থীরা ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালায় এবং ইহার দরুন নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান প্রসার লাভ করে। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় দুর্নীতির আশংকা খুবই কম থাকে। ভোটদাতারা সংখ্যায় বিপুল, তাহাদের প্রভাবিত বা প্রতারিত করা সহজ নয়। কিন্তু

পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে মুষ্টিমেয় সদস্যকে লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় বলিয়া তাহাকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিরুদ্ধে যুক্তি হইল যে, সকল ভোটদাতা সমান দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন নয়। অজ্ঞ জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা স্বভাবতই কম বলিয়া তাহারা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না।

পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই পদ্ধতি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ত্রুটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। এই ব্যবস্থায় চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণ জনসাধারণ অপেক্ষা উন্নত বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাহারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ. এই ব্যবস্থায় দুইবার নির্বাচন হওয়ায় অধিক সময় লাগে; ইহার ফলে সাময়িক আবেগ এবং উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অবকাশ পাওয়া যায়।

পরোক্ষ নির্বাচন অগণতান্ত্রিক বলিয়া কেহই ইহাকে কাম্য বলিয়া মনে করে না। এই পদ্ধতিতে জনগণের সহিত প্রতিনিধিদের যোগাযোগ না থাকায় প্রতিনিধিরা জনস্বার্থ রক্ষায় আর আগ্রহী থাকে না; ইহা গণতন্ত্রের আদর্শকে বিকৃত করে। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে না থাকায় তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহাতে জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকমণ্ডলী মুষ্টিমেয় সদস্যদের সমর্থন লাভ করিতে পারিলেই নির্বাচন প্রার্থীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহা ঘুস এবং দুর্নীতির প্রসারে সহায়তা করে। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক নির্বাচকমণ্ডলী সদস্য নির্বাচন করিবার যোগ্য কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে অযোগ্য এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি প্রাথমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সে চূড়ান্ত প্রতিনিধিও নির্বাচন করিতে পারিবে।

নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ (Functions of the Electorate): আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলে। এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করিয়া নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

গণতন্ত্রে নির্বাচকগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাহারাই পরোক্ষভাবে সরকারকে পরিচালনা করে। যখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন নাগরিকগণ

সরাসরি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে।

নির্বাচকের প্রথম কাজ হইল আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করা। নির্বাচক সুষ্ঠুভাবে প্রার্থীনির্বাচনের দায়িত্ব পালন করিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইবে।

নির্বাচকের প্রথম কাজ হইল আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করা। নির্বাচক সুষ্ঠুভাবে প্রার্থীনির্বাচনের দায়িত্ব পালন করিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইবে। নির্বাচকের দ্বিতীয় কাজ হইল সরকারের নীতি এবং কার্যসূচীর আলোচনা করিয়া সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে নির্বাচকগণ সতর্ক দৃষ্টিতে তাহাদের কাজ লক্ষ্য করিতেছে তাহা হইলে তাহারা স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হইবে না। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিতে পারে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি আছে—(১) গণভোট (Referendum), (২) গণউদ্যোগ (Initiative) এবং (৩) পদচ্যুতি (Recall)। গণভোট দ্বারা প্রয়োজনীয় আইনগুলির প্রতি নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু থাকিলে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হাতেই থাকে। গণউদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া আইনসভাকে কাম্য আইন পাশ করিতে নির্দেশ দিতে পারে। পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই নির্বাচকগণ প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে।

গণতন্ত্রকে জনমত পরিচালিত সরকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। নির্বাচকগণই জনমতের স্রষ্টা। অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিয়া নির্বাচকগণ সরকারকে কাম্য পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করিতে পারে।

৮। **সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation):** গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে সর্বসাধারণের সরকার বুঝাইলেও বাস্তবিকপক্ষে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত শাসনব্যবস্থা। আইনসভায় যে দল সংখ্যাধিক্য লাভ করে সেই দলই সরকার গঠন করিয়া রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। গণতান্ত্রিক সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্য থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না থাকিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকিতে পারে না। গণতন্ত্র সর্বজনের সরকার বলিয়া আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠেরও প্রতিনিধিপ্রেরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না থাকিলে নির্বাচকমণ্ডলীর এক বিরাট অংশের জনমত উপেক্ষিত হইবে। সংখ্যাল-

দল জানিবে যে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। সুতরাং তাহারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং আনুগত্য হারাইবে। আইনসভা যদি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে তাহা হইলে আইনকে সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যায় না। আইন শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে এই আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জনসমর্থনের পার্থক্য যদি সামান্য হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি লইয়া সরকার গঠন করিলে অন্যায় করা হইবে। ধরা যাক, কোন কেন্দ্র হইতে দুইজন মাত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল—একজন ক-দলের অপরজন খ-দলের প্রার্থী। মোট ১০ হাজার ভোটের ৫১০০ ভোট ক এবং ৪৯০০ ভোট খ পাইল। সারা দেশের সকল কেন্দ্রে এইরূপ অবস্থা ঘটিলে খ দলের প্রতি যথেষ্ট জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও সরকার গঠনে ওই দলের কোন ভূমিকাই থাকিবে না। জনস্টুয়ার্ট মিল. লেকী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসভায় উহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা, আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে। পরিশেষে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে বিপদাশংকা থাকিয়া যায়; সংখ্যালঘু দল যদি মনে করে যে তাহারা উপযুক্ত সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে তাহা হইলে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিতে পারে।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করিযাছেন। সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিপ্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলে ইহা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া নিজেদের দলের বা স্বার্থের কথাই চিন্তা করিবে। ইহার ফলে জাতীয়স্বার্থ ব্যাহত হইবে এবং দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করিবে।

মনে রাখিতে হইবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক সংখ্যালঘিষ্ঠের কথাই বুঝাইয়াছেন। ধর্মগত অথবা, সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয় নাই।

পদ্ধতি

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য কতকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (খ) সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি, (ঘ) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসনসংরক্ষণ পদ্ধতি এবং (ঙ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ইহাদের আলোচনা করা হইল:

(ক) **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation)**: এই পদ্ধতিতে ভোটসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক দল আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণে অধিকার লাভ করিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠগণ যদি শতকরা ২৫ ভাগ ভোটদাতাদের সমর্থন পায় তাহা হইলে আইনসভার ১০০টি আসনের মধ্যে ২৫টি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পাইবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল উহার শক্তির অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাইবে। জনস্টুয়ার্ট মিল এবং লেকী সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। লেকীর মতে, কোন নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন এক দলের পক্ষে ভোট দেয় আর এক-তৃতীয়াংশ যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদল এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করার অধিকারী। মিল এবং লেকী মনে করেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার জন্য শুধু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বই নয়—নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা প্রয়োজন হইতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসনলাভ করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আশংকার কোন কারণ নাই কারণ শাসনক্ষমতা যথারীতি তাহাদের হাতেই থাকিবে কিন্তু সেইসঙ্গে আইনসভা জাতীয় জীবনের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিবে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান পদ্ধতি আছে—

(১) একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা হেয়ার পদ্ধতি (The Hare System) এবং (২) তালিকা পদ্ধতি (The List System)।

ইংরেজ লেখক টমাস হেয়ার ১৮৫১ সালে প্রথম পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহা হেয়ার পদ্ধতি নামেও পরিচিত। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি নির্বাচনীকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটদাতার একটিমাত্র ভোট থাকে এবং ভোটদাতা তাহার পছন্দ অনুসারে প্রার্থীগণের নামের পাশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি লিখিয়া তাহার পছন্দ প্রকাশ করিতে পারে। প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা "কোটা" লাভ করিলেই নির্বাচিত হইবে। নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটের অতিরিক্ত ভোট কোন প্রার্থী পাইলে তাহার অতিরিক্ত ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর নিকট হস্তান্তর করা হইবে। মোট ভোট সংখ্যাকে আসনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই 'কোটা' হিসাবে গণ্য হইবে।

ভোটগণনার সময় ভোটদাতাদের প্রথম পছন্দগুলিই বিবেচনা করা হয়। কোন প্রার্থী কোটা অপেক্ষা অধিক প্রথম পছন্দের ভোট পাইলে নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার বাড়তি ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোট সংখ্যার সহিত যোগ করা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি এইভাবে নির্বাচিত হইলে তাহার বাড়তি ভোটগুলি

তৃতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোটসংখ্যার সহিত যোগ করা হয়। এইরূপে আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভোটগণনা কার্য চলিতে থাকিবে।

তালিকা পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচনকেন্দ্রে মোট যতগুলি আসন সংখ্যা আছে ভোটদাতা ঠিক ততগুলি ভোট দিতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দল তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়া ভোটদাতাগণকে সেই তালিকায় ভোট দিবার অনুরোধ করে। ভোটদাতা তাহার পছন্দ অনুসারে কোন একটি তালিকায় ভোটদান করে।

(খ) সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি (Limited Vote Plan): এই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটদাতা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারে। কেন্দ্রে যে কয়টি আসন থাকে ভোটদাতা তদপেক্ষা অন্তত একটি কম ভোটদান করিতে পারে অর্থাৎ ভোটদাতা সকল আসনের জন্য ভোটদিতে পারে না। কেন্দ্রে পাঁচটি আসন থাকিলে ভোটদাতা তিনটি অথবা চারটি ভোটদান করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যার জোরে সকল আসন দখল করিতে পারিবে না—সংখ্যালঘু দল অন্ততঃ একটি আসন লাভ করিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হইলেও সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে না। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অনেকগুলি হয় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দল নগণ্য হয় তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সব কয়টি আসনই দখল করিয়া লইতে পারে। সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি গ্রেটবৃটেন, স্পেন ও ইতালীতে প্রচলিত ছিল।

(গ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (Cumulative Vote Plan): এই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে কেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক ভোটদাতার ঠিক ততগুলি করিয়া ভোট থাকে। ভোটদাতা তাহার ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে অথবা তাহার সব কয়টি ভোটই কোন একজন প্রার্থীকে দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভোটদান করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি (System of Separate Electoral): এই ধরনের পদ্ধতিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ যুগে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছিল। এই পদ্ধতির দোষ হইল যে ইহার ফলে

জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করে। এই ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শের বিরোধী।

(ঙ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System): এই পদ্ধতিতে কোন কেন্দ্র হইতে দুইজনের অধিক প্রার্থী থাকিলে কেহ যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ না করিতে পারে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার ব্যালট গ্রহণের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ভোটপ্রার্থীকে বাদ দিয়া অপর সকলের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়; ফ্রান্সে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলের প্রার্থী নির্বাচিত হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচনী এলাকা (Voters and Constituencies in India): ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদে ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার (অর্থাৎ লোকসভা) এবং রাজ্যের বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। অবশ্য সকল নাগরিকই নির্বাচক বা ভোটদাতা নয়। ব্যক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকিলে তবেই সে নির্বাচক হিসাবে গণ্য হইবে:

(১) ব্যক্তিকে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে;

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক (অর্থাৎ অন্ততঃ ২১ বৎসর) হইতে হইবে;

নির্বাচকের যোগ্যতা

(৩) সুস্থ মস্তিষ্ক হইতে হইবে;

(৪) দুর্নীতি বা নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হইলে চলিবে না।

(৫) নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় নাম ওঠা প্রয়োজন; ভারতীয় নির্বাচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়:

স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে মাত্র শতকরা তিনজন ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভোটাধিকার কিছুটা ব্যাপক করিয়া শতকরা ১৪ জন ভোটের অধিকার লাভ করে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকেই ভোটের অধিকার দান করা হয় বলিয়া ১৯৬২ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ জন ভোটাধিকার লাভ করেন।

ভারতীয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের অবসান ঘটিয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে

নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া বৃটিশ সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিল। বর্তমানে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নাই।

তৃতীয়তঃ, ভারতে নির্বাচনসংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালন এবং নিযন্ত্রণ করিবার জন্য একটি নির্বাচনী কমিশন (Election Commission) হইয়াছে। প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত কবেন।

চতুর্থতঃ, ভারতে নির্বাচকগণের সংখ্যা ব্যাপক করা হইলেও অধিকাংশ ভোটার তাহাদের ভোটদান ক্ষমতা প্রযোগ করিতে বিশেষ আগ্রহী নয। ইহা হইতে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাব অভাব পরিলক্ষিত হয। জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রসারিত হইলে তাহারা তাহাদের বাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রযোগ কবিতে তৎপর হইবে।

পঞ্চমতঃ, ভারতে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় লোকসভাব এবং বাজ্য বিধানসভাব প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইতে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ হয় না; কিন্তু বর্তমানের পবিবর্তিত পরিস্থিতিতে আব একসঙ্গে লোকসভা ও বাজ্যবিধানসভাব প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না। পরিশেষে, ভাবতে গোপন নির্বাচন পদ্ধতি বা ব্যালট পত্রেব মাধ্যমে ভোটদান কবা হয।

পরিশিষ্ট

মাওবাদ

॥ MAOISM ॥

বর্তমান পৃথিবীতে মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে মানুষের গতানুগতিক চিন্তাধারার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছে। অবশ্য আলোচনার শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে পৃথকভাবে "মাওবাদ" বলিয়া কিছু নাই—চেয়ারম্যান মাও সে তুং কোন নূতন তত্ত্বের উদ্গাতা নন—তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মাও-এর মতে মার্কস্‌বাদ-লেনিন্‌বাদ চিরন্তন সত্য। মাং সে তুং-এর লেখা 'On Contradiction','On Practice', 'On the Correct Handling of Contradictions Among the People', 'On New Democracy' প্রভৃতি রচনার আলোকে তাঁহার চিন্তাধারা আলোচনা করা হইল।

জ্ঞানের বিকাশ

জ্ঞান যে সামাজিক প্রয়োগের (Practice) উপর অর্থাৎ উৎপাদন ও শ্রেণী সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল তাহা প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ বুঝতে পারে নাই কারণ উহাতে জীবনের প্রশ্নটিকে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও তাহার ঐতিহাসিক ঠিকানা হইতে পৃথকভাবে বিচার করা হইয়াছে। মার্কসবাদের মতে, মানবসমাজে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করে; আর তার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানও—তা সে সমাজ অথবা প্রকৃতি যা সম্পর্কেই হোক না কেন—ধাপে ধাপে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে, অগভীর থেকে গভীরতার দিকে, একদেশদর্শী জ্ঞান হইতে ভূয়োদর্শী জ্ঞানে পরিণত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ সামাজিক ইতিহাসের একদিকটাই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে কারণ শোষকশ্রেণী সর্বদাই ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছে এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন মানুষের দৃষ্টিভংগীকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। যতদিন পর্যন্ত না সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভব এবং বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ সুরু হয় ততদিন পর্যন্ত মানুষ সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান তথা মার্কসীয় বিজ্ঞানের ধারণা পায় নাই।

বস্তুগত দ্বন্দ্ববাদ

বস্তুগত দ্বন্দ্ববাদের (dialectical materialism) জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগকে (practice) প্রধান স্থান দেওয়া হয় এবং এই তত্ত্বানুসারে তত্ত্বগতজ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে অবিচ্ছেদ্য; মার্কসীয় বস্তুগত দ্বন্দ্ববাদের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে—প্রথমটি তাহার শ্রেণী চিত্র অর্থাৎ ইহার ঘোষণা যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসেবী, অপরটি হইল ইহার ব্যবহারিক দিক; অর্থাৎ তত্ত্ব যে প্রয়োগের

পব নির্ভরশীল এবং প্রয়োগই যে তত্ত্বের ভিত্তি আর তত্ত্ব প্রয়োগকেই সেবা করে এই থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। জ্ঞানের দুইটি দিক আছে—অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানের ত্রপাত হয়, ইহাই হইল জ্ঞানের বস্তুবাদ। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষণ জ্ঞান (perceptual nowledge) যৌক্তিক জ্ঞানে (rational knowledge) উন্নীত হয়—ইহাই হইল জ্ঞানের দ্বন্দ্ববাদ। বস্তুগত জগতের নিয়ম উপলব্ধি করা মার্কসীয় দর্শনের প্রধান সমস্যা য়। আসল সমস্যা হইল বস্তুগত জগতের পরিবর্তনের জন্য ওই সকল নিয়ম সক্রিয়-ভাবে প্রয়োগ করা। লেনিন যথার্থই বলিযাছিলেন, "বৈপ্লবিক মতবাদ ব্যতীত বপ্লবিক আন্দোলন হইতে পারে না "(Without revolutionary theory there an be no revolutionary movement.") কিন্তু মার্কসবাদে তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দওযার কারণ হইল যে তত্ত্ব প্রযোগের চালকের কাজ করে। সঠিক তত্ত্বের অধিকারী ইয়াও যদি আমরা তা নিয়ে শুধু আলোচনাই করি এবং তাহাকে বাস্তবে প্রয়োগ না করিয়া ফেলিযা রাখি তাহা হইলে সে তত্ত্বের কোনই গুরুত্ব নাই।

ভাববাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ ও হটকারিতার মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণ তাহা হইল বহির্বাস্তব হইতে মনোজগতের বিচ্ছেদ, কর্ম হইতে জ্ঞানের বিচ্ছেদ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব, যাহার বৈশিষ্ট্য হইল বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠি হিসাবে সামাজিক প্রযোগের উপর গুরুত্ব দেওযা, এইসব ভুল ধারণার বিরোধী। দুনিযার পরিবর্তন সাধনের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামে এই কর্তব্যগুলি পালন করিতে হইবে—জানার ক্ষমতাকে এবং মনোজগত ও বহির্জগতের সম্পর্ককে নূতনভাবে গড়িতে হইবে। যেদিন সমগ্র মানবসমাজ স্বেচ্ছায় নিজেকে নূতন করিয়া গড়িবে এবং দুনিযাকে পরিবর্তন করিবে, সেইদিন সুরু হইবে বিশ্বসাম্যবাদের স্বর্ণ যুগ।

দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া মানুষের জ্ঞান অগ্রসর হয়। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁহারা সত্যকার বিপ্লবী নেতা তাঁহারা পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থা সংশোধন করিবেন। বিপ্লবের সময় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয; বিপ্লবীদের চিন্তাধারা যদি পরিবর্তিত অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্য বিধান না করিতে পারে তাহা হইলে বিপ্লব বিজযী হইবে না।

বিশ্ব বিবর্তন সম্পর্কে দুইটি মতবাদ আছে—দার্শনিক ধারণা (Metaphysical conception) এবং দ্বন্দ্ববাদ (dialectical conception). প্রথমটি বিবর্তনকে হ্রাসবৃদ্ধি এবং স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। ইহা জগৎ সম্পর্কে এক বিচ্ছিন্ন, অনড এবং একদেশদর্শী দৃষ্টিভংগী নিয়ে চলা। "স্বর্গের পরিবর্তন হয় না, পথেরও পরিবর্তন হয় না"—এই চৈনিক প্রবাদটির মধ্যে দার্শনিক ধারণা প্রকাশ

পাইয়াছে। এই মতানুসারে সমাজ বহির্ভূত কারণেই সমাজের বিকাশ ঘটে। ইহা বস্তুর গুণগত রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারে না। দ্বন্দ্ববাদ বিবর্তনকে বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের (unity as opposities) দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এই মতানুসারে বিবর্তনের কারণ হইল বস্তুর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য।

বস্তুগত দ্বন্দ্ববাদ অনুসারে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে।

পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে; এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বলিতে বুঝায় উৎপাদনীশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ, বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধ এবং পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। এই বিরোধগুলির বিকাশই সমাজকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং পুরাতন সমাজকে সরিয়ে দিয়ে নূতন সমাজকে আনে। দাস, সামন্ত অথবা পুঁজিবাদী যে কোন সমাজেই শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বমান এই দুইটি শ্রেণী একই সমাজে দীর্ঘকাল সহ-অবস্থান করে; কিন্তু এই দ্বন্দ্ব একটি বিশেষ স্তরে পেঁছিলেই উহা প্রকাশ্য বিরোধিতার রূপ নেয় যা বিপ্লবে পর্যবসিত হয়।

মাওসেতুং প্রথম স্বীকার করেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও সমাজে দ্বন্দ্ব থাকবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজকে দুই ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয়—শত্রু এবং

সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্ব

জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দুই ধরনের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে সকল শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রের পথে বাধার সৃষ্টি করে তাহারাই "শত্রু"; জনগণ ও শত্রুদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা বৈরীমূলক। জনগণের নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহাতে বৈরীভাব নাই। চীনে কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব আছে আর এই দ্বন্দ্বই সমাজকে প্রগতির পথে লইয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে দ্বন্দ্ব তাহা ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে সংঘাত এবং তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়া। উহার সমাধান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাই, আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে দ্বন্দ্ব তাহা সম্পূর্ণ পৃথক, সমাজের দ্বন্দ্ব পরস্পর বিরোধী নয় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই উহার সমাধানের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

এরূপ বহু লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে চীনের গণতন্ত্রে স্বাধীনতা একান্তই অল্প এবং পশ্চিমী পার্লিয়ামেণ্টারী গণতন্ত্রে স্বাধীনতা অধিক। ইহারা

চীন গণতন্ত্রের সমালোচনা

পশ্চিমী দেশগুলির মতো দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমর্থন করে—একদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে আর অপর দল থাকিবে ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু এই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করা

যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা কখনোই মেহনতী মানুষকে স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিতে পারে না। বস্তুতঃ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র বিমূর্ত ধারণা নয়, উহারা শুধুমাত্র বাস্তবেই থাকিতে পারে। শ্রেণীসংগ্রাম বিধ্বস্ত সমাজে শোষকশ্রেণীর যদি মেহনতী মানুষকে শোষণ করিবার স্বাধীনতা থাকে তাহা হইলে মেহনতী মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার কোন স্বাধীনতা থাকিবে না; গণতন্ত্র যেখানে বুর্জোয়াদের জন্য সেখানে সর্বহারা বা মেহনতী মানুষের কোন গণতন্ত্র থাকিতে পারে না।

শিল্প বিজ্ঞান

"শত পুষ্প বিকশিত হোক", "শত মতের সংঘাত হোক" ("Let a hundred floowers blossom, let a hundred schools of thought contend") এই আওয়াজ তোলা হয়েছে শিল্পকলার বিকাশ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। শিল্পকলায় বিভিন্ন রূপ এবং ধাঁচ অবাধে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতও অবাধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি একটিমাত্র শিল্পনীতি বা একটিমাত্র মতকে সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্যমতকে নিষিদ্ধ করা হয় তবে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইবে।

যুদ্ধ

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মাওসেতুং বলেন, আমরা শান্তি চাই, আমরা যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা যদি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে, আমরা তাহার ভয়ে ভীত নই। যুদ্ধ সম্পর্কে মাওসেতুং এর বক্তব্য হইল, প্রথমত, সাম্যবাদী চীন যুদ্ধের বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ, চীন যুদ্ধকে ভয় পায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জন্মলাভ করে সোভিয়েট রাশিয়া যার জনসংখ্যা ২০ কোটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ কোটি হয়। যদি সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জেদ করে তাহলে আরো অনেক কোটি লোক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে এগিয়ে যাবে ফলে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ স্থানই থাকিবে না। এমন কি সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র বনিয়াদ ধ্বসে যেতে পারে।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসাবে মাং সেতুং সামরিক শক্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার বিখ্যাত উক্তি হইল বন্দুকের নল হইতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয় ("political power grows out of the barrel of a gun").

সকল মতবাদের মতো মাও-এর চিন্তাধারাও সমালোচনার উর্ধে নয়। মাওবাদ বস্তুতঃ মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়া মার্কসীয় তত্ত্বের যে সকল দোষত্রুটি মাওবাদেও তাহা আছে। দ্বিতীয়তঃ, মাও মতান্ধের (dogmatism)

বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মতান্ধের বিরুদ্ধে মতান্ধের (dogmatism against dogmatism) জন্ম দিয়াছেন। তৃতীয়ত: জনমত অপেক্ষা

মূল্যায়ন

সামরিক ক্ষমতার উপর মাও-সে-তুং অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক শক্তি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দিতে পারে না। শ্রেণীসংঘাত যে সমাজতন্ত্রেও থাকিতে পারে এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব যে প্রগতির অনুকূল একথা প্রথম মাও-সেতুং-ই শোনালেন; এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

Exercises

প্রথম অধ্যায়

অনুশীলনী

1 Is Political Science a Science ? Give reasons for your answer.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[পৃষ্ঠা ৪—৭]

2. Define Political Science and distinguish it from Political hilosophy.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে ার্থক্য কর। [পৃষ্ঠা ১—৩]

3. How far Political Science can be regarded as a true Science ? iscuss the Scope of Political Science.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞান বলা যায় ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ালোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৪—৯]

4. Discuss the different methods of study in Political Science. hich of them do you consider to be the most desirable and why ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। ইহাদের মধ্যে ানটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে কর এবং কেন ? [পৃষ্ঠা ৯—১৪]

5. Discuss the relation between (a) Political Science and History,) Political Science and Sociology, (c) Political Science and Economics,) Political Science and Ethics, (e) Political Science and Psychology, Political Science and Geography.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত উল্লিখিত বিজ্ঞানগুলির সম্পর্ক আলোচনা কর : (ক) ষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস, (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব, (গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং র্থনীতি, (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র (ঙ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ভূগোল। [পৃষ্ঠা ১৪—২৪]

6. Distuss the utility or importance of the study of Political ience and discuss the different methods of doing so.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর এবং উহা পাঠের দ্ধতিগুলি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৪, ৯—১৪]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুশীলনী

1. How would you define a State? Do the following com under the definition of the State : (1) West Bengal, (2) Units of Federal Government, (3) United Nations, (4) New York? Give reason for your answer.

কি ভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র: (ক পশ্চিম বাংলা, (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অংগ রাজ্যসমূহ (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, (নিউ ইয়র্ক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ২৫—২৮

2. Distinguish between (a) State and Government, (b) State ar other Associations and (c) State and Society.

(ক) রাষ্ট্র এবং সরকার, (খ) রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংগঠন এবং (গ) রাষ্ট্র ও সমাজে মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [পৃষ্ঠা ২৯—৩

3. Discuss the significance and meaning of "territory" as a consti tuent element of the state. What are the exceptions to the princi of exclusive jurisdiction of a state over its own territory?

রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে "ভূখণ্ডের" অর্থ আলোচনা কর। রাষ্ট্রের স্ব ভূখণ্ডে কর্তৃত্বের ব্যতিক্রম কি কি? [পৃষ্ঠা ২৬—২

4 Discuss the relation between the individual and the society.

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৩৫—৩

তৃতীয় অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Discuss the theory of Divine Origin. What purpose did t theory serve?

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ আলোচনা কর। মতবাদটি কি উদ্দেশ্য স করিয়াছে? [পৃষ্ঠা ৩৮—৭

2. State and examine the theory of force as an explanation of t origin of the state. Do you discover any element of value in i Give your reasons.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে বলপ্রয়োগের মতবাদ আলোচনা কবে। ইহাব
মধ্যে কোন সত্যতা থাকিলে তাহা দেখাও। [পৃষ্ঠা ৪০—৪৩]

3. "Government rests on force." "Government rests on opinion."
Examine the statements carefully.

"সরকার বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।" "সবকার জনমতের উপব প্রতিষ্ঠিত।"
সূত্র দুইটি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৪০—৪৩]

4. Discuss the Patriarchal and Matriarchal theories of the origin
of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ আলোচনা কব।
[পৃষ্ঠা ৪৩—৪৫]

5. Discuss critically the Social Contract theory of the origin of
the State.

বাষ্ট্রেব উৎপত্তি হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা কব।
[পৃষ্ঠা ৪৫—৫০]

6. Give a critical estimate of the Social Contract Theory.

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা কব। [পৃষ্ঠা ৪৫—৫০]

7. Discuss the points of agreement and difference between Hobbes
and Locke as expounders of the Social Contract Theory.

সামাজিক চুক্তি মতবাদেব ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে হবস এবং লকের সাদৃশ্য
ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কব। [পৃষ্ঠা ৫০—৫৩]

8. Explain how Rousseau in his theory of Social Contract seeks
to combine the theories of Hobbes and Locke.

কি ভাবে রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে হবস ও লকের মতবাদের
যোগ সাধন করিতে চাহিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৫০—৫৩]

9. Discuss the Evolutionary theory of the origin of the State.

বাষ্ট্রেব উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদের আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৫৩-৫৬]

চতুর্থ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Discuss critically the Organic (Organismic) theory regarding
the nature of the State.

রাষ্ট্রেব প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদেব আলোচনা কব। [পৃষ্ঠা ৫৭-৬২]

2. "The State is a living organism, not a lifeless instrument Discuss the soundness of this view.

"রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণীদেহ—কৃত্রিম যন্ত্র নহে"—এই উক্তির সার্থক আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৫৭ ৬:

3. "The Organic theory is neither a satisfactory explanation the nature of the state nor a trustworthy guide to state activity Discuss the statement.

"জৈব মতবাদ যেরূপ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, সেইরূপ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সম্পর্কেও বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশ দান করিতে পারে না।" এই মন্তব্যটি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৫৭ ৬২

4. Discuss critically the Idealist (Absolute) theory of the State.

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের (চরম মতবাদ) আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৬২-৭০

5. "The Absolutist Theory of the State is in fact inimical to individual freedom." Examine.

"বস্তুতপক্ষে চরম মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার শত্রু।" ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৬২-৭০

6. Discuss the Marxian theory of the State.

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৭০-৭৭]

7. "The State will wither away" Examine.

"রাষ্ট্র অবলুপ্ত হইবে।" ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৭০-৭৭]

8. Write notes on (a) Juridical Theory of the State and (b) Mechanistic Theory of the State.

টিকা লিখ (ক) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আইনমূলক মতবাদ, (খ) যান্ত্রিক মতবাদ। [পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯]

পঞ্চম অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Define Sovereignty. What are its attributes ?

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দাও। উহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃষ্ঠা ৮০-৮২

2. Distinguish between Legal, Political and Popular Sovereignty

আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য কর। [পৃষ্ঠা ৮২-৮৭

3. Examine critically the Austinian (Monistic) theory Sovereignty.

"সার্বভৌমত্ব" সম্পর্কে অষ্টিনের মতবাদ (একত্ববাদ) আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ৮৭-৮৯]

4. Write a note on the attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একাত্মবাদী ধারণা সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৯০-৯৩]

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Define Law. Discuss the nature and sanction of Law.

আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের প্রকৃতি এবং অনুমোদন আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫, ১০৩] ৭

2, Define Law and point out its different sources with their relative importance.

আইনের সংজ্ঞা দাও এবং উহার বিভিন্ন উৎসের আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫]

3. Define Law and point out the relation between Law and Morality.

আইনের সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫, ৯৭-৯৮]

4. "Law is the condition of Liberty." Discuss.

"আইন স্বাধীনতার সর্ত।" আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৯৮-১০০]

5. Discuss the different meanings in which the term "Liberty" is used.

"স্বাধীনতা" শব্দটি যে সকল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১০০-১০৩]

6· Can International Law be regarded as law in the strict sense of the term ? Give reasons.

আন্তর্জাতিক আইন কি যথার্থ আইন হিসাবে গণ্য হইতে পারে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮]

7. "International Law is the vanishing point of jurisprudence' Discuss the statement.

"আন্তর্জাতিক আইন বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান" এই মন্তব্য আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮

8, Write notes on ; (1) Natural Law, (2) Natural Rights, (3 Equality.

টিকা লিখ: (ক) স্বাভাবিক আইন, (খ) স্বাভাবিক অধিকার এ (গ) সাম্য।

[পৃষ্ঠা ১০৮-১১:

9. What are the Safeguards of Literty ?

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি?

[পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬

সপ্তম অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Examine the meanings of State, Nation, Nationality an People.

'রাষ্ট্র', 'জাতি', 'জাতীয় জনসমাজ' এবং 'জনসমাজ' এই ধারণাগুলির তং আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮

2. What are the factors that tend to create a Nationality ?

জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলি কি কি?

[পৃষ্ঠা ১১৮-১২০

3. What is meant by right of self determination ? Discuss its value and limitations.

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বুঝ? এই মতবাদটির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১২০-২২]

4. Discuss the principle "One Nation, One State."

"একজাতি, এক রাষ্ট্র" এই নীতিটি আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১২০-২২]

5. "Nationalism is a menace to Civilization." "The road to Internationalism lies through Nationalism" Discuss these statements.

'জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অন্তরায়," "জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়াই আন্তর্জাতিকতায় পৌছান যায়।" এই মন্তব্য দুইটির আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১২২-২৫]

6. Discuss the objects, composition and functions of the United Nations Organisation.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, গঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১২৬-২৯]

অষ্টম অধ্যায়
অনুশীলনী

1. Define Citizenship. Discuss the different methods of acquiring itizenship.

নাগরিকতার সংজ্ঞা দাও। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পন্থা আলোচনা র। [পৃষ্ঠা ১৩০—৩২]

2. What do you mean by a citizen? Distinguish between a tizen and an alien. What are the different methods of acquiring tizenship?

নাগরিক কাহাকে বলে? নাগরিকের সহিত বিদেশীর পার্থক্য কর। াগরিকতা অর্জনের কি কি পদ্ধতি আছে? [পৃষ্ঠা ১৩০—৩২]

3. How would you define "good citizenship"? Describe the indrances to good citizenship and point out how they can be emoved.

"সুনাগরিক" বলিতে কি বুঝ? সুনাগরিকতার পথে যে সকল অন্তরায় ছে এবং কিভাবে উহা দূর করা যায় তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৩২—৩৬]

নবম অধ্যায়
অনুশীলনী

1. State and explain some important rights and duties of a citizen of modern state.

আধুনিকরাষ্ট্রে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা কর।

2. Enumerate the more important fundamental rights which a citizen in a modern state enjoys.

বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করে তাহা উল্লেখ কর।

3. "Rights imply duties" Discuss.

"অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত আছে।" আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Define Democracy. Distinguish between Direct and Indirect Democracy.

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কর।

[পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮]

2, Point out the strength and weakness of Democracy as a form of Government.

গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতা আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬১]

3. What is Dictatorship ? How does it differ from Democracy ?

একনায়কতন্ত্র কি ? গণতন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য কোথায় ?

[পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬]

4. Distinguish between Democracy and Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy.

গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ কর এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তগুলি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৫, ১৬১]

5. Discuss the nature and characteristics of a Federation. What are its advantages and disadvantages ?

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩]

6. What are the conditions necessary for the formation of a Federation ? Point out its merits and demerits.

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্তগুলি কি কি ? ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩]

7. Discuss the merits and defects of a Unitary form of government.

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭০]

8. Distinguish between Cabinet and Presidential form of government. What are their respective merits and demerits.

মন্ত্রিপরিষদশাসিত এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পার্থক্য কর ও উহাদের দোষগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৬]

একাদশ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Discuss the value and limitations of the doctrine of Separation f powers.

ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭]

2. How far is it possible and desirable to carry out the principle separation of powers in the governmental organisation of a state ?

ক্ষমতা বিভাজন নীতি কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয় ?

[পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭]

2. Examine the case for and against Bicameralism. Five lestrations.

দ্বিপরিষদ কক্ষের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮০]

4. Describe the nature of functions performed by the Legislature ı a modern state.

আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলীর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮০-১৮২]

5. Discuss the role of Judiciary in a modern state. How can ıe independence of Judiciary be guaranteed ?

আধুনিক রাষ্ট্রের বিচারবিভাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। কিভাবে িচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় ? [পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭]

6. Point out the importance and functions of Judiciary in a ıodern state.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭]

7. What are the political. administrative and legislative functions f the Executive.

শাসন বিভাগের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৫]

দশম অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Define Democracy. Distinguish between Direct and Indirect Democracy.

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কর।

[পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮]

2, Point out the strength and weakness of Democracy as a form of Government.

গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতা আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬১

3. What is Dictatorship ? How does it differ from Democracy

একনায়কতন্ত্র কি ? গণতন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য কোথায় ?

[পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬

4. Distinguish between Democracy and Dictatorship and poin out the conditions essential to the success of Democracy.

গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ কর এবং গণতন্ত্রের সাফল্যে সর্তগুলি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৫, ১৬১

5. Discuss the nature and characteristics of a Federation. Wha are its advantages and disadvantages ?

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ইহার সুবিধা অসুবিধাগুলি কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩

6. What are the conditions necessary for the formation of Federation ? Point out its merits and demerits.

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্তগুলি কি কি ? ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩

7. Discuss the merits and defects of a Unitary form government.

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭০

8. Distinguish between Cabinet and Presidential form government. What are their respective merits and demerits.

মন্ত্রিপরিষদশাসিত এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পার্থক্য কর ও উহাদে দোষগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৬

একাদশ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Discuss the value and limitations of the doctrine of Separation of powers.

ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭]

2. How far is it possible and desirable to carry out the principle of separation of powers in the governmental organisation of a state ?

ক্ষমতা বিভাজন নীতি কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয় ?

[পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭]

2. Examine the case for and against Bicameralism. Five illestrations.

দ্বিপরিষদ কক্ষের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮০]

4. Describe the nature of functions performed by the Legislature in a modern state.

আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলীর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮০-১৮২]

5. Discuss the role of Judiciary in a modern state. How can the independence of Judiciary be guaranteed ?

আধুনিক রাষ্ট্রের বিচারবিভাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। কিভাবে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় ? [পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭]

6. Point out the importance and functions of Judiciary in a modern state.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭]

7. What are the political. administrative and legislative functions of the Executive.

শাসন বিভাগের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৫]

দ্বাদশ অধ্যায়
অনুশীলনী

1. Discuss the Individualistic Theory regarding the functions the Government.

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯:

8. State and examine the doctrine of Individualism.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯:

3. What is Socialism ? Discuss the various forms of Socialism.

সমাজতন্ত্রবাদ কি ? সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্নরূপ বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ১৯১-১৯‹

4. What, in your opinion, should be the proper sphere of t state ? Give reasons for your answer.

তোমার মতে রাষ্ট্রের সঠিক কার্যাবলী কি কি হইবে ? তোমার উত্তে স্বপক্ষে যুক্তি দাও। [পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৳

ত্রয়োদশ অধ্যায়
অনুশীলনী

1. Distinguish between Rigid and Flexible constitutions. Discu their respective merits and defects.

নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের পার্থক্য কর। উহাদের দোষগুণ আলোচ কর। [পৃষ্ঠা ২০১-২০২

2. What is a Constitution ? How would you classify them ?

সংবিধান কি ? কি ভাবে উহার শ্রেণীবিভাগ করিবে ? [পৃষ্ঠা ১৯৯-২০২

চতুর্দশ অধ্যায়
অনুশীলনী

1. Define a political party. What are the functions of politi parties in a Democracy ?

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী কি ? [পৃষ্ঠা ২০৩-২০°

2. Discuss the strength and weakness of the party system in the modern democratic states.

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলব্যবস্থার দোষ ও গুণ বর্ণনা কর।

[পৃষ্ঠা ২০৭ ২১০]

3. Discuss the nature and functions of political parties. Are political parties indispensable in democracies ? Give reasons for your answer.

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী আলোচনা কর। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দল কি অপরিহার্য ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ২০৩—২০৬]

4. Examine the meaning of multiparty system and examine its advantages and disadvantages.

বহুদলীয় ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২১১—২১২]

পঞ্চদশ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. What do you mean by Public Opinion ? How is it formulated and moulded ?

জনমত কাহাকে বলে ? উহা কিভাবে গঠিত হয়। [পৃষ্ঠা ২১৩—২১৭]

2. Define Public Opinion and point out its importance in Democracy.

জনমতের সংজ্ঞা দাও এবং গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

[পৃষ্ঠা ২১৩—২১৫]

ষোড়শ অধ্যায়

অনুশীলনী

1. Argue for and against universal Adult Suffrage.

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[পৃষ্ঠা ২১৮—২২২]

2. Argue for and against Woman Suffrage.

নারীর ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[পৃষ্ঠা ২২০—২২২]

3. Examine the importance of the right to vote. What are the qualifications of a voter in a modern democracy ?

ভোটাধিকারের গুরুত্ব আলোচনা কর। আধুনিক গণতন্ত্রে ভোটদাতার যোগ্যতা কি কি ? [পৃষ্ঠা ২২৩—২৪, ২২৮]

4. Distinguish between Direct and Indirect Election. Discuss their respective merits and defects.

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পার্থক্য কর।. উহাদের দোষগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২২২—২২৩]

5. Discuss the various methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature.

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে যে সকল পদ্ধতি আছে তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২২৪—২২৮]

6. Discuss critically the system of proportional representations as a method of minority representation.

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের উপায় হিসাবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২২৪—২২৭]

Burdwan University

Political Science

1969

1. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

Discuss the different methods of study in Political Science.

2. রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলভিত্তিক তত্ত্বটি আলোচনা কর এবং যুক্তি সহযোগে ইহার ত্রুটি দেখাও।

State and examine the Force Theory of the origin of the state.

3. আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক বর্ণনা কর।

Define Law and point out the distinction between law and Morality.

4. সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক কি কি? কিভাবে উহাদের দূর করা যায়?

What are the hindrances to good citizenship? How can they be overcome?

5. উদাহরণ সহযোগে পার্লামেন্টারীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রভেদ ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের দোষগুণ বর্ণনা কর।

Explain with illustrations the distinction between Parliamentary and Presidential forms of Government. What are their merits and demerits?

6. গণতন্ত্র বলিতে কী বুঝ ব্যাখ্যা কর। গণতন্ত্রকে কি কি উপায়ে সফল করা যায়?

What do yon mean by Democrocy? What are the conditions essential to the success of Democracy?

7. আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

Write an essay on the importance and functions of the Judiciary in a modern state.

8. দ্বিপরিষদ আইনসভার স্বপক্ষেও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

Discuss the arguments for and against the Bicameral legislative system.

9. সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথার স্বরূপ আলোচনা করিয়া উহার দোষগুণ দেখাও।

Analyse the principle of Proposional Representation and discuss its advantages and disadvantages.

10. যুক্তি সহযোগে রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের সার্থকতা বিচার কর।

Critically examine the Idealist theory of the state.